"গৃহ সন্ধানে"

by

প্রভাত কুমার মুখার্জী -

চাঁপাতলার একটা ঘেঞ্জি গলির মধ্যে ডাস্টবিনের পাশে একটি জরাজীর্ণ দোতলা বাড়ি। বাড়ির বাহিরে সদর দরজার উপর একখানা প্রকাণ্ড সাইন-বোর্ড ঝোলানো ; তাহাতে কালো জমির উপর বড়ো বড়ো সাদা অক্ষরে লেখা 'পবিত্র কালিকা ভোজন আশ্রম'। কোনও দুষ্ট লোক কালিকার 'ক' এর আঁকড়িটি মুছিয়া দিয়াছে, ফলে সম্প্রতি 'পবিত্র বালিকা ভোজন আশ্রমে'র নামটি চক্ষুষ্মান্ পথিকের কৌতূহল এবং হাস্য উদ্রেক করে। মোটের উপর পাইস-হোটেলটি চলে মন্দ নয়। লাহিড়ীবাবুদের নেপালী দারোয়ান, পথের ফুলুরিওয়ালা, ফেরিওয়ালা, দোকানদার, মুদির দোকানের কর্মচারী, উড়িয়া মজুর, জুতাব্রুস হইতে আরম্ভ করিয়া মফঃস্বলের মামলাবাজ আগন্তুক, মার্চেণ্ট অফিসের কেরানীবাবু এবং স্কুল কলেজের দরিদ্র ছাত্রেরা অনেকেই এই হোটেলে অল্পখরচে দ্বিপ্রহরে মধ্যাহ্নভোজন সারিয়া যান, যদিও শেষোক্ত ভদ্রসন্তানেরা একথা বাহিরে স্বীকার করিতে লজ্জা পাইবেন।

উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ সালের অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু পূর্বের কথা। তখনও চালের মণ ছিল মাত্র চার টাকা, বাংলাদেশের অর্ধেক গরিব লোক দুইবেলা খাইতে পাইত। কলিকাতার পথে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারী অনাহারে মরিয়া পড়িয়া থাকিত না। অসহযোগ আন্দোলন থামিয়া গিয়াছিল, পরাধীন দেশের অধিকাংশ লোকই পরনিন্দা পরচর্চা লইয়া পরানুগ্রহে মন্দ ছিল না। কেবল দোল চলিয়া গেলেও যেমন এখানে ওখানে দু'চার জনের জামা কাপড়ে লাল, নীল, সবুজ রঙের ছাপ রাখিয়া যায় তেমনই সহরে গ্রামে, পথে ঘাটে দু'চারজন ছিটগ্রস্ত খদ্দরধারী মানুষ বিগত দিনের স্মৃতি জাগাইয়া সভা-সমিতি করিত, চরখা কাটিত, রোগীর সেবা করিত এবং ছেলে পড়াইত। উনিশ শ' ত্রিশ সালে তাহারা ছিল বীর, পাঁচ বৎসর পরে তাহারা হইয়াছিল আত্মীয়-বন্ধুর কৃপার পাত্র, এককথায় ভ্যাগাবণ্ড।

একতলার দক্ষিণ দিকের ঘরে সুমন্ত্র খাইতে বসিয়াছিল। তাহার পিছন দিকের নোনা-ধরা দেওয়ালে ঠিক তাহার মাথার উপরে বাঙলা ক্যালেণ্ডার হইতে কাটা একটি 'সাত' অক্ষর আঠা দিয়া আঁটা, তাহার উপরে বড় বড় অক্ষরে আলকাতরা দিয়া লেখা 'ছয় পয়সার কম খাওয়া নাই।' এই ঘোষণা-

পত্রটি হোটেলের আভিজাত্যের নিদর্শনস্বরূপ রাখিতে হয় বলিয়া রাখা, কার্যক্ষেত্রে সকলকেই যে ইহার নির্দেশ মানিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। আপনি দুই পয়সার ভাত এক পয়সার মসুর ডাল দিয়া খাইয়া আসিলে কেহ আপত্তি করিবে না, কেবল থালা ও গ্লাসটি আপনাকে মাজিয়া দিয়া আসিতে হইবে। সুমন্ত্রর মাথার উপর দেড়-মানুষ উঁচুতে একখানি বাঁধানো ছবি, তাহার মধ্যে ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ তাঁহার স্বর্গীয় পিতার মতো মুখ করিয়া টেবিলের উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া মহাত্মা গান্ধীর করমর্দন করিতেছেন। তাহার পাশে আর একখানি ছবির মাঝখানে দাঁড়াইয়া বন্দিনী ভারতমাতা হাসিতেছেন। তাঁহার চারিপাশে বেজায় ভিড়, জীবিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাঁহার বন্ধন মোচন করিবার জন্য সপ্তরথীর মতো উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন এবং ঊর্ধ্বে আকাশ হইতে দেশবন্ধু, মতিলাল, তিলকমহারাজ প্রভৃতি পরলোকগত নেতৃবৃন্দ বড়ো বড়ো পুষ্প বর্ষণ করিতেছেন। ঐ ছবিটির পাশে একখানি কালীঘাটের কালীমাতার পট, তাঁহার পাশে একখানি 'নিপ্পন-ইয়েসান-কাইসা'র জাহাজের ছবি দেওয়া ক্যালেণ্ডার এবং একখানি পুরাতন ঘুড়ি। ঐ ঘুড়িটি হোটেলের চাকর বিশ্বকর্মা-পূজার দিন ধরিয়াছিল। সুমন্ত্রের দক্ষিণের, বামের এবং সম্মুখের দেয়ালে শীতলামাতা, গঙ্গা ও শান্তনু, এবং দেশী ও বিলাতী ছায়াচিত্র-তারকাদের আরও সাতখানি ছোটো বড়ো ছবি বাঁধানো আছে, তাহা ছাড়া অনেকগুলি কাপড়ের ট্রেডমার্ক, থিয়েটার ও বায়স্কোপের সচিত্র বিজ্ঞাপন এবং সিগারেটের বাক্সের ছবি আঠা দিয়া আঁটা অবস্থায় চতুর্দিক হইতে কর্তৃপক্ষের শিল্পরুচির পরিচয় দিতেছে। সুমন্ত্রর কিন্তু ওসব দিকে নজর দিবার সময় ছিল না, সে দুই পয়সার ভাত চার পয়সার মুগের কারী দিয়া খাইতেছিল। সেইদিনই সে চব্বিশ পরগণার একটি গ্রাম হইতে ফিরিয়াছে। ভাঙ্গড়ের কাটা-খালে আসিতে আসিতে মণ্ডল কোম্পানীর ছাগল, মাছ, ডিম ও আনাজের ঝোড়া বোঝাই মোটরলঞ্চ যথারীতি মধ্যপথে বিগড়াইয়া যাওয়ায় ঠাকুরদাঁড়ি হইতে হাঁটিতে হইয়াছে; কমপক্ষে সকাল হইতে চার ক্রোশ হাঁটা হইয়াছে। বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে; ক্ষুধায় তাহার উদরে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিতেছিল। নিজের জন্য খরচ সে সাধ্যমতো করে না, তাই আর দুই পয়সার ভাত এবং চার পয়সার দধির ফরমাস করিবে কি না সে বিষয়ে স্থির-সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিতেছিল না।

এমন সময় ঘরে ঢুকিল ভদ্রেশ্বর। ছেলেবেলার বন্ধু, পাঁচ বৎসর মথুরাবাবুর মাইনর স্কুলে একসঙ্গে পড়িয়াছিল, মধ্যে দুই-একবার পথে দেখা হইয়াছে, আজ তেরো বৎসর পরে এই পাইস-হোটেলে সহসা আবার সাক্ষাৎ। সুমন্ত্র একমনে খাইতেছিল, মাথা তুলে নাই, ভদ্রেশ্বরই প্রথমে তাহাকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "আরে কে ও? সুমন্ত্র না? বেঁচে আছিস তা হ'লে? ওঃ, কতকাল পরে দেখা?" সুমন্ত্র মুখ তুলিয়া বিমূঢ়ের মতো হাসিল। বলিল, "ভদ্রেশ্বর না?" ভদ্রেশ্বর বলিল, "হাঁরে হ্যাঁ, ভদ্রেশ্বর। তোদের 'কুমড়োপটাশ'।" বলিতে বলিতে তাহার বাঁ-পাশের খালি পিঁড়াটায় বসিয়া সশব্দে তাহার পিঠে একটা থাপ্পড় মারিয়া বলিল, "বন্ধুবর, চিনতে পারছ না? এতদিন কোথায় লুকিয়েছিলে বৎস? আমি যে বৎসহারা গাভীর মতো তোমায় গরুখোঁজা করে বেড়াচ্ছি। যাক্, এখন কেমন আছিস বল? কি করছিস? থাকিস কোথায়? এখানে কি করতে এসেছিস?" বলিতে বলিতে পকেট হইতে চিরুনি বাহির করিয়া মাথার ব্যাকব্রাশ করা চুলটা আর একবার ঠিক করিয়া লইল।

সুমন্ত্র বলিল, "উপস্থিত করছি বিনাপয়সার স্কুল-মাষ্টারি। অনেক কিছু ক'রে শেষ পর্যন্ত আর্থিক প্রয়োজনে একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে ঢুকেছিলুম, বছরে যত টাকার কাজ যোগাড় করবার কথা ছিল তার অর্ধেকও করতে পারিনি, তাই আজ কিছুদিন হ'ল ছাড়িয়ে দিয়েছে। নামে কলকাতাতেই আছি সেই বাড়িতেই তবে গ্রামেই কাটে বেশীর ভাগ সময়। আর এখানে আমি যে কেন এসেছি সে তো বুঝতেই পারছ, কিন্তু তুমি কেন এসেছ সেইটেই বুঝে উঠতে পারছি না।" বাল্যবন্ধুর সুপুষ্ট বিপুল দেহের পোপদস্ত চুনটকরা জামা কাপড়, বিশেষ করিয়া হীরার আংটিটির দিকে চাহিয়া তাহার 'তুই' বলিবার সাহস হইল না। এই প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রেশ্বর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "ও ভুলে গেছলুম! তুই বুঝি কলেজে পড়েছিস, সভ্য হয়েছিস? 'তুই' বলতে বাধে? তা বলে আমি কিন্তু 'তুই' ছাড়ছি না। হ্যাঁ, যে কথা জিজ্ঞেস করেছিস, এখানে উদয় হলুম কি ক'রে। শ্যাখ, আমার ঠাকুরদা ছিল বেজায় কঞ্জুস, জানিস তো পাড়ার লোকে সকালে নাম করত না। ঠাকুরদা বলত, 'পরবে ছেঁড়া ট্যানা, খাবে গুড়ের পানা, তবে হবে লক্ষ্মীর থানা।' যাক, লাউ, কচু আর কুমড়োর ঘ্যাঁট শুধু নিজে খায়নি, আমাকেও বারো বছর পর্যন্ত খাইয়েছে। ঠাকুরদা মরতে বাবা বুড়ো হল,

কিন্তু তখনও তার সখ মেটে নি। বললে, "দুত্তোর লক্ষ্মী। বাবা তিন লাখ টাকা রেখে গেছে, সেও ছানা পাড়ছে, লক্ষ্মী যাবে কোথায়? তবে হ্যাঁ, হাজার হোক বাবা বলে গেছে, যে সে নয়, আপন ফাদার (বাবা দু'বছর ইংরিজি পড়েছিল) তার কথাটা একেবারে অমান্য করব না। পরব ছেঁড়া ট্যানা, খাব ঘি, ছানা।"

গোত্রপরিচয়হীন হোটেলের ঠাকুর পাশের ঘরে একঘেয়ে টানা স্বরে ফিরিস্তি দিতেছিল—"বারো নম্বর ভাত, ডাল, মাছের কারী, তেরো নম্বর ভাত, আলুপোস্ত; পনেরো নম্বর ভাত, ডাল, আলুভাজা, মুগের কারী, চচ্চড়ি, মাছের দোরমা, মাছভাজা, মাছের কারী, দই; সাত নম্বর—ভাত, মুগের কারীইইই"—

ফর্দ শেষ করিয়া সে আসিয়া ভদ্রেশ্বরকে বলিল, "আপনাকে কি দোব বাবু?" ভদ্রেশ্বর সুমন্ত্রর দিকে চাহিয়া ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "কিরে, কি নোব? আচ্ছা, এখন ভাত আর পুঁই শাকের চচ্চড়ি নিয়ে এসো তো আগে"—

পরিচারকটি, বাবুর পোষাকের সহিত আহারের অসামঞ্জস্যে ব্যথিত হইয়া বলিল, "আজ্ঞে, আজ চিংড়ি মাছের কাটলেট আছে, ভেটকি মাছের কোরমা, ধোঁকার ডালনা"—

ভদ্রেশ্বর বলিল, "আচ্ছা, এই বাবুকে এনে দাও। নেঃ নেঃ, ফাজলিমি করিসনি, আমার রোজগারের পয়সা নয় যে তোর মানহানি হবে। আমি বাপের হোটেলে মাগ্‌না খাই, তুই পাইস-হোটেলে পয়সা দিয়ে খাস। খুঁত খুঁত করিসনি।"

সুমন্ত্র বলিল, "আমি যে নিরামিষ খাই ভাই।"

ভদ্রেশ্বর বলিল, "ঠাকুর, কাঁচকলার কোফতা, আলুর দম আর ধোঁকার ডালনা,—জলদি বোলাও।"

সুমন্ত্র আর আপত্তি করিল না, ভদ্রেশ্বর খাইতে খাইতে বলিয়া চলিল, সে একমনে শুনিতে লাগিল।

ভদ্রেশ্বর বলিল "হ্যাঁ, যে কথা বলছিলুম। বাবা মারা গেছে আট দশ বছর হ'ল। ছিটের কোট প'রে তক্তপোষে ব'সে তেজারতির কারবার যে-রকম চালাচ্ছিল, তাতে আরও দু'দশ বছর বাঁচত। তবে গেরোর ভোগ, জন্ম গেছে কচু-কুমড়ো খেয়ে, ঘি, ছানা এক রকম ক'রে সয়েছিল, অখাদ্যটা আর সইল না। দম আটকে মারা গেল।"

সুমন্ত্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কিরে?"

ভদ্রেশ্বর বলিল, "হ্যাঁ, সত্যি। বোষ্টমের ঘরে মুর্গি সইবে কেন? বাড়ীতে কেউ জানত না, আমি এনে দিতুম টিফিন-কেরিয়ারে করে। দেশী বিলিতী ছোটো বড়ো হোটেল রেস্তোরাঁয়, যেখানে যা ভালো জিনিস পাওয়া যায় আমার তো জানতে বাকী ছিল না, বাবাই চুপি চুপি চেখে আসতে পাঠাত নিজে খাবার আগে। যাক, সেদিন শনিবার সন্ধ্যাবেলা সকাল সকাল কাজকর্ম সেরে মা গেছে নন্দীদের ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিতে চাকর সঙ্গে নিয়ে, বাবা বললে, 'দোতলার ঘরে নিয়ে আয়।' নিয়ে এলুম। কি দোষ বল, পিতৃ-আজ্ঞা। বাড়ি ঢোকবার সময় দু'হাত জোড়া, বাইরের দরজায় খিল দিতে ভুল হয়ে গেছে। আসবি তো আয়, সেইদিনই ঠাকু'মা নবদ্বীপ থেকে ফিরেছে। বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে, ভাড়া দেবে,—তার টাকা ভাঙাতে পারছে না, দরজা খোলা পেয়ে বলা নেই, কওয়া নেই—সোজা দোতালার ঘরে এসে হাজির। বাবা তখন পরিতৃপ্তি করে হাড়টি চুষছে, মুখ থেকে বার করলেই আমি জানালা দিয়ে পাশের বস্তির খোলার চালে ফেলে দেব, কাগে ফেললে না বগে ফেললে কেউ টের পাবে না, হঠাৎ সব শেষ।" ভদ্রেশ্বর থামিয়া গেল, সুমন্ত্র অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "গলায় আটকে গেল?"

ভদ্রেশ্বর বলিল, "আটকাবে কেন, ইচ্ছে ক'রে আটকে দিলে। মাতৃ-ভক্ত ছেলে, মায়ের মনে কষ্ট দিলে না, মুখ আর খুললে না। অতবড়ো মুরগীর ঠ্যাং গলা দিয়ে নামবে কেন? খানিকক্ষণ ঘড় ঘড় শব্দ, চোখ গেল কপালে উঠে, ঠাকু'মা ছুটে এসে বললে, 'কি হয়েছে বাবা, অমন করছ কেন?' আর অমন করছ কেন। আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি, হাত নেড়ে বারণ করলে, কিছু লিখতে চাইলে। খাতাপেন্সিল এনে দিলুম, ঠাকু'মা তখনও জড়িয়ে ধরে আছে, অসহ্য যন্ত্রণায় বাঁ-হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধরে বাবা ডান হাত দিয়ে লিখলে, 'আই শেম, কাওয়ার্ড। লাভ মাদার, ইউ ইট হোয়াট লাইক।" বলিতে বলিতে ভদ্রেশ্বরের চোখ সজল হইয়া আসিল। বলিল, "তোরা হয়তো ইংরিজি শুনে হাসবি, কিন্তু কত বড় উদার মন বল দিকি? মরবার সময় পিতৃ-আজ্ঞা দিয়ে গেল—তুমি যা খুশী খেয়ো। ক'জন পারে?"

সুমন্ত্র রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছিল। বলিল "তাবপর?"

ভদ্রেশ্বর পরিতৃপ্তি-সহকারে পুঁইডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "তারপর আর কি? পুণ্যাত্মা লোক ছিল, সজ্ঞানে পনেরো মিনিটের মধ্যে স্বর্গে চলে গেল। ঠাকু'মা আর শ্রাদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করলে না। নিজের পায়ের ধুলো নিয়ে বাবার মাথায় বুকে মাখিয়ে দিলে, তারপর সেই যে বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করছিল, তাকেই ডবল ভাড়া দিয়ে স্টেশনে ফিরে গেল—নবদ্বীপের ট্রেণ ধরতে। সেই থেকে আর এ বাড়িতে আসেনি, চিঠি লিখলে জবাব দেয় না।" সুমন্ত্র অবাক হইয়া ভাবিতেছিল, ভদ্রেশ্বরের পিতার কথা। জগতের ইতিহাসে অনেক মাতৃভক্তের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু মাতৃভক্তির আতিশয্যে গলায় মুরগীর ঠ্যাং আটকাইয়া মারা গিয়াছেন এরূপ মাতৃভক্ত মহাপুরুষ দুর্লভ। উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া দুর্গেশ দুমরাজ প্রাণ দিয়াছিলেন, তাঁহার সম্মানে দেড়শত বৎসর পরে কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু বাংলা দেশের রাজধানীতে তাঁহারই সময়ে জীবিত থাকিয়া এই যে কাব্যে-উপেক্ষিত ব্যক্তিটি মাতৃভক্তি এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিরোধ মিটাইতে গিয়া স্বেচ্ছায় প্রাণ দিল, তাহার জন্য সকরুণ কবি-লেখনী হইতে একছত্র প্রশংসা-বাক্যও নিঃসৃত হইল না। সুমন্ত্র প্রথমে ভাবিল, নিজেই কবিতা লিখিয়া বত্রেশ্বর কুণ্ডুকে অমর করিয়া যাইবে; পরক্ষণেই মনে হইল, যদি-ই দৈবক্রমে কবিতাটি উৎরাইয়া যায়, মুর্গী খাওয়ার উল্লেখ থাকায় মুসলিম লীগ রাজত্বে টেক্সট-বুকে স্থানলাভ করে, তাহা হইলে? তাহা হইলে শত বৎসর পরেও ঐ কবিতা মুখস্থ করিতে করিতে এবং উহার সন্ধি-সমাস ভাঙিতে ভাঙিতে ছাত্রছাত্রীরা তাঁহাকে অভিশাপ দিবে। নাঃ, কাজ নাই কবিতা লিখিয়া! তাহা ছাড়া 'মুরগী' এবং 'ঠ্যাং' কোনটিরই পছন্দমতো মিল পাওয়া যাইতেছে না।

ভদ্রেশ্বর তখনও খাইতেছিল, সুমন্ত্র আহারান্তে জল খাইয়া বলিল—"তারপর? তুই এখানে কি করছিস?" তাহার কথাবার্তা সহজ হইয়া আসিতেছিল। ভদ্রেশ্বর বলিল, "বাড়িতে সাদা ভাত হয় না, দু-বেলা ঘি-ভাত, পোলাও, মাংস, লুচি এই সব। মাঝে মাঝে বিলিতী খানাও আসে। বৌ বলে, 'পরবে হীরেদানা, খাবে ঘি-ছানা, শরীর হবে চাঁদপানা।' তা চাঁদপানা হয়ে এসেছে শরীর। আমার ওজন আড়াই মণ, গিন্নীর দু' মণ বত্রিশ সের। পুরো গোল হতে আর বেশি দেরি নেই।" বলিয়াই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "এখানে মুখ বদলাতে আসি মাঝে

মাঝে।" তাহারা লক্ষ্য করে নাই, এতক্ষণে আর-একজন ভদ্রলোক ভদ্রেশ্বরের পাশের পিঁড়াটিতে খাইতে বসিয়াছিলেন। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "খাচ্ছেন তো পুঁইশাক, হাসি যে আর ধরে না? ঘরে আর পাঁচজন ভদ্রলোক আছে, সেটা ভুলে যাবেন না"—

ভদ্রেশ্বর অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "মাফ করবেন, অনেক দিন পরে দেখা। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা হচ্ছিল দু'টো।" তারপর সুমন্ত্রর দিকে ফিরিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিল, "কুক্ষণে বাবা নাম দিয়েছিল ভদ্রেশ্বর। কথায় বলে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন আমার হয়েছে তাই। আজ পর্যন্ত তোদের ঐ ভদ্রতাটা ধাতস্থ হ'লনা। বৌয়ের কাছে ভদ্রতা শিখতে শিখতে জীবন বেরিয়ে গেল, একপাল ভদ্রলোকের জ্বালায় নিজের ঘরে হাঁচি-কাসি বন্ধ ক'রে ব'সে থাকতে হয়। এখানে পালিয়ে আসি দু'দণ্ড হাঁফ ছেড়ে বাঁচব ব'লে, তা এখানেও নিস্তার নেই? কোথায় যাই বল দিকি?"

সুমন্ত্র হাসিল। ভদ্রেশ্বর বলিল, "তুই বেশ আছিস, ভাই। তোকে দেখলেই ভদ্দরলোক বলে মনে হয়, কোনো কুস্তি-কসরতের বালাই নেই। ওঃ, আমার যে কি দিন গেছে। রেগুলার মাস্টার রেখে বিলিতী ভদ্রতা শিখেছি, জানিস? একলা নয়, স্ত্রী-পুরুষে। এখানে আর কি দেখাব তোদেব? টেবিলই নেই তো টেবল-ম্যানার্স! সত্যি, তোরা বেশ আছিস মাইরি! তোর বৌ বকে না এখানে খেতে আসিস ব'লে? এ কিরে? তুই আর কিছু নিলি না? উঠে পড়ছিস?"

সুমন্ত্র বলিল, "আর না ভাই, পেট ভ'রে গেছে। তোর হ'ল? নে, তাহ'লে উঠে পড়।"

কলতলায় আঁচাইয়া হোটেলের প্রাপ্য মিটাইয়া দুইজনে পথে বাহির হইল। ভদ্রেশ্বর বলিল, "কতদূর পড়েছিলি?"

"সবাই যা পড়ে, এম-এ আর ল।"

ভদ্রেশ্বর বলিল, "সবাইয়ের কথা বলিস নি, আমি পড়ি নি। তারপর? ছবি আঁকিস এখনো? ওকালতি করলি না কেন? ধর্মে বাধল? ধর্ম করলে খেতে দেবে তোকে কেউ? এখন কি করছিস বললি? মাস্টারি? দেয় কত?"

সুমন্ত্র বলিল, "স্বদেশী করছি। অজ-পাড়াগাঁয়ে স্কুল খুলেছি বিনা মাইনের, সেইসঙ্গে হয় চাকরী, না হয় ব্যবসা, একটা কিছু করি মাঝে মাঝে। নিজের

জন্যে ভাবি না, টাকা থাকলে অনেক কাজ করে যেতে পারতুম। আমার তো তিনটি সহকর্মীকে খাওয়াতেই জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে। তবু মুষ্টিভিক্ষাটা পাই তাই রক্ষে।"

ভদ্রেশ্বর বলিল, "তোকে বলতে ভরসা হয় না, আমার কাছে টাকা নিতে তোর আপত্তি আছে? না-না, দান নয়, চাকরীর কথাও বলছি না, তোর দেশের জন্যেই ফাঁকতালে কিছু উপার্জন। ধর, এখনি আমার একটা বাড়ির দরকার এ-পাড়ায়, একা থাকবার মতো, এই হাজার-দশেক টাকার মধ্যে। পাঁচশ' টাকা দালালি দেব, যে-কেউ যোগাড় ক'রে দেবে তাকে। তুই নিজে না নিস, তোর স্কুলের কাজে লাগাতে পারিস। ভ্যাখ্ না, যদি পারিস।"

সুমন্ত্র বলিল, "কেন, তোদের সেই ছকু খানসামার লেনের বাড়ি কি হ'ল? ভাড়া দিবি?"

ভদ্রেশ্বর বলিল, "তুই এখনও নাইণ্টিনথ্ সেঞ্চুরিতে আছিস দেখছি! সাতকাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে সীতা রামের বাবা! আরে তবে আর এতক্ষণ বলছি কি? সে বাড়ী তো কবে বেচে মেবে দিয়েছি, এখন বালিগঞ্জে বাড়ি করেছি যে! এখন আমি কি সেই ভদ্রেশ্বর আছি, এখন যে আমি মিস্টার কুণ্ডু। এখন বাড়ীতে মুর্গী কাটা হচ্ছে, টি-পার্টি হচ্ছে। থেকে থেকে মিহি গলায় ডাক উঠছে 'বোয়, খানা লাও।' চাকররা কেউ সাহেব না ব'লে বাবু বললে ফাইন হয়, জানিস? লুচি-রুটিও ছুরি দিয়ে কেটে কাঁটায় বিঁধে মুখে পুরতে হয় বাড়ীতে টেনিস-কোর্ট আছে।"

সুমন্ত্র বলিল, "তাহলে তো সুখেই আছিস। এ গরিব-পাড়ায় আবার কেন?"

ভদ্রেশ্বর বলিল, "না ভাই, বেশি সুখ আর সহ্য হচ্ছে না। এজমালি বাড়িতেও আর পোষাচ্ছে না। ভেন্ন হব ঠিক করেছি।"

সুমন্ত্র বলিল, "ভেন্ন হবি কার সঙ্গে? তুই তো বাপের এক ছেলে?"

ভদ্রেশ্বর বলিল, "আর বলিস কেন? বৌ বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে, দিনরাত খাওয়া-পরা আর বড়মানুষীর গল্প ভালো লাগে না। এদিকে ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স তো শেষ হয়ে এল। সময় থাকতে রাশ না টানলে চলছে না। একখানা ছোট্ট বাড়ি দেখে দে, দশ-পনেরো হাজারের মধ্যে। আশেপাশে রেডিও থাকবে না, আর দক্ষিণটা খোলা থাকবে। আমি থাকব, আর আমাদের সেকালের চাকর রামশরণ থাকবে, ব্যস্।"

সুমন্ত্র বলিল, "কি করবি সে বাড়িতে ?"

ততক্ষণে তাহারা চলিতে চলিতে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পাশে আসিয়া পড়িয়াছে। ভদ্রেশ্বর আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "খা'ব-দা'ব আর কবিতা লিখব।"

'কবিতা!' সুমন্ত্রর মনে পড়িল শৈশবে ভদ্রেশ্বর কবিতা লিখিত বটে। একবার ভূধরবাবুর গ্রামারের ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়াছিল—'গ্রামার ইজ দি আটা-কাটি, মেরে দিয়েছি চডাই পাখি।' বলা বাহুল্য, সেদিন বেতের মাত্রা কিছু বেশি হইয়াছিল। আর একদিন বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়ের বিদায়-সভায় সে গলা কাঁপাইয়া কবিতা পড়িয়াছিল,

সহসা নির্মলাকাশে মেঘোদয় প্রায়
আমাদের বিষ্টুবাবু নিলেন বিদায়।
কভু মিথ্যা, কভু সত্য, অন্য নাহি হয়,
মিথ্যা নয়, সত্য ভাই নিলেন বিদায়।



কুড়োবা কুড়োবা লিজ্যে

মেরেছেন তিনি বটে আমাদের ধ'রে,
সে কেবল আমাদের কল্যাণের তরে।

বেত্রাঘাত করেছেন যবে মুহুর্মুহুঃ
গলে নাই চিত্ত তাঁর শুনি আহা, উহু।
'কুড়োবা কুড়োবা লিজ্যে' করিয়া প্রচার
জ্ঞাননেত্র খুলেছেন তিনি সবাকার।
আজ তিনি চলিলেন আমাদের ছাড়ি',
আর না দেখিব মোরা ওই পাকা দাড়ি।
কাঁদিছে বালকবৃন্দ বিচ্ছেদের খেদে।
গুরুভক্তি মহাধর্ম লিখিয়াছে বেদে ;
অতএব বিভুপদে এই নিবেদন,
বিষ্ণুবাবু যেন আরো দীর্ঘজীবী হ'ন।

সেদিন তাহার কবিতা না দেখিয়া পড়িতে দেওয়ার জন্য হেডমাস্টার মহাশয় সেকেণ্ড-মাস্টার মহাশয়কে ধমক দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ভদ্রেশ্বর সেকেণ্ড মাস্টারকে অন্য লেখা দেখাইয়াছিল। আর একবার সে পরীক্ষার খাতায় 'কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে সাপ বাহির হইল'র কবিতার অনুবাদ করিয়াছিল, Who (চোঁ) টু ডিগ ডিগ, সারপেণ্ট কেম আউট বিগ।' সবচেয়ে হাসি পাইল তাহার নিজের বাড়ির ঘটনাটা মনে পড়িয়া। সুমন্ত্রের বাবার বন্ধুরা প্রায়ই তখন তাহাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিতেন, তাহার মা তাঁহাদের যত্ন করিয়া নানারকম খাবার করিয়া খাওয়াইতেন। সুমন্ত্রর সাধ হইল সেও তাহার বন্ধুদের বাড়িতে আনিবে। মার খুব মত ছিল না, তাহার বন্ধুদের উপর তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধাও ছিল না। নেপথ্যে থাকিয়া তাঁহার পুত্রের চুলে বালি, জামায় কালি প্রভৃতি দিয়া তাহারা তাঁহার যথেষ্ট শান্তি ভঙ্গ করিত ; তবু তিনি সুমন্ত্রকে 'না' বলিতে পারিলেন না, সেই দিনই ছুটির পর একটি বন্ধুকে সঙ্গে আনিবার অনুমতি হইল। সুমন্ত্র বহু চিন্তার পর ভদ্রেশ্বরকে বাড়ী লইয়া গেল। অনেক শিখাইযা পড়াইয়া লইয়া যাওয়া সত্ত্বেও সে এমন দুই-চারিটি মন্তব্য করিল যাহাতে মা চটিলেন। তাহারা খাইতেছে এমন সময় তাহার বাবা কোর্ট হইতে ফিরিলেন। তিনি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছেন, রান্নাঘর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া ভদ্রেশ্বর প্রশ্ন করিল, "ঐ গুণ্ডার মতন লোকটা কে রে?" সুমন্ত্রের মা অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন। সুমন্ত্র মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "আমার বাবা।"

ভদ্রেশ্বর বলিল, "তোর বাবা তো লাসখানা কম নয়। সাতটা বাঘে ছিঁড়ে খেতে পারবে না। আমার বাবা, মাইরি, থেঁকুরেপানা। ঠাকুরদা না খেতে দিয়ে দিয়ে আরো দফা সেরে দিয়েছে।" তারপর আর এক-গাল লুচি ও আলুর দম খাইয়া বলিল, "আমি কিন্তু বড়ো হয়ে তোর বাবার মতো হব। হ্যাঁরে, তোর বাবার অত বড় দাড়ি হল কি করে রে? দাড়িতে গন্ধ-তেল মাখে বুঝি?" পরক্ষণেই বাবাকে উদ্দেশ করিয়া সুর করিয়া বলিল—

"আই অ্যাম ভেরি সরি।
বিকজ ইয়োর লম্বা দাড়ি।"

মা বলিলেন, "বাবা, তোমার খাওয়া তো হয়ে গেছে; এবার তাহ'লে বাড়ি যাও। এ বাড়িতে আর এসো না।" তখন সুমন্ত্রের বয়স সবে দশ বৎসর; সেইদিন হইতে সতেরো বৎসর বয়সে কলেজে ঢোকা পর্যন্ত সুমন্ত্রের বাড়িতে বন্ধু আসা বন্ধ ছিল।

একে একে অনেক কথাই মনে পড়িতেছিল। সুমন্ত্র প্রশ্ন করিল, "তুই তাহ'লে এখনো কবিতা লিখিস?" তাহারা ততক্ষণে হ্যারিসন রোডের চৌমাথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভদ্রেশ্বর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "লিখতে আর সময় পাই কোথায় ছাই? সকাল থেকে সন্ধ্যে দেহের পরিচর্যা, খাওয়া আর আড্ডা, হয় ব্রিজ, নয় টেনিস, নয় বিলিয়ার্ড। সন্ধ্যে হ'ল তো থিয়েটার, নয় বায়োস্কোপ। বদখেয়ালী কিছু নেই, তাই এখনো দুমুঠো জুটছে, না হ'লে এতদিনে সব উড়ে যেত। যাক, যে কথা বলছিলুম। গিন্নী ভয়ানক চটেছে, বাড়িতে আর কবিতা লেখার উপায় নেই। একবার তার ছোটো বোনের বিয়েতে আমাকে পদ্য লিখতে বলে। আমার মাথায় তখন অন্য একটা কবিতা ঘুরছে—'কাঁকুড়ের প্রেম।' সবেমাত্র কয়েক লাইন লিখেছি,—

'হায়!
কি হবে উপায়!
বস্তিবাটী-লোক্যালের বক্ষ হতে নেমে
কুমড়ো পড়িয়া গেল একদিন কাঁকুড়ের প্রেমে।
করোলা, পটোল, উচ্ছে সে সংবাদ জানিল না কেহ।

ঈর্ষায় মরিল ফাটি' 'ফুটি' শুধু করিয়া সন্দেহ।
ফ্যাকাসে মারিল কচু, লঙ্কা হ'ল আরক্ত লজ্জায়।
রহিল না গুরুলঘু, জাতিধর্ম যায় সব যায়।'

এমন সময়ে এসে বললে, "এইমাত্র টেলিগ্রাম পেলুম, পরশু অণিমার বিয়ে। চট করে একটা কবিতা লিখে দাও তো, কালকেই যাতে ছাপিয়ে নিতে পারি।" কবিতা যেন গাছের ফল, পেড়ে দিলেই হল। আমি যত বলি, "এখন মাথায় আসছে না," কিছুতে শুনবে না। তখন লিখে দিলুম—

'অণিমা তোর বিয়ে হ'ল,
হ'ল একটা মস্ত কাজ।
কেলে ধেড়ে মেয়েগুলোর
বিয়ের ভাবনা ঘুচল আজ।'

সেই থেকে, ভাই, গিন্নী এক মাস আমার সঙ্গে কথা কয়নি।"

সুমন্ত্র বলিল, "সে তো পুরোনো কথা। সম্প্রতি কি হ'ল?"

ভদ্রেশ্বর বলিল, "আসছি, আসছি, পরিস্থিতি না কি বলে তোদের, সেটা বুঝতে হলে 'কণ্টেক্সট্' একটু না জানলে হবে কি করে? তারপর আর একদিন বর্ষার রাত্রে আর এক কাণ্ড! বিদুষী বৌয়ের বিচিত্র ফরমাস। বললে, 'মন্দা-ক্রান্তা ছন্দে একটা কবিতা লেখো,—খুব করুণ করে।' কি করি? ফরমাসী কবিতা আসে না, তবু কষ্টে স্বষ্টে লিখলুম—

'বঙ্গের সন্তান, ভেবোনা অকারণ,
ভাবলে পুরে কার মনস্কাম!
এন্তার পান্তায় লবণ মেখে লও,
আপনি বাঁচলেই বাপের নাম!
ষষ্ঠীর দৃষ্টির অভাব হবে না;
পত্নী, প্লীহা আর পাওনাদার,—
যদ্দিন বাঁচবে ছাড়বে নাকো, ভাই,
মিথ্যা চিন্তায় কি ফল তার?'

গিন্নী তারপর দু'মাস আমার সঙ্গে কথা কইলে না বায়োস্কোপে গেল না, পার্টিতে গেল না, ঘরে ব'সে ব'সে আরও আধ মণ ওজন বাড়িয়ে ফেললে।"

"তারপর ?"

"তারপর একদিন পায়েই ধরলুম অগত্যা। বেশ করুণ করেই গান ধরলুম,—

'তুমি শালী নও, শালাজ নও—ধার করে পোলাও খাওয়াই,
পাখী নও যে খাঁচায় পুষি নিয়া,
(যদি পতি না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
ফিরিয়া করিতাম আমি বিয়া।')

বৌ হেসে ফেললে, খাস বাংলায় বললে, 'মরণ আর কি ?' বাব্বাঃ, জীবন ফিরে এল ধড়ে, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।"

ম্যাট্রিক ফেল হইলে কি হইবে, ভদ্রেশ্বর বাড়িতে বসিয়া তাহা হইলে কাব্যচর্চা ভালোরূপেই করিয়াছে। সুমন্ত্রের কবিখ্যাতি আছে, কিন্তু হাসির কবিতা তাহার এত সহজে আসে না।

সুমন্ত্র হাসিয়া বলিল, "তারপর শেষ কি ঘটেছে সেই কথা বল ? বাড়ি ছাড়বি কেন ? গিন্নী তো দেখছি তোর কবিতার খুব ভক্ত; না হ'লে তোকে বারবার কবিতা লিখতে বলেন ? তুই নিজের দোষেই তো তাঁকে চটিয়ে দিস। আজ আবার ঐ রকম কবিতা লিখেছিস বুঝি ?"

ভদ্রেশ্বর বলিল, "সে আর বলিস নি। আমার মেজো শালী তনিমা কাল বিকেলে জব্বলপুর থেকে এসেছে তার দেওরকে সঙ্গে নিয়ে, দিদির সঙ্গে দেখা করতে। তার রংটা একটু ফরসা, অণিমার মতো কালো নয়। আমার সঙ্গে দেখা হতেই শালীর নাকটা একটু ওপর দিকে উঠে গেল, এই সিকি ইঞ্চিটাক। মনটা বড়োই খারাপ হ'য়ে গেল। কি ক'রব একে অতিথি, তাতে শালী! চুপ ক'রে গেলুম। আজ সকালে ঘরে কেউ নেই, গিয়ে খাটের ওপর দেখি একটা প্যাড আর একটা ফাউন্টেন পেন প'ড়ে। বোধ হয় বরকে চিঠি লেখা হয়েছে একটু আগে। ভাবলুম, দু' ছত্র প্রাণের কথা লিখে রেখে যাই। তা' ছাড়া সম্পর্কে শালী, দোষ কি ? লিখলুম :

'এবার ম'রে 'তনি' হ'ব।

বড়ো বোনের ঠাকুরপোটা কালো মোটা, তা'কে দেখে নাক সেঁটকাব।'

'ঠাকুরপোটা'টার পাশে অ্যাস্টারিক্স দিয়ে তলায় লিখে দিলুম 'ঠাকুর = বাবা = শ্বশুর, ঠাকুরপো = স্বামী।"

সুমন্ত্র বলিল, "তারপর ?"

"তারপর আর কি ? দুপুরে ঝি এসে ডেকে নিয়ে গেল, গিয়ে দেখি দুই ভগ্নী বিচারাসনে সমাসীন। আমাকে দেখে ছোটোর ঠোঁট দুটো এবং নাকটা ঈষৎ কেঁপে উঠল, চোখের নৈঋত কোণ দিয়ে আধ ফোঁটা জল গালের ওপর গড়িয়ে এল। তাজমহলের সঙ্গে মিল আছে কি না বোঝবার চেষ্টা করছি, ওমা! কোথাও কিছু নেই, গিন্নী 'অসভ্য, ইতর, ছোটোলোক'—এইসব যা'তা ব'লে গালিগালাজ করতে আরম্ভ ক'রলে। যত বলি 'অপরাধ হয়েছে, মাফ করো' তত আরো বাড়িয়ে চলে। ব'লে—'আমার গলায় দড়ি জোটে না, তাই তোমায় বিয়ে করেছিলুম। যেমন বিদ্যে, তেমনি বুদ্ধি।' ইংরিজি, বাঙলা কত কি যে সে ব'ললে ভাই, অর্ধেক কথার মানেই বুঝতে পারলুম না। তিন বচ্ছর কলেজে পড়েছে কি না, কথায় কথায় ইংরিজির বুক্‌নি ঝাড়ে। শেষে ব'ললে 'হয় এ বাড়িতে তুমি থাকবে, না হয় আমি থাকব। তোমার মতো ছোটোলোকের সঙ্গে কোনো ভদ্রমহিলা এক বাড়িতে থাকতে পারে না।' আমিও শেষে, 'দুত্তোর, তুমিই থাকো, আমি চললুম' ব'লে বেরিয়ে এসেছি। ভাবছি, সুখ তো ঢের হ'ল, এইবার বাকী জীবনটা আলাদা কোথাও গরিবী চালে শান্তিতে থাকব। তুই একটা বাড়ি দেখে দে দিকি।"

ভদ্রেশ্বর তাহা হইলে নিতান্ত অপমানিত হইয়া একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে? কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া কে বলিবে—তাহার মনে কোনো দুঃখ আছে? পাইস-হোটেলে খাওয়াটা অর্থাভাবে নয় তো? সুমন্ত্র চক্ষু-লজ্জা ছাড়িয়া বলিল, "পকেটে টাকা আছে তো? না থাকে তো বল, গোটা দুয়েক ধার দিতে পারি।"

ভদ্রেশ্বর বলিল, "আমি কি তেমনি কাঁচা ছেলে রে? দেখা করতে যাবার সময় চেক-বুক আর এক গোছা নোট পকেটে ভ'রে নিয়েছিলুম। জানতুম, ব্যাপার কিছুদূর গড়াবে। অবশ্য এতদূর যে গড়াবে তা' ভাবিনি। তুই একটা ব্যবস্থা কর ভাই, এর তার বাড়ি ভেসে বেড়ানো ক'দিন চলে?"

সুমন্ত্র বলিল, "তোর তো শ্মশান-বৈরাগ্য, কালকে তোর স্ত্রী এসে 'তু' ক'রে ডাকলেই ছুটে যাবি। তখন বাড়ি কি হ'বে? আমি বলি কি—বাড়ি না কিনে উপস্থিত একটা মেসে চল। জানা আছে।" ভদ্রেশ্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, "না ভাই, মেসে বড্ড লোকের ভিড়। আমি ভিড় আর সইতে পারছি না, দিন কতক নির্জনে থাকতে চাই।"

সুমন্ত্র বলিল, "তা' হ'লে একটা বাড়ি ভাড়া কর ছোটো দে'খে। আমার বাড়িতে অবশ্য থাকতে পারতিস দিনকতক।"

কথাটা বলিতেই তাহার পরলোকগতা মাতার কথা মনে পড়িল। ভদ্রেশ্বরেরও বোধ হয় অতীতের একটা দৃশ্য মনে পড়িয়াছিল, বলিল, "না ভাই, সে বাড়িতে আর নয়।" তারপর ম্লান হাসিয়া বলিল "আমার কবিতাই দেখছি আমার শনি।"

সুমন্ত্র এই সুযোগে অপ্রিয় সত্য কথাটা শুনাইয়া দিল, "তোর কবিতা নয়, তোর মাত্রাজ্ঞানের অভাব। যাক, তা হ'লে কি করবি বল?"

"তা' তুই যখন বলছিস তখন দিনকতক না হয় বাড়ি ভাড়া ক'রেই দেখি একটা। কি রকম পড়বে মাসে? একশ'?"

সুমন্ত্র বলিল, "একা থাকবার জন্য একশ' টাকার বাড়ির কি দরকার, পঞ্চাশেই হবে।"

ভদ্রেশ্বর বলিল, "সিগারেট খাস?" সুমন্ত্র ঘাড় নাড়িল। "এখনো সেই গুড বয় আছিস?" বলিয়া একটা মূল্যবান সোনার সিগারেট কেস হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইতে ধরাইতে ভদ্রেশ্বর বলিল, "কেমন ফস্ ক'রে একশ' টাকা ব'লে ফেললুম, বল দিকি! আমার ঠাকুরদা কুড়ি টাকা বার ক'রতে হ'লে চোখ কপালে তুলত, বাবা পঞ্চাশ টাকা বার করতে বার দুই মাথা চুলকোত। আমার হাজার টাকার চেক কাটা অভ্যেস, শ'য়ের নীচে এখন নামতে মনটা খুঁত খুঁত করে। নিজেকে তো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয়নি, কি বল?" ভদ্রেশ্বরের কথাবার্তায় শ্রী নাই, কিন্তু মনটা সরল। সুমন্ত্র হাসিয়া বলিল, "ছ' মাসের ভাড়া বার কর আগে। তোর দু'দিন পরে মত ব'দলে যাবে, আর আমি মাঝ থেকে বাড়িওয়ালার কাছে অপ্রস্তুত হ'ব। ও সবের মধ্যে আমি নেই।"

ভদ্রেশ্বর মনিব্যাগ বাহির করিয়া তিনখানি একশত টাকার নোট সুমন্ত্রর হাতে দিল। তারপর বলিল, "তোর দালালী?"

সুমন্ত্র বলিল,—"সে বাড়ি যখন কিনবি তখন দেখা যাবে। ভাড়া করার জন্যে আবার দালালী কিসের ?" ভদ্রেশ্বর বলিল, "সে হয় না ভাই ? তুই ভালোমানুষ লোক, তোকে শুধু শুধু আমি খাটাতে চাই না। মজুরি ব'লে না নিস, বন্ধুর উপহার ব'লে কিছু কিনে নিস ; এই একশ' টাকা রাখ।" সুমন্ত্রর মনটা খুঁত খুঁত করিতে লাগিল, তথাপি অবস্থা বিবেচনা করিয়া টাকা রাখিল। ভদ্রেশ্বর বলিল, "তোর বাড়ির খবর ব'ললি না ? কে কে আছেন এখন ? বিয়ে করেছিস ? ছেলে মেয়ে ক'টি ? তোদের তো অবস্থা ভালোই ছিল,—পাইস-হোটেলে কেন ?"

সুমন্ত্র বলিল, "বাবা, মা মারা গেছেন অনেক দিন হ'ল। বিয়ে করিনি। কি করি, কোথায় থাকি তার ঠিক নেই, কেন আর একটা কৃষ্ণের জীবকে কষ্ট দিই ? বাড়িটা আছে, বাইরের দিকে দু'খানা ঘর ভাড়া দিয়েছি, ঘোরাঘুরি, খানিকটা গাঁয়েব খরচ এবং নিজের পাইস-হোটেলের খরচটা চলে যায়।" ভদ্রেশ্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, কোনো মন্তব্য করিল না। বলিল, "তাহ'লে তিনদিন পরে বিকেলে আসছি, বাড়ি থাকিস। আর ভাখ, এই চিঠিখানা কাউকে দিয়ে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে পারিস ? না, না, নিজে যাসনি, জেরায় পড়ে সব ফাঁস ক'রে ফেলবি। অসময়ে দেখা হ'ল, তোকে দেখাতে পারলুম না, লাখ টাকা দিয়ে বাড়িখানা যা করেছি মাইরি ! বৌয়ের বড়ো সাধ ছিল। ছকু খানসামার লেনের বাড়িটাব জন্যেও মন-কেমন করে মাঝে মাঝে, কিন্তু উপায় ছিল না, ভাই। সেই পৈতৃক দরজাগুলিতে আমাদের আধুনিক ক্ষীণ দেহগুলি ঢুকত না।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে সুমন্ত্রের হাতে একখানা খাম এবং নাম-ঠিকানা ও ফোন নম্বর লেখা একটা কার্ড দিল। বলিল, "এখন বস্তিবাটী চললুম। সেখানে আমার এক দূর সম্পর্কের দিদিমা আছেন, খুব ভালোবাসেন আমাকে। ছোটোবেলায় তাঁর বাড়ি প্রায়ই যেতুম, সরু-চাকলি, গোকুল পিঠে কত কি যে খেতুম। এখন আর গরীব লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার উপায় নেই তো, তাই অনেক দিন যাওয়া আসা নেই। লুকিয়ে টাকা পাঠিয়েছি অবশ্য মাঝে মাঝে। এরা তাঁর ঠিকানা কেউ জানে না, বাড়ি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অজ্ঞাতবাস করব ভাবছি। দু'বেলা পুকুরে নাইব আর তাঁর হাতের রান্না খাব, সুক্তো, চচ্চড়ি, ছ্যাঁচড়া"—ভদ্রেশ্বর কল্পনা-নেত্রে তাহার ভবিষ্যৎ সুখের চিত্র দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বাস্তব

জগতে নামিয়া আসিল। বলিল—"শোন, যদি কোনো দরকার লাগে, ঠিকানাটা রেখে দে।" একখানা ট্রামের টিকিটের উল্টা পিঠে বৈদ্যবাটীর ঠিকানা লিখিয়া দিয়া বলিল, "খবরদার, নেহাৎ বিপদে না পড়লে আমার ঠিকানা কাউকে দিবি না। বলবি কাশী গেছে, কি গঙ্গায় ডুবে মরেছে, কে জানে? কাঁদুক এখন দিনকতক। এই বাঁধো, বাঁধো।" একখানা হাওড়া-গামী চলন্ত ট্রাম থামাইয়া ভদ্রেশ্বর তাহাতে উঠিয়া বসিল। খানিকটা এসেন্সের গন্ধ কিছুক্ষণের জন্য বাতাসে তাহার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিল।

টাকাগুলি ভিতরের পকেটে রাখিতে রাখিতে সুমন্ত্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। তারপর ভাবিল, এখন কি করা যায়? স্ত্রীকে দিনকতক কাঁদাইবার ইচ্ছাটা যে ভদ্রেশ্বরের আন্তরিক নয় তাহা তাহার কথার ভাবে বুঝিয়াছে। বাড়ি ভাড়ার চেষ্টায় বাহির হওয়ার পুর্বে ভদ্রেশ্বরের স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেওয়াটা তাহার কর্তব্য বোধ হইল। দূত করিয়া পাঠাইবার মতো দ্বিতীয় লোক কেহ ছিল না, সুতরাং সেও পাঁচ মিনিট পরে ট্রামে চড়িয়া বসিল।

প্রথম শ্রেণীর যে বেঞ্চটিতে সুমন্ত্র স্থান পাইল সেখানির অধিকাংশ দখল করিয়া বসিয়াছিলেন একজন ইংরাজ সৈনিকপুঙ্গব। ভদ্রলোক দৈহিক প্রস্থে ভদ্রেশ্বরকেও ছাড়াইয়াছেন, সাক্ষাৎ জনবুল। কিন্তু মুখখানি হাসি-হাসি, দেখিলেই বোঝা যায় টাটকা চালানি মাল: এখনও দেহমন সাদাই আছে, ভারতবর্ষের ছাপ পড়ে নাই। সুমন্ত্রকে তাহার প্রাপ্যস্থান দিবার জন্য তিনি সরিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু দুই ইঞ্চির বেশী কিছুতেই সরিতে পারিলেন না। সুমন্ত্র তাঁহার ভদ্রতাবোধের পরিচয় পাইয়া খুশি হইল, ইংরাজীতে বলিল,—"আর বেশী চেষ্টা করবেন না, আপনি যোগসিদ্ধ নন।" সার্জেণ্ট-মেজর অবাক হইয়া বলিল, "হোয়াট ড্যু মীন?"

সুমন্ত্র বলিল, "আমাদের দেশে যোগাভ্যাস ক'রে তপস্বীরা অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন, তার মধ্যে 'অণিমা' অর্থাৎ ইচ্ছামতো ছোটো হ'য়ে যাওয়ার ক্ষমতা লাভ একটা সিদ্ধি। সেটা আয়ত্ত থাকলে পথে ঘাটে খুব সুবিধা হ'ত।"

ভদ্রলোক বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমিও শুনেছি, ভারতবর্ষের যোগীদের খুব অদ্ভুত জিনিস, কিন্তু তার প্রমাণ পাইনি। বাবু, এসব কি সত্যিই হয়?"

"সাধনা করে দেখুন না নিজেই। চলে যান হিমালয়ে, একটি গুহা খুঁজে গুহার মধ্যে ব'সে যান। আপনার অবশ্য কষ্ট হবে একটু খাওয়া শো'য়ার।"

সাহেব বলিলেন, "সঙ্গে বন্দুক থাকলে শিকারের ভাবনা নেই শুনেছি এদেশে।"

সুমন্ত্র বলিল, "সেটি চলবেনা মশাই! যোগা অভ্যাস করতে হ'লে একদম অহিংস হয়ে থাকতে হবে। স্রেফ ফলমূল খেয়ে খালি গায়ে একপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে এক হাত তুলে সূর্যের দিকে চেয়ে বারোবছর গুরুমন্ত্র জপ করতে হবে।" সাহেব স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আশপাশের যাত্রীদের মুখে চাপা হাসির আভাস দেখিয়া বুঝিলেন সুমন্ত্র রসিকতা করিতেছে। তিনি সহসা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তুমি ঠাট্টা করছ বাবু।" সঙ্গে সঙ্গে ফট্ করিয়া একটা শব্দ হইল, তাঁহাব শর্টের একটা বোতাম ছিটকাইয়া আসিয়া সুমন্ত্রের সম্মুখে মেঝেয় পড়িল। অনেকে মুখ ফিরাইয়া হাসিল, সাহেবও অপ্রস্তুতভাবে টুপিটা কোলের উপর চাপিয়া জুতা দিয়া বোতামটাকে টানিয়া লইলেন। সুমন্ত্র হাসি চাপিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মাথার মধ্যে ততক্ষণে একটা কবিতা গজাইয়া উঠিয়াছে—

"হায়—
কি হবে উপায়?
দৈনিক ত্র'ইঞ্চি যদি সৈনিকের ভুঁড়ি বেড়ে যায়—
যুদ্ধক্ষেত্রে কোথা পাবে নিত্য নব সাজ?
কে ঢাকিবে লাজ?"

নাঃ, সুমন্ত্রের ঘাড়ে শেষপর্যন্ত ভদ্রেশ্বরের ভূত চাপিয়া বসিল না কি? পথে ঘাটে এভাবে কবিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। সুমন্ত্র তাহার ব.সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুর মধ্যেই গম্ভীর মুখে খাড়া হইয়া বসিল। সাহেব কিন্তু ভা৻েতক্ষণ তাহার ঠোঁট নড়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন, বলিলেন, "কি বলছিলে, চাকব্দি?"
সম্পর্ক রাকিছু না, বলছিলুম আজ মাসের ক'দিন?"
টাকা পা৷সপ্ল্যানেডের মোড়ে সুমন্ত্র সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া অন্য গাড়ীতে বাড়ি ঠি। সাহেব চুপি চুপি প্রশ্ন করিলেন, "একজন ভালো যোগী কোথায় পুকুরেওয়া যায় বলতে পারো?" সুমন্ত্র বলিল, "হিমালয়ে, তেইশ হাজার কক্কুটের ওপরে।"

সুমন্ত্র যখন সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ে পৌঁছিল, তখন বেলা দুইটা। বাড়ি চিনিয়া লইতে বিশেষ কষ্ট হইল না, চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ, বৃত্ত প্রভৃতির বিচিত্র সমাবেশে গঠিত সে যেন একখানি মূর্তিমতী জ্যামিতি। হঠাৎ-বড়োলোকের চেয়ে হঠাৎ-সভ্যেরা আরও সাংঘাতিক, নিজের অজ্ঞাতসারে আচারে-ব্যবহারে, বেশে-বাসে, তাহারা অপরের বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আঘাত না করিয়া পারে না। ভদ্রেশ্বরের বাড়িখানার উগ্র বিদেশী গঠন পথচারীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা'ছাড়া ফটকের একদিকে মিস্টার বি, কুণ্ডুর নাম এবং অপরদিকে বাড়ির 'রত্নগিরি' উপাধি পিতলের ফলকে খোদাই-করা কালো অক্ষরে লেখা থাকায় সুমন্ত্র নির্ভয়ে ফটকে গিয়া দাঁড়াইল। দরোয়ান ফটকের পাশে ছোটো ঘরটিতে বসিয়া খৈনি টিপিতেছিল, স্থানত্যাগ না করিয়াই বলিল, "কেয়া মাংতা?" সুমন্ত্র পকেট হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া বলিল, "সাহেব কা চিঠ্‌ঠি হ্যায়, মেমসাব কো দে দেনা।" সাহেবের চিঠি শুনিয়া দরোয়ান শশব্যস্ত হইয়া উঠিল, "আইয়ে বাবুসাব, ভিতর আইয়ে। সাহেব্ আভি কাঁহা গয়ে হ্যাঁয় বাবু? হামলোক তো ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে থক গয়ে!" বলিতে বলিতে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে ভিতরে ছুটিল, একবার মুখ ফিরাইয়া বলিয়া গেল "আপ বৈঠকখানেমে জরাসা ঠহর যাইয়ে। ম্যায় আভি আতা হুঁ।"



সুমন্ত্র ভাবিয়াছিল কাজ সারিয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু বাড়িতে আসিয়া গৃহকর্ত্রীর সহিত দেখা না করিয়া যাওয়াটা অভদ্রতা হইবে মনে হইল। সে বাহিরের ঘরে ঢুকিবার মুখে একবার ভাবিল জুতাটা খুলিবে কি না, কিন্তু সেটা বিলাতী রীতি-বিরুদ্ধ হইবে ভাবিয়া জুতা-শুদ্ধ পায়ে মূল্যবান গালিচা মাড়াইয়া একটা কৌচে গিয়া বসিল। ঘরে কৌচ, টেবিল, কেদারার অরণ্য, সমস্তই ঝকঝকে পালিশ করা মেট্রো প্যাটার্নের খাড়া-খাড়া খাঁজ-খাঁজ-কাটা গঠনের। একজন মধ্যবয়সী দাসী আসিয়া সুইচ টিপিয়া ইলেকট্রিক ফ্যানটা চালাইয়া দিল এবং বিনীতভাবে বলিল, "মেমসাহেবকে চিঠি পাঠিয়েছি, একটু বসতে হবে।"

সুমন্ত্র বসিয়াছিল, তাহার দৃষ্টি ঘরের চারপাশে ঘুরিতেছিল। দেওয়ালের ধারে ধারে আলমারিগুলি নানা জাতীয় বাঁধাইকরা মূল্যবান পুস্তকে বোঝাই, তাহার মধ্যে ইংরাজী, বাঙ্‌লা, সংস্কৃত সবই আছে, কিন্তু সেগুলি এতই নূতন যে, দেখিলে সন্দেহ হয়, কেহ কোনোদিন সেগুলিকে খুলিয়া দেখিয়াছে কিনা।

ঘরের চার দেওয়ালে চারটি বড়ো তৈলচিত্র। একদিকে রত্নেশ্বর কুণ্ডু একখানি মোটা ইংরাজী বই হাতে করিয়া বসিয়া আছেন, আর একদিকে তাঁহার পিতা একটি কাশ্মীরী শালের মধ্য হইতে হাত বাহির করিয়া হরিনামের মালা জপ করিতেছেন। ধনেশ্বর কুণ্ডুর পরিচিত ব্যক্তিরা ছবি দেখিয়া চিনিতে পারিবে না, কারণ জীবিত অবস্থায় তিনি কখনও ফটো তোলান নাই। শ্মশানঘাটে তাঁহার যে ছবিটি রত্নেশ্বর তোলাইয়াছিলেন সেইখানি হইতেই চিত্রকরবেচারীকে জীবিত মানুষটিকে উদ্ধার করিতে হইয়াছে, ফলে তাঁহার মুখ হইতে মৃত্যুর ছাপ সম্পূর্ণ ঘুচে নাই। তাঁহার বহুকষ্টার্জিত অর্থের অপব্যবহার দেখিতে চান না বলিয়াই যেন তিনি আড়ষ্ট শিবনেত্র হইয়া আছেন। তাঁহার গায়ের শালটিতে চিত্রকর অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহার জীবিতকালে সেখানি তাহার অর্থে কেনা হইলে তিনি নিঃসন্দেহ আত্মহত্যা করিতেন। ভদ্রেশ্বরের ছবিটিই সবচেয়ে ভালো হইয়াছে, কেবল চিত্রকর আদর্শকে খুশি করিবার জন্য অল্প একটু আদর্শচ্যুত হইয়াছেন, তাহার রংটা দুই-তিন পোঁছ ফরসা করিয়া দিয়াছেন। তাহার ছবির সামনাসামনি ঘরের অপর দিকের দেয়ালে একটি তন্বী তরুণীর ছবি। সেটিকে ভালো করিয়া দেখিবার অবকাশ সুমন্ত্র পাইল না, ছবির ঠিক তলায় ভিতর-দিকের দরজার পরদাটা ঠেলিয়া ছবির জীবন্ত আদর্শ স্বয়ং আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভদ্রমহিলা বেশ স্থূলকায়া, অর্থাৎ দোহারার চেয়ে কিছু বেশি মোটা; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, মাথার ঘোমটা খোঁপার একপ্রান্তে ঠেকিয়া আছে। দ্রুতবেগে চলিয়া আসিতে বোধ হয় একটু হাঁফাইয়া পড়িয়াছিলেন উত্তেজনায় কণ্ঠস্বরও একটু যেন কাঁপিতেছিল। নমস্কার করিয়া বলিলেন "আপনি কে? এ চিঠি আপনি কোথায় পেলেন? যিনি দিয়েছেন তিনি এখন কোথায়? তাঁকে আপনি কতক্ষণ আগে কোথায় দেখেছেন?" সুমন্ত্র বলিল, "আমি ভদ্রেশ্বরের বাল্যবন্ধু, আমার নাম সুমন্ত্র সেন।" ভদ্রমহিলা বলিলেন, "আপনার নাম ওঁর কাছে শুনেছি, আলাপ হ'য়ে সুখী হলুম। কিন্তু এ চিঠির অর্থ কি মিস্টার সেন? তিনি কি নেই?"

সুমন্ত্র এতক্ষণে চিঠিখানা দেখিবার সুযোগ পাইল। ছোটো একটা স্লিপ কাগজে লেখা, "তুমি যখন এ চিঠি পাবে তখন আমি বহুদূরে। খোঁজবার চেষ্টা কোরো না, এ জীবনে আর সাক্ষাৎ হবে না। সুখী হোয়ো, ক্ষমা করবার চেষ্টা কোরো।"

সুমন্ত্রর ভীষণ হাসি পাইতেছিল, তাহার ছদ্মগাম্ভীর্য সেইজন্য বোধ হয় প্রয়োজনাতিরিক্ত হইয়া গেল। ভদ্রমহিলা আবার বলিলেন, "এর অর্থ কি মিস্টার সেন? তিনি কি আত্মহত্যার চেষ্টা করছেন?"

সুমন্ত্র বিনীতভাবে বলিল, "কি ক'রে ব'লব বলুন? আমায় চিঠিখানা দিয়ে কোথায় যে গেল"—

ভদ্রমহিলা বলিলেন—"আমার কথাগুলো একটু কড়া হয়েছিল বটে, তবে তার কারণটা শুনলে আপনি আমার ওপর রাগ করতে পারতেন না। তাই ব'লে তিনি আত্মহত্যা"—ভদ্রমহিলার চোখে জল আসিল।

সুমন্ত্র বলিল, "আত্মহত্যা হয়তো ক'রবে না। যতদূর মনে হ'ল সন্ন্যাসী হ'বার চেষ্টায় আছে। আমার কাছে কাশীর ভাড়া কত জিজ্ঞেস ক'রছিল"—

ভদ্রমহিলা নৈশ্চিন্ত্যের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আপনি বাঁচালেন। কাশীর ট্রেন কটায় বলুন তো? স্টেশনে আটকানো যায় না? মোটরে গেলে?"

সুমন্ত্র ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, "দুটোর গাড়ি ধরবে ব'লে বোধ হয় বেরিয়েছে। হ্যাঁ, হাওড়ার ট্রামেই তো উঠল। নাঃ, স্টেশনে তাকে পাবার আশা নেই।"

ভদ্রমহিলা বলিলেন—"আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, আপনাকে রিকোয়েস্ট করাটা আমার অন্যায়। তবু না ব'লে উপায় নেই। আমি বড়ো বিপন্ন। সুদিনের বন্ধু আমার অনেক আছেন, দুদিনের বন্ধু আপনাকে ছাড়া কাউকে দেখছি না। আপনার কি আমার সঙ্গে কাশী যাওয়ার সুবিধা হবে?"

সুমন্ত্র ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "আমাকে মাফ করবেন। কাশী যাওয়া আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়; হাতে অন্য জরুরী কাজ আছে।"

ভদ্রমহিলা বলিলেন, "দেখুন, আমি আপনাকে কোনোরকম ইনকনভিনিয়েন্সের মধ্যে ফেলতে চাই না, কিন্তু আপনার ফ্রেণ্ড আমাকে যেরকম অকোয়ার্ড পোজিশনে ফেলে গেছেন, তাতে নিজের কোনো রিলেটিভের কাছে হেল্প্ চাইতে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। আমার সিস্টার তো আজই চ'লে যেতে চাইছিল, আমি অনেক ব'লে ক'য়ে তাকে ডিটেন ক'রে রেখেছি। অবশ্য আপনার যাওয়া যদি একান্ত পসিব্‌ল্ না হয় তাহ'লে আমাকে অন্য উপায় দেখতে হবে।"

সুমন্ত্র বলিল, "আপনি অকারণ ব্যস্ত হবেন না।"

"অকারণ ?" মিসেস কুণ্ডু আহত কণ্ঠে বলিলেন, "বলেন কি মিস্টার সেন" ?—

সুমন্ত্র বলিল, "আমাকে সুমন্ত্রবাবু ব'লে ডাকলেই খুশি হ'ব।"

"বেগ ইয়োর পার্ডন্, সুমন্ত্রবাবু, মিস্টার কুণ্ডু অ্যাট দিস মোমেণ্ট, মানে এই মুহূর্তে, কোথায় না কোথায় পথে পথে বেড়াচ্ছেন,—না খেয়ে না দেয়ে কোন্ গাছতলায় হয়তো প'ড়ে আছেন,—আর আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে —না, না, মিস্টার সেন, আই মিন সুমন্ত্রবাবু,—সে আমি পারব না। কা'কে নিয়ে আমার সংসার মিস্টার সেন ? একটা ছেলে নেই, একটা মেয়ে নেই। ঐ রয়, মিটার, সোম আর চৌড্রিদের নিয়ে হল্লা ক'রে আমার বাকী জীবন কাটবে ? ওরা কি পরকালে সাক্ষী দেবে আমার জন্যে! আমার স্বামীকে ওরা অবজ্ঞা করে আমারই পয়সায় খেয়ে—তা কি আমি বুঝতে পারি না ? কি করব, এ একটা নেশা, মিষ্টার সেন, সভ্য-সমাজে মেশবার লোভ আমার. বড্ড বেশী ছিল। তার জন্যে ওঁকে আমি কম দুঃখ দিইনি। পাড়া ছাড়িয়েছি, নিজের সমস্ত আত্মীয়দের পর করিয়েছি। খাবার টেবিলে ব'সে একটু ভুল ক্রটি করলে আড়ালে যাচ্ছেতাই গালমন্দ করেছি। তবু কোনোদিন রাগতে দেখিনি আজ পর্যন্ত ওঁকে। আজ আমারও মতিচ্ছন্ন হয়েছিল, তাঁরও কাষ্ঠ-রসিকতাটার কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছিল। আর তাও বলি, মিষ্টার সেন, আই মিন সুমন্ত্রবাবু, শালীর সঙ্গে একটু ঠাট্টা তামাসা করাটা এমনই কি অপরাধ যে ক্ষমা করা যায় না ?"

মিসেস কুণ্ডুর দুইমিনিট পূর্বের অভিমতের সঙ্গে বর্তমান অভিমতের সামঞ্জস্য না থাকিলেও সুমন্ত্র বিস্ময় প্রকাশ করিল না, মাথা নাড়িয়া বলিল "সত্যিই তো।"

মিসেস কুণ্ডু সমর্থন করিবার লোক পাইয়া উৎসাহিত হইলেন। বলিলেন, "আজকালকার মেয়েগুলো হয়েছে তেমনি ছিচকাঁদুনি। ভগ্নীপতি ঠাট্টা করেছে তো গায়ে ফোস্কা পড়ে গেল ! আমি বলছি আপনাকে, মিস্টার কুণ্ডু যদি না ফিরে আসেন,—আই শ্যাল নেভার ফরগিভ হার।"

মিনিট দুই দুইজনেই চুপচাপ। তারপর মিসেস কুণ্ডু চোখ মুছিয়া বলিলেন, "আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দে'ব ভাবছি। একটু হেল্প করবেন ? আচ্ছা, আপনার কোনো প্রাইভেট ডিটেক্টিভ এজেন্সীর সঙ্গে পরিচয় আছে ? হাজার টাকা পুরস্কার অফার করলে কি রকম হয় ?" সুমন্ত্র বলিল, "আমার

কথা শুনুন, হৈ চৈ ক'রলে কোনো ফল হবে না। সে আমাকে খবর দেবে ব'লে গেছে, খবর পেলেই আমি আপনাকে জানাব। আপনার স্বামীর নিরাপত্তার জন্য আমি দায়ী রইলুম। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" সুমন্ত্র নমস্কার করিয়া মিসেস কুণ্ডুর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া এবং নিজের ঠিকানা না দিয়াই দ্রুত বাহির হইয়া আসিল। ইহাদের গৃহবিচ্ছেদ দীর্ঘতর করিবার জন্য সে শুধু প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়, অর্থক্রীত। ভদ্রেশ্বরকে এই মুহূর্তে কাছে পাইলে সে একশত টাকার মায়া ত্যাগ করিয়া এখনই ইহাদের মিলন ঘটাইয়া দিত। বিপন্না তরুণীর—'ড্যামসেল ইন ডিষ্ট্রেসের' ভূমিকায় মিসেস কুণ্ডুকে এবং ভ্রাম্যমাণ যোদ্ধার ভূমিকায় উদ্ধারকর্তারূপে নিজেকে কল্পনা করিয়া তাহার হাসিও পাইতেছিল। সদর দরজা পার হইতে হইতে আপন মনে বলিল, "আচ্ছা ফ্যাসাদেই পড়া গেল।"

সংসারে যে অল্প কয়েকজন ব্যক্তিকে,—আর্থিক সাচ্ছল্যের জন্যই হউক অথবা মানসিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই হউক,—উদয়াস্ত অন্যের নির্দেশ-অনুসারে চলিয়া জীবিকা উপার্জন করিতে হয় না, তাহারা কার্যক্ষেত্রে নিজেদের রুচি প্রয়োজন বা বিবেকের তাগিদে অনেকসময় জীবনযাত্রার একটা অল্প-বিস্তর নির্দিষ্ট পরিকল্পনা,—আপনাদের বিচরণক্ষেত্রের একটা সীমিত মানসিক মানচিত্র, প্রস্তুত করিয়া লয়, না হইলে বেশীদিন দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখিয়া তাহাদের পক্ষে মনুষ্যসমাজে বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুমন্ত্রের ছন্নছাড়া জীবনও সম্প্রতি অনেকটা তাহার অজ্ঞাতসারে এইরূপ একটা ছককাটা গণ্ডির মধ্যে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছিল। সত্যাগ্রহ আন্দোলন মন্দীভূত হইয়া আসিবার পর সে ট্যাক্স-বন্ধ ও লবণ-সত্যাগ্রহ উপলক্ষ্যে পরিচিত কলিকাতা হইতে মাইল-কুড়ি-দূরে অবস্থিত একটি অজ পাড়া-গাঁয়ে তাহার কর্মক্ষেত্র স্থির করিয়া লইয়াছিল। উনিশশ' ত্রিশ সালের শেষদিকে প্রথমবার কারাগার হইতে বাহির হইয়া সে যখন স্বাধীনতা-সংগ্রামের শিবিররচনার আশায় এই গ্রামের হরিসভার সর্প-অধ্যুষিত পোড়ো মাটির ঘরটিতে আশ্রয় লইয়াছিল তখন গ্রামবাসী তাহাকে তাড়াইয়া না দিলেও তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিল। সে বিনা-বেতনে ছেলে পড়াইতে চাহিলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ সে কত টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত আছে জানিতে চাহিয়াছিল; কারণ পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের যে ছেলে গরু চরাইয়া বা লোকের বাড়ি 'মাহিন্দীর' খাটিয়া নগদ দুই টাকা মাসিক বেতন এবং নিজের খোরাকি সংগ্রহ করিতে পারে তাহাকে দিনের মধ্যে পাঁচছয় ঘণ্টা শিক্ষাদানের ছলে আটকাইয়া রাখার অর্থ অভিভাবকদের অনর্থক লোকসান করানো ছাড়া কিছুই নয়। সুমন্ত্রের ক্ষতিপূরণ দিবার শক্তি বা ইচ্ছা ছিল না। তাহার সম্বল ছিল প্রথম যৌবনের উৎসাহ, কিছু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এবং পল্লীমঙ্গল সমিতির কয়েকটা বই। সেইগুলির সাহায্যে দরিদ্ররোগীদের বিনাবেতনে চিকিৎসা করিয়া, গ্রামের পানাপুকুর এবং পথঘাট সাফ করিয়া ক্রমে ক্রমে স্নেহের দ্বারা—সেবার দ্বারা—সে গ্রামের লোকের চিত্ত জয় করিয়াছিল। প্রতি সন্ধ্যায় পুরাণপাঠ এবং

কীর্তনের সঙ্গে সংবাদপত্র পাঠ এবং দেশবিদেশের ইতিহাস ও রাজনীতি চর্চা করিয়া কয়েক মাসের মধ্যেই সে গ্রামবাসীর মনে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছিল, গাছতলায় ক্লাস করিয়া ছাত্রদের আক্ষরিক জ্ঞানদানের সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। কলিকাতা হইতে কোনো শ্রদ্ধেয় দেশনেতা তাহাদের অর্থ দিয়া উপদেশ দিয়া সাহায্য করিতেন এবং মাঝে মাঝে স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইতেন। একটানা বেশীদিন এ-ভাবে কাজ করিবার সুযোগ হয় নাই ; পুলিশ বার-বার তাহাদের ঘর পুড়াইয়া দিয়াছে, তাহাদের বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে, ইউনিয়নবোর্ডের ট্যাক্স বন্ধ করার জন্য ঘরে ঘরে লুঠতরাজ চালাইয়াছে ; তবু তাহার আরব্ধ কার্য অসমাপ্ত থাকে নাই। আজ পাঁচ বৎসর পরে সে গ্রামে এখন পথঘাট পুর্বের তুলনায় অনেক পরিচ্ছন্ন হইয়াছে, ঘরে ঘরে বাঁশের চরখা চলিতেছে, তিনটি তাঁতে গ্রামের লোকের হাতের কাটা সুতায় কাপড় বোনা হইতেছে। গ্রামবাসীর সাহস বাড়িয়াছে, রাষ্ট্রচেতনা বাড়িয়াছে। আন্দোলন থামিয়া যাওয়ায় বাহিরের স্বেচ্ছাসেবকেরা সকলেই যে-যাহার ঘরে ফিরিয়া-গিয়াছে, তবু বিদ্যালয়টি বন্ধ হয় নাই। সুমন্ত্রের সঙ্গে কায়িক পরিশ্রম করিয়া তাহার ছাত্রেরা এবং তাহাদের অভিভাবকেরা বিদ্যালয়ের জন্য মাটির ঘর তুলিয়াছে, সেখানে কয়েকজন স্থানীয় কর্মী নামমাত্র বেতনে অধ্যাপনায় সাহায্য করিতেছেন সুমন্ত্রকে। এখন সেই কৃষক ও ধীবরপল্লীর ঘরে ঘরে তাহার জন্য স্নেহের আসন পাতা, ঘরে ঘরে মাতা-ভগ্নীর বাৎসল্য ও প্রীতিসিক্ত আতিথ্যের আয়োজন। ওপক্ষের আন্তরিকতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ পক্ষের দায়িত্বও বাড়িয়াছে। দেশের বন্ধনমোচন আজও হয় নাই, দরিদ্রের দুঃখের ভাগ লইতে আসিয়া নিজে তাহাদের স্নেহমমতার শতপাকে বাঁধা পড়িয়াছে। এখন গ্রামের দাবী মিটাইতে গিয়া দিনে রাত্রে বিশ্রাম নাই তাহার। স্বাধীনতাযুদ্ধে আশু ফললাভের আশা নাই, শোভাযাত্রা করিয়া থানায় পতাকা তুলিতে যাওয়ার বা মেয়েপুরুষে দল বাঁধিয়া খালধারে লবণ তৈয়ারি করার উন্মাদনা নাই, বিলাতী কাপড় ও তাড়ি বন্ধ করিতে গিয়া বিভিন্ন গ্রামের হাটে হাটে পিকেটিং উপলক্ষ্যে গাল পাতিয়া চড় এবং পিঠ পাতিয়া লাথি খাওয়ার প্রয়োজনও ফুরাইয়াছে, সেই সঙ্গে হুজুগে-বাঙালীর উৎসাহেও ভাঁটা পড়িয়াছে। আগে খোল করতাল লইয়া পতাকা উড়াইয়া স্বেচ্ছাসেবকের দল একদিন ভিক্ষায় বাহির হইলে সাত দিনের খাদ্য

অনায়াসে সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিত, এখন সুমন্ত্রকে বিদ্যালয়ের জন্য বাহির হইতে টাকা আনিতে হয়। নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের বন্যায় প্লাবিত গ্রামে গ্রামে সেদিন 'স্থানীয় প্রতিভা'রা যেসব জাতীয় সঙ্গীত লিখিয়াছিলেন সেগুলির সার্বজনীন আবেদন ছিল অতি গভীর।

"হে ভারতবাসী, শোনো সবে আসি—যে নিয়ম করেছেন গান্ধী-অবতার।
হবে না অশ্রুপাত, হবে না রক্তপাত, হবে না প্রাণপাত, হবে কাজ উদ্ধার।"

গানটি কোন্ বুদ্ধিমান্ গ্রামবাসীর রচনা সুমন্ত্র তাহা জানে না, কিন্তু কাজ-উদ্ধার উহার দ্বারা সাময়িকভাবে হইয়াছে বই কি? "জাগে 'খড়ম্বা', 'ব্যাঁওতা' সে জাগে, জাগে 'হাতীপোতা' নব অনুরাগে" প্রভৃতি গানে নিজ নিজ গ্রামের নাম কীর্তিত হইতে শুনিয়া পুলকিত পল্লীবাসী সেদিন মুক্তহস্তে ভিক্ষা দিতে কার্পণ্য করে নাই। "বড়ো মজা হয়েছে, গান্ধী রাজা ক্ষেপে গিয়ে তালগাছের মোচ কেটে দেছে" প্রভৃতি গানে গান্ধীজীর ব্যাজস্তুতি হইয়া থাকিলেও তাহা বুঝিবার মতো বুদ্ধি—লেখক বা শ্রোতা—সে দলে সুমন্ত্র ছাড়া কাহারও ছিল না। আজকাল স্রোত ফিরিয়াছে, সহর হইতে "জনগণমন-অধিনায়ক" ও 'হও ধরমেতে ধীর' প্রভৃতি গানের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি সিনেমার গানও আসিয়া গ্রামের আকাশ বাতাস মুখরিত করিতেছে। গ্রাম সভ্য হইতেছে, গ্রামবাসীর সহজ আলাপের ভাষায় নিষ্কাম অশ্লীলতার স্রোত মন্দীভূত হইয়াছে, ঘরে ঘরে মদ তাড়ির আসর, বধূনির্যাতন, মিথ্যামামলা এবং দৈবনির্ভরতা কমিয়াছে। বর্ষার প্রথমে এ-উহার ধানের জমির আধ-হাত আল চুরি করিয়া কাটিয়া লওয়ার জন্য এখনও প্রতিবেশীদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় বটে, শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র কাকার গাছের একটি পেয়ারা চুরি করিয়া খাওয়ার ফলে ভাই এখনও ভাইয়ের মাথা ফাটাইয়া দেয় ইহাও সত্য, তবু তাহাদের ফাটা-মাথায় ন্যাকড়া-পোড়া-ছাইএর সঙ্গে চিনি মিশাইয়া প্রস্তুত মলমের প্রলেপ দিয়া পান বিছাইয়া ছেঁড়া কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে বাঁধিতে সুমন্ত্র পূর্বের মতো আর হতাশ হইয়া পড়ে না, কারণ তাহার সঙ্গে ঔষধের বাক্স লইয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিবার—মৃত্যু তুচ্ছ করিয়া দাঙ্গা, বন্যা, মহামারীর মধ্যে সেবা-কার্যে যাইবার—লোক কয়েকটি ঐ গ্রামের মধ্যেই গড়িয়া উঠিয়াছে। আজকাল এ-অঞ্চলে তাহার প্রতিষ্ঠা বাড়িয়াছে। সাত আট মাইল দূর হইতে

রোগী আসে, তাহার মুখের কথায় অনেক গ্রাম্যকলহের নিষ্পত্তি হইয়া যায়। তাহার ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার সুপারিসে কলিকাতায় কোনো স্বদেশী প্রতিষ্ঠানকে খড় যোগাইয়া ব্যবসায়ে সঙ্গতিপন্ন হইয়াছে, তাহারা সুমন্ত্রের নির্দেশানুযায়ী পুলিসের দ্বারা নির্যাতিত স্বগ্রামবাসীদের মাঝে মাঝে অর্থ সাহায্য করে, টিউবওয়েল, বিদ্যালয় এবং অন্যান্য সাধারণের কাজে লাভের কিছু অংশ ব্যয়ও করে। কাজ আগাইয়া চলিয়াছে, বহু ত্রুটিবিচ্যুতিসত্ত্বেও দেশ স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হইতেছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু একএকবার নিজের মনের মধ্যে অবগাহন করিয়া নিজের অতীত ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া তাহার মন বিদ্রোহ করিয়া উঠে। তাহার কবিতা লেখা বন্ধ হইয়াছে, ছবি আঁকার সময় নাই, সুযোগও নাই। ফরমাসী ছবি দুই-চারিটা পেটের দায়ে মাঝে মাঝে আঁকে বটে, কিন্তু তাহাতে মন ভরে না। সব কাজেই কেমন যেন একটা অবসাদ তাহাকে পাইয়া বসিতেছে। সত্যকে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই, শহরের আবহাওয়ায় আজন্মবর্ধিত বিদগ্ধ মানুষ দরিদ্র পল্লীকে বুদ্ধি দিয়া ভালোবাসিতে পারে, তাহার দিগন্তবিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র, বনরাজি নীল অরণ্য ও ছায়াতরুবেষ্টিত পর্ণকুটির লইয়া কর্মাবসরে কাব্য-রচনাও করিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকাল সেখানে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে না। সেখানে শান্তি থাকিতে পারে, স্বস্তি নাই। শুধু যে গ্রামের ভাষায় 'নল টিপিলেই জল আর ত্মাল টিপিলেই আলো'র অভাব, ভালো রাস্তা, পাকাবাড়ী, সিনেমা, রেস্তোরাঁর অভাবই তাহার দৈনন্দিন স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত ঘটায় তাহা নহে, মনের কথা বলিবার মানুষের অভাবই শেষপর্যন্ত তাহার পক্ষে সব চেয়ে অসহ্য হইয়া উঠে। তখন জনতার জয়ধ্বনিতে অরুচি আসে, নীচের দিকে চাহিতে চাহিতে ক্লান্ত চক্ষু উপরের দিকে তাকাইয়া জুড়াইতে চায়। তখন কেমন যেন একটা বদ্ধজলার বাষ্পোচ্ছ্বাসে আচ্ছন্ন হইয়া ঐশ্বর্যময়ী প্রকৃতির অপরূপ শ্যামসমারোহ, আকাশ ও প্রান্তরের অসীম ঔদার্য এবং ছায়াস্নিগ্ধ পল্লীজীবনের সমস্ত দাক্ষিণ্য তাহার কাছে ব্যর্থ হইয়া যায়, একঘেয়ে কর্মতালিকার চাপে এবং একটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর মানসিক শূন্যতাবোধের তাড়নায় সে তখন অস্থির হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে প্রাণটা যখন এইরূপ খুবই হাঁফাইয়া উঠে তখন সুমন্ত্র দিনকতকের জন্য বৈচিত্র্যের সন্ধানে,—মুক্তির সন্ধানে,—ধূলি-ধূম্র-গুন্ঠিত কলিকাতার ইট-কাঠ-পাথরের স্তূপের মধ্যে ছুটিয়া আসে। হাতের টাকা ফুরাইলেই সে সাধারণতঃ অর্থসংগ্রহের চেষ্টায়

কলিকাতায় আসে বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু সে জানে এবং তাহার অন্তর্যামী জানেন, না আসিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই সে আসে। ইহাতে তাহার দেহের বিশ্রাম যতটা হউক বা না হউক, মনের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে। এ সময়ে দিনকতক কলিকাতায় এবং সম্ভব হইলে দুই একদিন শান্তিনিকেতনে বেড়াইয়া আসে সে। কয়েকদিন ছবি দেখিয়া ও গল্প করিয়া, প্রাচীন ও আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া,—প্রভাতের মন্দিরে কবিগুরুর অমৃতবাণী এবং রাত্রের বৈতালিকে আশ্রম-কন্যাদের কণ্ঠে তাঁহার উদাত্ত প্রার্থনা-গীতি শুনিয়া কয়েকমাসের মতো দুর্গম পথের পাথেয় সঞ্চয় করিয়া সে একটু সুস্থচিত্তে গ্রামে ফিরিতে পারে।

এ যাত্রা কলিকাতায় পা দিয়াই সুমন্ত্র যে কাজের ভার লইয়া বসিল তাহা তাহার বাঁধা রুটিনের বাহিরে হইলেও একেবারে তাহার কার্যক্ষেত্রবহির্ভূত ছিলনা। ভদ্রেশ্বরের বাড়ীভাড়ার দালালীর টাকাটা তখনও সে উপার্জন করে নাই সুতরাং সেটা খরচ না করিয়া প্রথমতঃ সে পূর্বব্যবস্থানুযায়ী উপার্জনের দিকে মন দিল। ভদ্রেশ্বরের বাড়ী হইতে ফিরিয়া প্রথমেই কয়েকখানি নিজের আঁকা পুরাতন ছবি লইয়া সে গেল বড়বাজারের এক ধনী মাড়োয়ারীর বাড়ীতে। দারোয়ানের হাতে শ্লেটে নাম-ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইবার পাঁচ মিনিট পরেই দোতলা হইতে ডাক আসিল। প্রশস্ত হলঘরের একপ্রান্তে দুগ্ধশুভ্র মর্মরমণ্ডিত গৃহতলে একটি অল্পমূল্য মাদুরের উপর তেলচিটা ধরা আধূসর ছিন্নবস্ত্র বিছাইয়া ততোধিক মলিন একটুকরা কটিবাস-পরিহিত দিব্যকান্তি তরুণ গৃহস্বামী ভোজপুরী ভৃত্যের দ্বারা তৈলমর্দন এবং অঙ্গ-সংবাহন করাইতে ছিলেন এবং চিং হইয়া শুইয়া রূপার গুড়গুড়ির নলটি হইতে মাঝে মাঝে ধূমপান করিতেছিলেন। সুমন্ত্রকে নমস্কার করিতে দেখিয়া গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে সরাইয়া হাত না তুলিয়াই বলিলেন, "নোমোস্কার সুমন্তরবাবু, শেয়ার-মার্কেটের খবর রাখেন?"

সুমন্ত্র বলিল, "তাই যদি রাখব তাহ'লে আর আপনার কাছে ছবি বগলে ক'রে হাজরি দোব কেন?"

"আরে মোশাই, ডুবে গেছি, একদম ডুবে গেছি। বাজোরিয়া আমার গলায় পা তুলে দিয়েছে কাল। এক দিনে তিন লাখ টাকা ফুস হয়ে গেছে কামারহাটি আর লোথিয়ানে। মনটা ভালো নেই।"

সুমন্ত্র ম্লানমুখে বলিল, "তবে যাই আজ?"

গৃহস্বামী হাসিয়া বলিলেন, "দেখুন, আপনিও গরিব, আমিও গরিব। কাকের মাংস কাকে খায় না সুমন্তরবাবু, কিন্তু মানুষের মাংস মানুষে পেলে ছাড়ে না। আজ গেলে কাল আসবেন তো আবার? আসুন, দেখি কি কি এনেছেন?"

সুমন্ত্র হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তিনখানি ছবি পাশাপাশি সাজাইয়া ধরিল। দুইটি তন্মধ্যে প্রাকৃতিক দৃশ্য, একটির বিষয়বস্তু 'চার্বাকি ও মঞ্জুশ্রী'। ভদ্রলোক উপুড় হইয়া শুইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া, মাথা তুলিয়া ছবিগুলি দেখিলেন, বলিলেন, "ল্যাণ্ডস্কেপ্ আপনার ভালোই হয়, তবে আমার বিলিতী অয়েল পেন্টিংএর কাছে লাগে না। যাক, আশা ক'রে এসেছেন, একেবারে খালি হাতে ফেরাব না। এই মেয়ের ছবিটা থাকুক। ঝগড়ু, খাজাঞ্চিবাবুকো বোল দেও বাবুকো দশ রূপেয়া—"

সুমন্ত্র ছবিগুলি তুলিয়া বগলে পুরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "থাক, আপনাকে আর ছবি নিতে হবে না। নমস্কার।"

ভদ্রলোকের সেই ছবিটি,—বলাবাহুল্য চিত্রমধ্যস্থ পরুষবল্কলবদ্ধ পেলবযৌবনা নারীমূর্তিটি চোখে ধরিয়াছিল, সুমন্ত্রকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "আহা, রাগ করেন কেন মোশাই? কত খরচ পড়েছে ঠিক বলুন তো? আট আনার কাগজ আর আট আনার রং খুব জোর?"

সুমন্ত্র বলিল, "দাম রঙেরও নয়, কাগজেরও নয়, দাম ধরা হয় মজুরির। দিনমজুরির নয়, অনেকদিনের সাধনায় লব্ধ শিল্পনৈপুণ্যের কিছু দাম আছে বই কি। আপনি যখন নেবেন না তখন তর্ক ক'রে লাভ কি? তিন লাখ টাকা একদিনে সেয়ার মার্কেটে উড়িয়ে দিতে পারেন আর ত্রিশ টাকা একটা ভালো ছবির জন্য"—

গৃহস্বামী হাসিয়া বলিলেন, "আহা রাগ করেন কেন? বেশ, আপনার কথাও থাক আমার কথাও থাক, বিশ টাকা দিয়ে দি, কি বলুন? কি, তাতেও না? পঁচিশ টাকা? নাঃ, আপনি নেহাৎ যখন ছাড়বেন না তখন ত্রিশই নিন। আপনার কথাই রইল, আর কথাটি বলবেন না। এই ঝগড়ু, ত্রিশ রোপেয়া, খাজাঞ্চিবাবুকো পাশ লে যাও। তিনটে বাজে, আমার

এখনও আস্নান-খাওয়া হয়নি, বাবুজী, বাজারের পয়সাটা পর্যন্ত আপনি রাখলেন না। যান, বাক্স খালি ক'রে দিতে ব'লে দিলাম।"

সুমন্ত্রের বিবেচনায় ছবিখানির ন্যায্যমূল্য একশত টাকার কম হইবে না, অসতর্ক মুহূর্তে উদাহরণস্বরূপ সে দামের সম্বন্ধে যে কথাটি বলিয়াছিল তাহাই যে তাহার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে তাহা কল্পনা করে নাই। এখন আর উপায় কি? তা' ছাড়া খরিদদার কোথায়? পিঠ চাপড়াইবার লোক অনেক আছে, পয়সা খরচ করিতে কেহই চাহে না। বিশেষ বন্ধু ও আত্মীয়ের মধ্যে যাঁহারা ধনী আছেন তাঁহাদের কাছে সে ছবি বেচিবে না; বাকী পরিচিত বাঙালীর মধ্যে যাঁহাদের অর্থ আছে তাঁহাদের ছবিকেনার ইচ্ছা নাই, যাঁহাদের ইচ্ছা আছে তাঁহাদের অর্থ নাই। এদিকে সুমন্ত্রের অর্থ চাইই। বাঁধা-চাকরি সে করিবে না, করিলে চলিবেও না তাহার, তাহা হইলে দেশের কাজ ছাড়িতে হয় তাহাকে। অগত্যা ছবি এবং লেখাই সম্বল। এদিকে স্বেচ্ছায় অনেক দায়িত্ব লইয়াছে সে। যত অল্পই হউক শিক্ষকদের বেতন দিতে হইবে, বিদ্যালয়ের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি সরঞ্জামের অভাব, কিছু ঔষধও না কিনিলে নয়, সুতরাং ছবি না বেচিয়া উপায় নাই সুমন্ত্রের; তবু এইরূপ অপাত্রে অসম্মানজনকভাবে নিজের মানসপুত্র কন্যাগুলিকে সমর্পণ করিতে কষ্ট হয় তাহার। খাজাঞ্চিবাবু প্রথমতঃ কাগজ পেন্সিল পাঠাইয়া গৃহকর্তার সম্মতিসূচক স্বাক্ষর আনাইলেন, তাহার পর রেভিনিউস্ট্যাম্পে (এক আনা পয়সা লইয়া) আধঘণ্টা পরে সুমন্ত্রের স্বাক্ষর লইয়া তাহাকে গণিয়া গণিয়া তিনখানি নোট দিলেন। তারপর প্রশ্ন করিলেন, "তিরিশ টাকায় কয়ঠো তসবীর বিকলেন বাবুজী?" সুমন্ত্র বলিল, "একখানাই তো জলের দামে দিয়েছি, আবার ক'খানা হবে?" খাজাঞ্চি অবাক হইয়া বলিলেন, "কুল্



কুছ কমিশন

একঠো ? জলকা দাম ক্যা বোলতে হ্যাঁয় বাবুজী, আপ তো এক কাগজ দেকর আধামণ ঘিউকা ভাও লে লিয়া! কুছ কমিশন তো হামারা হো যানা চাহিয়ে।" অভাবে পড়িলে আবার ইহাদের দ্বারে আসিতে হইবে, সুতরাং ইহাকে চটানো চলে না ; সুমন্ত্র পকেট হইতে খুচরা একটা টাকা বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল। ভদ্রলোক জিভ কাটিলেন, চোখে হাত চাপা দিয়া বলিলেন, "য়ে ক্যা দিয়া বাবুজী"—

সুমন্ত্রের মেজাজ তখন খিঁচড়াইয়া গিয়াছে, সে আর বাক্যব্যয় না করিয়া স্থানত্যাগ করিল। খাজাঞ্চিবাবু চোখ খুলিয়া দেখিলেন শিকার অদৃশ্য হইয়াছে।

বাড়ি ফিরিয়া বাকী ছবিগুলি দেওয়ালের গায়ে টাঙাইয়া দিয়া সুমন্ত্র তাহার নীচের তলার ভাড়াটিয়া বৃদ্ধ ডাক্তারবাবুর কাছে টাকার তাগাদা দিল। তিনি কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তোমার এই ঝড়ঝড়ে বাড়ি তিন যুগ ধরে পাহারা দিচ্ছি প্রাণের মায়া ছেড়ে, তুমি কোথায় আমায় মজুরি দেবে, তা নয় উল্টে টাকা চাইছ ? লজ্জা করল না তোমার ?" সুমন্ত্র লজ্জিতভাবেই বলিল, "বড্ড টানাটানি যাচ্ছে, ডাক্তারবাবু, না হ'লে চাইতুম না।" ডাক্তারবাবু বলিলেন, "তোমার টানাটানি জানতে তো আমার বাকী নেই। আমার রক্ত-জল-করা টাকাগুলো নিয়ে ভূত-ভোজন করাবে তো ? তা, যা তোমার ধম্মে হয় কোরো। তিন দিন পরে মাসকাবার, আদায়পত্তর হোক, তখন দেখা যাবে।" অগত্যা ছবি-বিক্রয়ের টাকাতেই বাজার করিতে বাহির হইল সুমন্ত্র। সঞ্চিত অর্থে হাত দিবার পূর্বে আর কিছু উপার্জনের উদ্দেশ্যে সে কলেজ ষ্ট্রীটের কাছে একটি বইএর দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পকেটে ছেলেদের জন্য লেখা একটি হাসির কবিতা ছিল। উদ্ভট প্লট, খানিকটা অনুপ্রাস এবং ছন্দের খেলা। দোকানে র‍্যাকের পর র‍্যাক বোঝাই রাশি রাশি বই। কাউণ্টারের পিছন-দিকে অন্ধকার কোণে প্রায় একমানুষ-উঁচুতে নিতাই পালের তৈয়ারী সুন্দর লালমাটির গণেশ মূর্তি। তাহার তলায় একটি টেবিল ঘিরিয়া বসিয়া কয়েকজন প্রবীন সাহিত্যিক রাজা-উজীর মারিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যমণি অর্থাৎ বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যপত্রিকার সুসাহিত্যিক সম্পাদক মহাশয় ছিলেন সুমন্ত্রের কবিতাপণ্যের একজন বাঁধা মহাজন। তাঁহার কথায় কার্পণ্য থাকিলেও স্মিতহাস্যে কার্পণ্য ছিল না, রচনা ছাপিতে দেরি করিলেও তিনি মূল্য দিতে দেরি করিতেন না কখনও। সুমন্ত্রকে দেখিয়া

হাসিয়া বলিলেন, "আসুন। লেখা এনেছেন?" লেখাটি হাতে লইয়া চোখের খুব কাছাকাছি ধরিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া পড়িলেন, তারপর সম্মুখবর্তী যুবককে বলিলেন, "দশটা টাকা দিতে হবে সুমন্ত্রবাবুকে।" সুমন্ত্র অর্থপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া অতঃপর একটা বইয়ের তালিকা বাহির করিল, বলিল, "এগুলো আমার ইস্কুলের জন্যে চাই, কমিশন-বাদে দিতে বলবেন।" তাহার পর অন্যান্য পরিচিত ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। দেশের অবস্থা, সাহিত্যের অবস্থা, নানা বিষয়ের আলোচনা চলিল।

মিনিট পাঁচেক পরে তাহার টাকার রসিদ প্রস্তুত হইয়া আসিলে সুমন্ত্র স্বাক্ষর দিয়া একখানি দশ টাকার নোট লইল। আরও কয়েক মিনিট পরে তাহার প্রার্থিত বইগুলি আসিল। সুমন্ত্র মিনিটখানেক-দুই বইগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, তারপর তাহার হঠাৎ মনে হইল বেয়ারাশ্রেণীর যে লোকটি তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে তাহাকে এতক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাখা উচিত হয় নাই, সে সদ্য-উপার্জিত নোটখানা তাহার হাতে দিয়া বলিল, "এই নাও।" লোকটি অম্লানবদনে হাত পাতিয়া লইল, সুমন্ত্র আবার পুস্তকে মনঃসংযোগ করিল। একটু পরে বলিল, "কই আমার বাকী চেঞ্জটা।" সম্পাদক মহাশয় হাঁক দিলেন, "কই হে, সুমন্ত্র বাবুর বাকীটা।" দোকানের কর্মচারী কাউণ্টার হইতে সরিয়া আসিয়া বিনীতভাবে জানাইল "টাকা তো এখনও দেন নি উনি।" "সেকি?" সুমন্ত্র লাফাইয়া উঠিল, "আমি যে নিজে হাতে দিলুম, আপনাদের বেয়ারাকে! উনিও দেখেছেন।" ক্ষীণদৃষ্টি সম্পাদকমহাশয়ও সায় দিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনি দিলেন যেন কা'কে।" "তাহ'লে অন্য কেউ নিয়ে গেছে।" "সে কি? খোঁজ, খোঁজ।" দোকানের প্রত্যেকটি কর্মচারীকে ডাকা হইল, সুমন্ত্র তাহাদের কাহাকেও টাকা দেয় নাই সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। কাউণ্টারের ভিতরে ঢুকিয়া অন্য কোনো দোকানের লোক তাহার টাকা লইয়া গিয়াছে। বন্ধুরা বুঝাইলেন, "লোকটা চোর নয়, মশাই। দাঁড়িয়েছিল, আপনি তাকে হাতে তুলে দিলেন, সে কি করবে?" সত্যই তো, সে কি করিবে? ছবি-বিক্রয়ের টাকা হইতে বইয়ের দাম মিটাইয়া বোকা বনিয়া বাহির হইল সুমন্ত্র, মাছের-তেলে-মাছ-ভাজার ইচ্ছাটা এ যাত্রা সফল হইল না তাহার। গ্রামের দারিদ্র্যের সঙ্গে পরিচিত হইবার পর হইতে প্রত্যেকটি পয়সা হিসাব করিয়া

খরচ করে সে, সাধ্যপক্ষে ট্রামে বাসে চড়ে না। দশ দশটা টাকা এক কথায় জলে গেল, মনটা করকর করিতে লাগিল তাহার।

গলির মধ্যে বইএর দোকানের সামনাসামনিই প্রায় একখানি খদ্দরের দোকান। ঘরটি বেশ বড়ো, তাহার তিনদিক ঘিরিয়া কাউণ্টার তাহার পিছনে সারি সারি আলমারি-বোঝাই খদ্দরের কাপড়, চাদর, বই, বাক্স চরকা, তাঁত, তকলী, রঙিন সূতা ইত্যাদি। সুমন্ত্র ঘরে ঢুকিতেই ঘরের তিন-দিক হইতে পাঁচ-ছয়জন বন্ধু তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইল, "সুমন্ত্রদা' যে!" "অনেকদিন পরে এলেন এবার।" "চেহারাটা একটু খারাপ দেখছি যেন?" সম্মুখের দিকে ক্যাশিয়ারের পাশে বসিয়া যে মুণ্ডিতমস্তক সৌম্যদর্শন যুবক বন্ধুটি হিসাব পরীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "বেঁচে আছেন তা হ'লে? মনে পড়ল এতদিনে?" সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া সুমন্ত্র কর্তৃপক্ষের কুশলসংবাদ লইল। এই প্রতিষ্ঠানটি সাধারণের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত, প্রতিষ্ঠাতামহাশয় একজন সর্বত্যাগী কর্মযোগী। বজ্রের মতো কঠোর এবং কুসুমেব মতো কোমল-হৃদয় সেই দেশনেতার মধ্যে সুমন্ত্র অতীতভারতের চারিত্রিক ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাঁহার কাছে এবং তাঁহাব পরিবারের কাছে পুত্রস্নেহ এবং আত্মীয়স্নেহ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে সে। জেলখানার মধ্যে দুর্বলতার মুহূর্তে একদিন সে তাঁহাকে বলিয়াছিল, "আমরা সাধারণ মানুষ, কি করতে পারি এত বড়ো দেশের?" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা খুব সাধারণ নও সুমন্ত্র, তাহ'লে লেখাপড়া চাকরীবাকরী নিয়ে বৌছেলে জুটিয়ে ঘরে ব'সে থাকতে; মার খেতে, জেল খাটতে, প্রাণ দিতে আসতে না।" বলিয়াছিলেন মহাত্মাজীর কথা, তাঁহার এইরূপ এক দুর্বল মুহূর্তের প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মাজী তাঁহাকে প্রতিপ্রশ্ন করিযাছিলেন, "তুমি তোমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছ?" "করেছি।" "তাহলে বাকীটা ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দাও।" পিতৃতুল্য শুভার্থী এই মানুষটির কাছে কিছুক্ষণ বসিলে সে দেহে মনে নূতন শক্তিলাভ করে, সর্বাঙ্গে তীর্থস্নানের শুচিতা অনুভব করে। তাহার দুর্ভাগ্য, সেদিন তিনি কার্যক্ষেত্র হইতে কলিকাতায় আসেন নাই। সুমন্ত্র একখানা কাপড় কিনিয়া দোকান হইতে বাহির হইল।

গ্লোব নার্সারি হইতে কিছু ফুলগাছ ও আনাজের বীজ এবং তাহার পাশে বাসনের দোকান হইতে একটি পেটাঘড়ি কেনা হইল, অপর ফুটপাথের

বিভিন্ন দোকানে রং, তুলি, গরমজলের ব্যাগ এবং কিছু বায়োকেমিক ঔষধও সংগৃহীত হইল। দুইখানি শ্লেট, একটি বাংলাদেশের ম্যাপ ও খানকয়েক খাতা কিনিয়া হাত খালি হইয়া আসায় সুমন্ত্র এবারকার মতো বাজারপর্ব শেষ করিল। এইগুলি সুবিধামতো বেলগাছিয়ার খাল-ধারে মোটরলঞ্চে তুলিয়া দিলেই কোনো পরিচিত যাত্রীর মারফতে পৌছিয়া যাইবে।

চৌমাথার মোড়ে একজন ঘাগী কংগ্রেসকর্মীর সঙ্গে দেখা। পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "ইস্কুলটা চালাচ্ছ তো? বেশ, বেশ। ইলেকশনের সময় কাজে লাগবে ছেলেগুলো। টাকাকড়ির দরকার হ'লে বোলো।" সুমন্ত্র ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, বলিবে। তারপর দ্রুতপদে তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে আর একটা খদ্দরের দোকানে গিয়া উঠিল। সেখানে ঢুকিতেই প্রবীণ বন্ধু তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "মুখটা শুকনো দেখাচ্ছে। কি খাবে বলো তো? সরবৎ আনাব?"

সুমন্ত্র প্রণাম করিয়া বলিল, "কিছু আনাতে হবে না, এই বাজারপত্রগুলি একটু রেখে যাচ্ছি। কাল নিয়ে যাব। হ্যাঁ, বাড়ি ভাড়া আছে সন্ধানে সিদ্ধেশ্বরদা'।"

বাড়ির সন্ধান সেখানে কেহই দিতে পারিল না।

অতঃপর সুমন্ত্র হেদুয়ার কাছে এক আত্মীয়-গৃহে স্নেহপ্রীতির কিছু রসদ সংগ্রহ করিয়া হরি ঘোষ স্ট্রীটের একটা ছাপাখানায় আসিয়া উঠিল। এইখানে এবং শ্যামবাজারে আর একটি ছাপাখানায় তাহার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। দুইটি আড্ডায় যে দুইশ্রেণীর মানুষ সমবেত হইতেন তাঁহারা ভিন্নমতের এবং ভিন্নপথের হইলেও অনেকেই তাহার আত্মার আত্মীয়, তাহার সহধর্মী এবং সহমর্মী; তাঁহাদের স্নেহস্পর্শে তাহার অন্তর স্নিগ্ধ হইত।

তথাকথিত হরি-ঘোষের-গোয়ালের সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া ডানদিকেই পড়ে সরু লম্বা অফিস-ঘর, সেখানে অনেকগুলি টেবিল চেয়ার এবং তাহার চেয়ে বেশী মানুষের ভিড়। কেহ খবরের কাগজ পড়িতেছে, কেহ প্রুফ দেখিতেছে, কেহ-বা পার্শ্ববর্তী সঙ্গীকে নিজের ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনাইতেছে। পরলোকগত স্বত্বাধিকারী মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, প্রতিষ্ঠানটির আয় দেশের কাজে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তিনি, সুতরাং বর্তমানে ছাপাখানাটির বাপ-মা নাই। দূরদূরান্তর হইতে গ্রামসেবকেরা আসিতেছে,

যাইতেছে। সদাব্রত খোলা আছে, আবাহনও নাই, বিসর্জনও নাই। সুমন্ত্রকে কিন্তু সেখানে সকলেই ভালোবাসে, সকলেই তাহাকে দেখিলে খুশি হয়, তাই দুইদিনের জন্য আসিলেও সুমন্ত্রকে একবার সেখানে ঢুঁ মারিয়া যাইতে হয়।

আজও সে অফিস-ঘরে পদার্পণ করিতেই অনেকেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বয়োবৃদ্ধ স্বদেশী কম্পোজিটার বন্ধুটি তরুণবয়স্ক স্বদেশী ম্যানেজার-বন্ধুকে ধমক দিতে দিতে থামিয়া বলিল, "এই যে সুমন্ত্রদা'।"

"ভালো তো সব? যতনদা' কোথায়? দেখছি না যে?"

"পাশের ঘরে, যান। এবার অনেকদিন পরে এলেন, না?"

ঘরের শেষপ্রান্তে টেবিলের দুই পাশে উপবিষ্ট যে দুইজন দেশকর্মী প্রুফ দেখিতেছিলেন, তাঁহারা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আরে কবি যে? এস, এস। ওহে সাতকড়ি, সুমন্ত্রর জন্যে বেগুন পোড়াতে দাও।"

সুমন্ত্র ইঁহাদের সঙ্গে আলাপ সারিয়া ইঁহাদের একজনের পাশ-কাটাইয়া যতনদা'র সন্ধানে পাশের ঘরে ঢুকিল। সে ঘরখানির তিনভাগ জুড়িয়া কাগজের গুদাম, সিলিং-চুম্বী শত শত রীম কাগজ আর তাহারই ফাঁকে ফাঁকে সুকৌশলে বিন্যস্ত কয়েকটি তক্তাপোষ। তাহার কোনোটিতে কোনো দূরাগত তরুণ গ্রামকর্মী রোগযন্ত্রণায় কাৎরাইতেছেন, কোনোটাতে কোনো প্রবীণ দেশসেবক ঝুলি-ঝোলা খুলিয়া কাগজপত্র ছড়াইয়া চিন্তা করিতেছেন, কোনোটিতে কেহ চরখা কাটিতেছেন বা ধ্যান করিতেছেন। এককোণে একটি আলমারিতে কিছু সদ্‌গ্রন্থ, তাহার পাশে দেরাজে কিছু খাদ্যদ্রব্য। একজন স্বাস্থ্যান্বেষী দেশকর্মী তাহারই পাশে মাটিতে উবু হইয়া বসিয়া স্টোভে ডিম সিদ্ধ করিতেছিলেন। ঘরের কড়িকাঠ হইতে দড়ি দিয়া বাঁধা একছড়া পাকাকলা ঝুলিতেছে, উহা যাহার যখন প্রয়োজন খাইতে পারে। পিছনের ঘরগুলিতে ঘড়ঘড় শব্দে গর্জন করিয়া বিদ্যুচ্চালিত লৌহদানব রাশি রাশি কাগজ ভক্ষণ এবং উদ্গীরণ করিতেছে। এই আখড়ার মোহান্ত এবং স্বদেশী কর্মি-যূথের যূথপতি হইতেছেন যতনদা'। গৌরকান্তি সৌম্যমূর্তি এই সদাপ্রসন্নমুখ ব্যক্তিটি একাধারে দেশপ্রেমিক এবং শিল্প ও সাহিত্য-রসিক। বহু রুগ্ন দুঃস্থ দেশসেবকের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা তাঁহার নিত্যকর্ম, প্রেসের লাভ লোকসানের তত্ত্বাবধান এবং প্রুফ দেখার ফাঁকে ফাঁকে তিনি সাহিত্যচর্চাও করিয়া থাকেন। ঘরের এককোণে চেয়ারে

বসিয়া তিনি তখন নিবিষ্টচিত্তে কি একটা বই পড়িতেছিলেন, সুমন্ত্রকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "আরে কবি যে? এস, এস। তারপর কি খবর বলো? কবে এলে?" সুমন্ত্র প্রণাম করিতেই তিনি তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। মানুষের হট্টগোলে এবং যন্ত্রের গর্জনে কাণ পাতা যায় না, তারই মধ্যে যতনদা'কে দুইটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতে হইল। পিছনের উঠান হইতে কাগজ-পোড়ার গন্ধ আসিতেছে, সেখানে দিস্তা দিস্তা পরিত্যক্ত প্রুফ-কাগজ জ্বালাইয়া কয়েকটি বেগুন পোড়ানো হইতেছে, কেননা দোতলার উনানে বিরাট কুকারে ভাত, ডাল, খুব জোর একটা তরকারী সিদ্ধ পর্যন্ত চলিতে পাবে, বেগুন-পোড়ার মত বিলাস দ্রব্যের স্থান তাহার মধ্যে হয় না। রাত্রে দোতলার ঘরে মেঝেতে মাদুর বিছাইয়া শয়নের ঢালাও ব্যবস্থা। টিঞ্চার আয়োডিন এবং একটু তুলা, সেই সঙ্গে একটা বাতি দেশলাই লইয়া শুইযা পড়িলেই হইল। 'ইলেকট্রিক লোশন' এবং টর্চ রাখিলেও ক্ষতি নাই, মোট কথা, রক্তরোধক যে-কোনো একটা ব্যবস্থা হাতের কাছে রাখিতে হয়, কারণ, রক্তপাত সেখানে প্রাত্যহিক ঘটনা। প্রেসের বড়ো বড়ো ইন্দুরগুলি কবিদের মতোই নিরঙ্কুশ, তাহারা রাত্রে নির্ভয়ে ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়, ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য যথেষ্ট না পাইলে অহিংস সত্যাগ্রহীদের রক্তমাংসে উদর পূর্ণ কবিতে চেষ্টা করে। কোন্ দিন কাহার উপর তাহাদের দযা হইবে তাহা পূর্বাহ্নে জানা না থাকায় সকলেই প্রতিরাত্রে আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত হইয়া শয্যা গ্রহণ করে। সুমন্ত্র এই ছাপাখানার ছোটো-বড়ো কর্মিমাত্রেরই অত্যন্ত স্নেহভাজন, তবু দুইরাত্রির ইন্দুরদংশনের অভিজ্ঞতাব পর সে দিনের বেলা যাতায়াত রাখিলেও, সেখানে রাত্রিবাসের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়াছে। যতনদার সঙ্গে আলাপ সারিয়া সে গেল শ্যামবাজারে। মোহনবাগানের আড্ডাঘরটির মধ্যে কাগজের র‍্যাক নাই, অন্তরালবর্তী মুদ্রণযন্ত্রেব আর্তনাদও তেমন কর্ণপীড়াদায়ক নহে। সেখানে বাংলাদেশের বহু জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হয়। শিল্পী, উপন্যাসিক ও সাংবাদিক, রাজভক্ত এবং দেশভক্ত সকলেরই অবারিত দ্বার সেখানে। গৃহকর্তা বন্ধুবৎসল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছোটো-বড়ো সকলের সঙ্গে সমানে ইয়ারকি দিতেছেন, চা সিগারেট সিঙ্গাড়া পান্তুয়া বিতরণ করিতেছেন। আবার অন্যের আবৃত্তি শুনিতেছেন, নিজের লেখা শুনাইতেছেন। ভদ্রলোক নিজে একজন সম্পাদক এবং প্রচণ্ড সাহিত্যিক, কিন্তু তিনি যে কখন লেখেন তাহা সুমন্ত্র ভাবিয়া পায়

না। গল্পে, পদ্যে, ভাষায় এবং ছন্দে তাঁহার যেমন অসাধারণ অধিকার—সমালোচনায় এবং শ্লেষাত্মক রচনাতেও তেমনি অদ্ভুত নৈপুণ্য; বন্ধুদের স্নেহ এবং শত্রুদের ভীতির পাত্র এই সহৃদয় মানুষটির সাহায্য সুমন্ত্র অনেক সময় অযাচিতভাবে পাইয়াছে। মাসিকপত্রে কবিতা পড়িয়া তিনি যেদিন সুমন্ত্রের সঙ্গে যাচিয়া আলাপ করেন তাহার পর হইতে এই বহুনিন্দিত অসমবয়সী বন্ধুটির সূত্রে বহু সুসাহিত্যিকের সহিত পরিচয়ের সুযোগ তাহার হইয়াছে। হরি ঘোষ স্ট্রীট হইতে সুমন্ত্র সোজা পায়ে হাঁটিয়া মিনিট পনেরো পরে মোহনবাগানের গলির মধ্যে সেই ছাপাখানাবাড়ীতে প্রবেশ করিল।

অফিস ঘরের দরজা ঠেলিয়া ঢুকিতেই সম্পাদক স্বাগত সম্ভাষণ জানাইলেন, "আরে সুমন্ত্র যে? অনেকদিন বাঁচবে, এইমাত্র তোমার কথা হচ্ছিল। এলে কবে?" "আজই আসছি।" "ক'দিন আছ কলকাতায়? কাল গোটাদশেক লাইন-ড্রয়িং ক'রে এনে দাও দিকিনি। পূজোর সংখ্যায় সন্ধ্যামণি লেখা চেয়েছে হে, কিচ্ছু মাথায় আসছে না। ইলাস্ট্রেটেড কবিতা চায়। তুমি যা পারো এঁকে ফেল। একটা ছেলে থাকবে, একটা মেয়ে থাকবে, বুঝেছ? বেশ আধুনিক-মার্কা, চটপট সেরে ফেল, এই সপ্তাহে ছাপতে চায় ওরা। তুমিও কিছু পেয়ে যাবে।"

সুমন্ত্র এখানে আসিয়া কিছুতেই সহজে বিস্মিত হইত না, তবু এক্ষেত্রে একটু বিরত বোধ না করিযা পারিলনা। বলিল "আপনার কবিতা লেখা হ'ল না আমি তার ছবি আঁকব কি ক'রে?"

সম্পাদক হাসিয়া বলিলেন, "তবে আর রামশ্যামকে না ব'লে তোমাকে বলছি কেন? এমন একটা ধারা রেখে যাও যাতে সেই ছবিগুলো দে'খে জোড়াতাড়া দিয়ে একটা প্লট খাড়া করতে পারি; কি, মাথা নাড়ছ যে? পারবে না? তুমি ডোবালে দেখছি আমাকে! আরে, কোনো ভাবনা নেই, কিছু না পারো গোটাকতক ছেলেমেয়ের স্কেচ দিয়ে যাও আমাকে, দেখি কি করতে পারি।"

সুমন্ত্র বলিল, "তিনদিন পরে হ'লে চলে তো বলুন, এখন আমি ভীষণ ব্যস্ত। কোনো বাড়ি ভাড়া আছে বলতে পারেন এপাড়ায়—পঞ্চাশটাকার মধ্যে?"

ভদ্রলোক মাথা নাড়িয়া প্রশ্ন করিলেন, "তোমার আবার বাড়ির দরকার হ'ল কি জন্যে? পরোপকারায়? যেদিন নিজের জন্যে খুঁজবে সেদিন চেষ্টা

করব, এখন নয়। হ্যাঁ, তারপর পার্বতীবাবুর গল্পটা শোনো, কিছু জ্ঞানলাভ করবে।"

বলাবাহুল্য, সাহিত্যস্রষ্টারা সাহিত্যচর্চার চেয়ে পরচর্চায় আনন্দ পান বেশি। অন্যের অভিজ্ঞতা নিজের লেখার খোরাক যোগায় অনেক সময়।

গোলগাল শ্যামবর্ণ ভালোমানুষের মতো চেহারা যে বিপত্নীক প্রৌঢ় সাহিত্যিকটি সম্পাদকের বাঁদিকের চেয়ারটাতে বসিয়া গল্প ফাঁদিয়াছিলেন তিনি আবার আরম্ভ করিলেন, "মিতু কি খুশি সেই সোনাপোকার টিপ পেয়ে। সত্যি এত অল্পে-সন্তুষ্ট মেয়ে আমি আর দেখিনি। কিছুই দিতে পারি না তাকে, তবু সে কত খরচই করে আমার জন্যে, কি ভালোইবাসে। সেবার—"

ভদ্রলোকের কন্যার বয়সী বান্ধবীদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতার গল্প সুমন্ত্র এ আড্ডায় আসিয়া অনেকবার শুনিয়াছে, ক্রমে বয়সের ব্যবধানের জন্য সঙ্কোচ লোপ পাইয়াছিল। সে একটু কঠোরস্বরেই বলিল, "আপনি দিন দিন বুড়ো হচ্ছেন, না, খোকা হচ্ছেন, পার্বতীদা' ?"

পার্বতীবাবু ভর্ৎসনা গায়ে মাখিলেন না, হাসিয়া বলিলেন "আমার মিতু যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন আমি বুড়ো হ'ব না ভাই, তা তোমরা যতই রাগ করো।"

ঘরশুদ্ধ-লোক হাসিয়া উঠিল। "আজ আসি" বলিযা অপ্রস্তুত সুমন্ত্র বাহির হইয়া আসিল।

পিছন হইতে সম্পাদক বন্ধুব পরিহাসতরল উচ্চকণ্ঠের উপদেশ বাক্য শোনা গেল, "এখনও সময় আছে, সুমন্ত্র, আর দশ বছর ব্রহ্মচর্য পালন করলে তোমারও পার্বতীবাবুর অবস্থা হবে শেষ পর্যন্ত।" সুমন্ত্র আর দাঁড়াইল না, হন হন করিয়া হাঁটিযা সার্কুলার রোডের ট্রাম ধরিল।

আর একটা ঠিকানায় হাজিরা দেওয়া বাকি ছিল সেদিন সুমন্ত্রের, সেটি তাহার বাড়ীর কাছেই নূর মহম্মদ লেনের এক বিলাতফেরত ডাক্তারের বাড়ীর একটি আধ্যাত্মিক 'আখড়া'। উনিশ বা ত্রিশ সালে 'কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের আশ্রয় দিলে বাড়ী বাজেয়াপ্ত হইবে' বলিয়া যখন অর্ডিনান্স জারি হয়, সেই সময় যে অল্প কয়েকজন শুভার্থী তাহাকে কলিকাতায় আসিলে সানন্দে নিজ গৃহে স্থান দিতেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তাহার এক পিতৃব্যবন্ধু এই ডাক্তারবাবুটি; পিতৃব্য বিদেশে গেলে উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহার সহিত ইয়ারকি দিবার অধিকার সে লাভ

করিয়াছে। 'ডাক্তার সাহেব' না বলিয়া 'বাবু' বলার উদ্দেশ্য এই যে বিলাত ফেরত হইলে বেশেবাসে জীবনযাত্রায় ভদ্রলোকের সাহেবত্বের গন্ধও ছিল না। ডাক্তারি করিয়া উপার্জনের চেষ্টার চেয়ে সাধুসঙ্গ এবং অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চার দিকেই তাঁহার ঝোঁক ছিল বেশী, তাই তাঁহার বৈঠক-খানায় বেকার যুবক, সম্ভ্রান্ত চাকুরিয়া, কেরাণী, দালাল, পেন্সনভোগী হাকিম, মাষ্টার, পণ্ডিত এবং গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীবৃন্দের অপূর্ব সমাবেশ ঘটিত; সমান উৎসাহে প্লেটো, অ্যারিস্টটল, কাণ্ট, হেগেলের সঙ্গে কপিল, পতঞ্জলি, বুদ্ধ ও শঙ্করের শ্রাদ্ধ চলিত। থিযজফি, জ্যোতিষ ও নানা জাতীয় প্রধান প্রক্রিয়ার, মোট কথা ডাক্তারি ভিন্ন প্রায় সকল বিষয়ের আলোচনাতে ঘরটি সর্বদা সরগরম থাকিত। সুমন্ত্র যখন সে ঘরে প্রবেশ করিল, তখন ডাক্তারবাবুর অনুপস্থিতিতে প্রবীণ এবং নবীন চার পাঁচটি আড্ডাধারীর মধ্যে ঘোরতর 'পলিটিকো-রিলিজিয়স্' তর্কযুদ্ধ চলিতেছিল। যোগানন্দ স্বামী গোল্ডফ্লেক সিগারেটশোভিত হাত নাড়িয়া বুঝাইতে-ছিলেন, 'তন্ত্রোক্ত বীর-সাধনের সাহায্যে অর্থাৎ শবসাধন, চিতাসাধন এবং পঞ্চমুণ্ডীসাধন দ্বারা মৃত্যুভয়কে জয় করিতে না পারিলে পরাধীন ভারতবর্ষের গতি নাই।' অপর পক্ষে গৃহী বেকার অনিমেষবাবু বলিতে-ছিলেন, "রেখে দিন মশাই ওসব বুজরুকি। মৃত্যুভয় জয় করে কোন্ উপকারটা করলেন আপনি দেশের? ওসব মুণ্ডীফুণ্ডীতে চলবে না। আর, ফেৎকারিনীতন্ত্র আর খেচরীমুদ্রার কর্ম নয়। দেশভক্ত সবাইকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিতে হবে। ছেলেবুড়োকে এখন গুরুগোবিন্দের মতো বলতে হবে, 'যব চিঁড়িয়াসে বাজ লড়াউঁ, তব গুরুগোবিন্দ নাম বতাউঁ।' ও যাই বলুন আপনাদের গান্ধীজী, অস্ত্র ছাড়া কিছু হবে না। এসব দৈত্য নহে তেমন।"

সুমন্ত্র ততক্ষণে বেঞ্চের একপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়াছে, সে বলিল, "বিনা অস্ত্রেই হবে অনিমেষবাবু, অস্ত্র এত বেড়ে গেছে যে অস্ত্রের যুগ শেষ হয়ে এল। চড়াই পাখীর সঙ্গে বাজ পাখীর লড়াই দেখেন নি? কামান বন্দুকের সঙ্গে শূন্যহস্ত সত্যাগ্রহীদের? আমি দেখেছি।"

অনিমেষবাবু দমিলেন না, বলিলেন, "ফলটা কি হল? দশজন প্রাণ দিলে, হাজার জন জেলে গেল, আর কোটি জন ঘরে ঢুকে খিল দিলে। মাঝ থেকে আপনাদের মতো বোকাচণ্ডী দু'চার জন নিজেদের কেরিয়ার নষ্ট করে বেকার বাউণ্ডুলের সংখ্যা বাড়ালে। ছোঃ!"

সুমন্ত্রকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়া দ্বারদেশ হইতে গৃহপ্রবেশরত ডাক্তারবাবু বলিয়া উঠিলেন, "জয় বোকাচণ্ডীর জয়! ঈশ্বর করুন, তুমি জন্ম জন্ম এই রকম বোকাচণ্ডী হয়েই থাকো সুমন্ত্র। দেশে বুদ্ধিমান বড়ো বেড়ে গেছে, গুটিকতক বোকালোকের ভারী দরকার এখন দেশে। তারপর, কি মনে করে?"

বৃদ্ধ পণ্ডিত ভবতারণবাবু এতক্ষণ নীরবে ঘরের আর একপ্রান্তে একখানি চেয়ারের উপর বদ্ধ পদ্মাসনে বসিয়া উর্ধ্বমুখে নিমীলিত নয়নে বিঁড়ি টানিতেছিলেন, ফাঁক পাইয়া বলিলেন, "আপনারা বৃথা চঞ্চল হচ্ছেন। শাস্ত্রে বলেছে, "যথা পরিণতং পতেৎ প্রসববন্ধনাৎ, তে পরিণতপাপ্মানঃ পতিষ্যন্তি তথা স্বয়ং।—পাপের ভরা পূর্ণ হ'লে আপনিই উচ্ছন্ন যাবে ইংরেজ, ব'সে ব'সে মজাটা দেখুন না।"

অনিমেষবাবু বলিলেন, "সাতপুরুষ ধরে যথেষ্টই তো মজা দেখলেন, অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শক্তি, ধন, প্রাণ,—সবই তো এল শেষ হয়ে, এখনও মজা দেখতে লজ্জা করছে না? সর্ব্বস্ব যে গেল এদিকে?"

ডাক্তার অচলেশবাবু ততক্ষণে বন্ধুচক্রের কেন্দ্রস্থলে কাষ্ঠাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার আহ্বানে বাড়ির চাকর ভজহরি সকলকে চা দিয়া গেল। সরকারী পেন্সনভোগী রমেশবাবু ধূমায়মান চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলিলেন, "আস্তে আস্তে, দিদিমণি না জানতে পারে। আমাকে ডোবাবেন না, দোহাই আপনাদের। তা শুধু গেল'টার হিসেবই দেখছেন স্যার, 'এল'টাব কথা স্রেফ ভুলে মেরে দিয়েছেন? রেল এল, মোটর এল, ইলেকট্রিক এল, রেডিয়ো এল—"

"হোয়াইট হর্স এল, হোয়াইট এলিফ্যাণ্ট এল, বিলিতী জোচ্চুরি এল, ফেরঙ্গ রোগ এল, বলুন, বলুন"—

রমেশবাবু কিছুমাত্র না দমিয়া বলিলেন, "ওসব সভ্যতার অঙ্গ। কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে? এই যে সন্ধ্যেবেলা পাঁচ বন্ধুতে বিজলী-বাতি জ্বেলে মৌজ ক'রে 'চা'টি খাচ্ছি, আড্ডা সেরে চার আনা ফেললে সিনেমায় দেশবিদেশের জ্যান্ত ছবি দেখব, চার পয়সা ফেললে মোটর বাস এক ক্রোশ দূরে বাড়ীর দোর গোড়ায় পৌছে দেবে;—এটি হ'ত আপনাদের বৈদিক আমলে? বলুন?"

তর্ক চলিতে লাগিল: সুমন্ত্র আর তাহাতে যোগ দিল না, উঠিয়া গিয়া

ডাক্তারবাবু এবং যোগানন্দ স্বামীজীর মধ্যস্থলে শূন্য চেয়ারটি দখল করিয়া বসিল। স্বামীজী খুশি হইয়া বলিলেন, "যত সব এঁড়ে তর্ক এদের! দৈবের বাড়া বল আছে? হ্যাঁ সুমন্ত্র, তোমাকে ষট্‌চক্রভেদের প্রণালীটা এবার একদিন বুঝিয়ে দেব ভালো ক'রে। তোমার হবে। প্রাণায়ামের অভ্যাসটা রেখেছো তো? আসনগুলো ক'রে যাচ্ছ ঠিক ঠিক? ভুল কোরোনা কিন্তু, পদ্মাসনটা সকালে, ময়ূরাসন আর গরুড়াসন সন্ধ্যেবেলা, আর বৃক্ষাসনটা মহানিশায়। প্রাণায়ামে কোন্ নিয়ম 'ফলো' করছ? দশ, দশ, দশ, আট, ষোলো, চার? প্রথমশিক্ষার্থীদের আমি বলি শ্বাস টানতে দশবার, আটকে রাখতে দশবার আর ছাড়তে দশবার। নাম জপই সুবিধে। অচলবাবু অবশ্য বত্রিশ, চৌষট্টি, ষোল করেন, সে তুমি এখন পারবে না। ক্রমে বাড়াতে হয়। আমার মতে একশ' আটেও কষ্ট হবে না কিছু দিন পরে। আয়ু বাড়বে, মেধা বাড়বে। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি খানিকটা এগিয়েছ।"

সুমন্ত্র ধরা ছোঁয়া দিল না। সত্য বলিয়া ভদ্রলোকের মনে কষ্ট দিয়া লাভ কি? যৌগিক ব্যায়ামের উপযোগীতায় তাহার অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা ছিল না, নিজের চোখেই অনেক ভেল্কি দেখিয়াছে সে, তবু তাহার বন্ধনবিরোধী মন দিনের পর দিন ঐভাবে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শরীরকে ওঠ-বোস করাইতে বাঁকিয়া বসে, ধৈর্যের বড়ো অভাব তাহার। সে স্বামীজীর কথার উত্তরে একটু আধ্যাত্মিকগন্ধী হাসি হাসিল, যাহা বুঝিবার বুঝিয়া লউন তিনি। তারপর অচলেশবাবুর কানে কানে বলিল, "একটু সময় হবে?"

অচলেশ ডাক্তার এই গোলমালের মধ্যেই যোগবাশিষ্ঠ খুলিয়া বসিয়াছিলেন। বলিলেন, "ভারী সুন্দর উপমাটা দিয়েছে হে। বলছে, মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণ যেমন মাকে চোখে দেখতে পায়না অথচ তাঁরই দেহরসে পুষ্ট হ'য়ে তাঁরই মধ্যে বেঁচে থাকে, আমরাও তেমনি আমাদের স্রষ্টাকে, ঈশ্বরকে চোখে দেখতে পাইনা, অথচ তাঁরই সঙ্গে, তাঁরই দেহমধ্যে, তাঁরই দয়ায় বেঁচে আছি, বেড়ে উঠছি, জীবনযাত্রা নির্বাহ করছি। চমৎকার বলেছে! প্রমাণ নেই বলে আমরা ঈশ্বরকে উড়িয়ে দিই অথচ আমরাই তাঁর জ্যান্ত প্রমাণ! হ্যাঁ, কি বলছিলে?"

সুমন্ত্র কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "থাক এখন, পরে হবে। সামান্য কথা। সত্যি, ভারী সুন্দর বলেছে।"

অচলেশবাবু বলিলেন, "ঢোঁক গিলে কথা বলো কেন, বাবা? ধার চাই? কত? আমার ট্যাঁক কিন্তু গড়ের মাঠ, তোমার কাছেই কিছু চাইব ভাবছিলাম।"

সুমন্ত্র হাসিয়া বলিল, "ধার নয়, একটা বাড়ীভাড়া চাই। এ পাড়ায় আছে? টাকা পঞ্চাশের মধ্যে!"

অচলেশবাবু আশ্বস্ত হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "তাই বলো, বাড়ী ভাড়া। তা, মোছলমান বাড়ী চলবে? রহিমবক্স সাহেব তাঁর চিলের ছাদে একটা কুঠরি ভাড়া দিতে চান বলছিলেন সেদিন, দশ টাকাতেই হবে। ভাবছিলুম দিনের মধ্যে ঘণ্টাকয়েক আমিই সেখানে কাটাব আসছে মাস থেকে। বাড়ির ভেতর চ্যাঁ ভ্যাঁ, আর বাইরে এই গুলতন। সাত মক্কেলে পাগল ক'রে তুলেছে আমায়। কেউ কিচ্ছু করবে না, শুধু বাজে ব'কে মরবে। তা বেশ, আমার বানপ্রস্থ নেওয়া তো এক কথায হবে না, এরা সেখানেও জুটবে। তা তুমি যদি চাও, তোমায় দিতে পারি ব্যবস্থা ক'রে। গ্রামে কি সুবিধে হচ্ছে না? যাই বলো, মানুষের একটু নির্জনতা দরকার। সারাক্ষণ হাটের হৈ চৈ ভালো লাগে কি? বিশেষ ক'রে সাধন ভজন করতে হ'লে—"

সুমন্ত্র বলিল, "আমার জন্যে নয়, এক বন্ধুর বাড়ির দরকার। পুরো বাড়ী চাই একখানা,—সন্ধানে আছে? ভদ্রেশ্বর কুণ্ডু—"

অচলেশবাবু বলিলেন, "সে মক্কেলটি আবার কবে জুটল? কথা শোনো, সুমন্ত্র, আমার আখড়া দেখেও শিক্ষা হ'ল না? ওসব বন্ধু ফন্ধুর সঙ্গে আর জড়িয়োনা বেশী, ফেঁসে যাবে শেষ পর্যন্ত। সংসারে কোনো শালা কারো বন্ধু নয়। কোথা থেকে এসেছি, কোথায় চলে যাব কেউ জানেনা। কেউ সঙ্গের সাথী হবে না তোমার। বখেড়া আর বাড়িযোনা, বাবা। দুটো সৎকথা শোনো, একটু আত্মচিন্তা কর, ঈশ্বর চিন্তা করো, ব্যস্!"

সুমন্ত্র আর কথা বাড়াইল না, সকলের কাছে বিদায় লইয়া বাড়ী ফিরিল। পথে কালিকা ভোজন আশ্রমে রাত্রের আহারটা সারিয়া লইল সে। পটলডাঙার বাড়ীতে বৈঠকখানার ভাড়াটিয়া হোমিওপ্যাথ ডাক্তারবাবুটি ততক্ষণে ডাক্তারখানা বন্ধ করিয়া বাড়ী গিয়াছেন। সদর দরজার তালা খুলিয়া সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিতে প্রথমেই পড়ে তাহার শয়ন ঘর। সুমন্ত্র চাবি খুলিতে গিয়া দেখিল, রিঙের মধ্যে সে-ঘরের চাবি নাই। সম্ভবতঃ গ্রামেই ফেলিয়া

আসিয়াছে, চাবিটা আলাদাই থাকিত, তাহার যে জামাটা ছাড়িয়া আসিয়াছে তাহার পকেটে আছে নিশ্চয়। অগত্যা বসিবার ঘরটার তালা খুলিল সুমন্ত্র, কিন্তু সুইচ টিপতে জ্বলিল না। ডাক্তারবাবু তো ইলেক্‌ট্রিক বিল নিয়মিত দিয়া যাইতেছেন, তবে কি বাল্‌ব্‌ খারাপ হইয়া আছে? চুলায় যাক আলো। মেঝেয় মস্ত বড়ো একখানা সতরঞ্চ বিছানো থাকিত, অন্ধকারে হাৎড়াইয়া সেইখানা টানিয়া কাঁধে ফেলিল সুমন্ত্র। তেতলার ছাদে লইয়া গিয়া দুইপাট করিয়া বিছাইল সেখানাকে, তারপর জুতা জামা ছাড়িয়া নিজের ক্লান্ত দেহ বিছাইয়া দিল তাহার উপর। সৌধকিরীটিনী মহানগরীর উচ্চাবচ গৃহশীর্ষাঙ্কিত দিগ্বলয়ের প্রান্তে সুতালি চাঁদ দেখা দিয়াছে, আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র। কাছেই কোন্‌ একটা ছাদে কে যেন গান ধরিয়াছে, 'অনুরাগ বিনে—কিছু হয়না ভজন সাধনে।'

সুমন্ত্র গান শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক হইয়া গেল। সত্যই তো! তাহার সাধনা যতই কঠোর হউক না কেন, তাহা যে অনুরাগহীন হইয়া পড়িতেছে তাহাতো তাহার নিজের কাছে আর অজ্ঞাত নাই। কিন্তু কি করিবে সে এখন? উর্দ্ধাকাশে সপ্তর্ষির দিকে চাহিয়া এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ একসময়ে ঘুমাইয়া পড়িল সুমন্ত্র।

সুমন্ত্র ভদ্রেশ্বরের জন্য বাড়ি খুঁজিতেছে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া সে সকালবেলা বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছিল। এখন বেলা দুইটা বাজে। পাড়ায় আর একখানি বাড়িও দেখিতে বাকি নাই। সুমন্ত্র ক্রমেই হতাশ হইয়া পড়িতেছিল। যতগুলি বাড়ি দেখিয়াছে তাহার মধ্যে অধিকাংশই তাহার পছন্দ হয় নাই, যেগুলি পছন্দ হইয়াছে সেগুলির হয় ভাড়া অত্যধিক, না হয় পাশের বাড়িতে রেডিয়ো বাজে। কোথাও বাড়িওয়ালার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, কোথাও তাঁহার সহিত তর্কাতর্কি হইয়াছে। কালিদাস সিংহের লেনে একটা বাড়িতে তো মার খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। বাড়িওয়ালা ভাড়া-বাড়ির পাশের বাড়িতেই থাকেন, অনেক ডাকাডাকির পর গামছা পরিয়া আসিয়া বহু কষ্টে কব্জাহীন পতনোন্মুখ দরজাটি খুলিয়া দিলেন। একটা পাল্লা ঈষৎ কাৎ হইয়া রহিল, আর একটি অর্ধেকটা খুলিল। তাহারই ফাঁক দিয়া ভদ্রলোক সন্তর্পণে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "কোত্থেকে আসছেন? মোসায়ের নাম?" সাতপুরুষের ফিরিস্তি লইয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আমার বাড়ি কি আপনি নিতে পারবেন মোসাই? সাট টাকা ভাড়া লাগবে। দু'টি মাসের ভাড়া আগাম দিতে হবে, আর দু'টি বচ্ছরের কণ্ট্যাক্টো ক'রতে হবে।"

সুমন্ত্র বলিল, "বাড়ি পছন্দ হ'লে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত দিতে পারি, আর ছ' মাসের ভাড়া আগাম দিতে পারি। বাড়ি তো আগে দেখি।"

বাড়িওয়ালা খুশি হইয়া বলিলেন, "বেস, বেস। কথাবাত্রা পরে হবে, বাড়ি তো দেখুন আগে। পটলা, এই পটলা, এই বাবুটিকে তিন লম্বোরটা খুলে দেখিয়ে দে তো।" তারপর সুমন্ত্রর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একটু লোংরা হ'য়ে আচে মোসাই, একটা মজুর লেবে।"

আন্দাজ বিংশতিবর্ষবয়স্ক একটি যুবক স্নানের পর লুঙ্গি পরিয়া সদর দরজার ওপাশে দাঁড়াইয়া আরশি হাতে পরিপাটি করিয়া পাতা তুলিয়া তেড়ি কাটিতেছিল এবং মাঝে মাঝে সুমন্ত্রর দিকে তাকাইতেছিল, পিতার আদেশ শুনিয়াও শুনিল না। বাড়িওয়ালা আবার হাঁকিলেন, "বলি লবাবপুত্তুরের কথাটা কানে গেল, না গেল না? তিন লম্বোর বাড়ির চাবিটা লিয়ে এস।"

এইবার যুবক অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরমন্থরগমনে ভিতরে চলিয়া গেল, তাহার পিতাও তাহাকে অনুসরণ করিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া গেলেন। মিনিট পাঁচেক পরে যুবক গায়ে একটা চুড়িদার পাঞ্জাবী আঁটিয়া এবং স্লিপার পায়ে দিয়া চাবির গোছা লইয়া বাহির হইল। বলিল, "আস্থন স্যার।"

পিতাপুত্রের কথাবার্তায় একমাত্র 'স' উচ্চারিত হইতেছিল, উহা বিশুদ্ধ সংস্কৃত দন্ত্য 'স', ইংরাজি 'এস'এর নামান্তর, বাঙলায় উহার বহুল ব্যবহার নাই। বাড়ির দরজায় দুই দুইটি বৃহৎ তালা, সেগুলিকে বশ করিতে এবং সদর দরজা খুলিতে কিছুক্ষণ কসরৎ করিতে হইল। যুবক অর্থাৎ পটোল অনুচ্চস্বরে বলিল, "যেমন সালার বাড়িওলা, তেমনি স্লার বাড়িও জুটেছে।"

দরজা খুলিতেই সুমন্ত্র নাকে কাপড় দিল, পটোলকে অনুসরণ করিয়া অন্ধকারেই ভিতরে ঢুকিল বটে কিন্তু দুই পা গিয়াই আর অগ্রসর হইতে পারিল না। পটোল বলিল, "সাবধানে আসবেন মোসাই, সাপ খোপ কোথায় কি আচে স্লা, কে জানে? টচ্ আনেন নি? আপনি তো, মোসাই, আচ্ছা লোক? টচ্ না নিয়ে ভদ্দরলোকে বাড়ি দেখতে আসে?"

সুমন্ত্রর টর্চ না আনার জন্য অনুতাপ হইল বটে, কিন্তু দিনদুপুরে বাড়ি দেখিবার জন্য যদি কেহ টর্চ না আনে তবে সে ভদ্রলোকপদবাচ্য নহে, পটোলের এই উক্তিটি সে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। যাহা হউক অন্ধকার চোখে সহিয়া গেলে সুমন্ত্র কোনোরকমে পটোলের পিছন পিছন গোটাদুই ঘর পার হইযা একটু আলো দেখিতে পাইল। পটোল এতক্ষণ হাততালি দিতে দিতে অগ্রসর হইতেছিল। এইবার একটা নৈশ্চিন্ত্যের নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাসিল। বলিল, "কই মোসাই, একটা সিগ্রেট টিগ্রেট ধরান! ড্যাম্পো মেরে গেলুম যে স্লা! কখন থেকে গলাটা সুড়সুড় করছে মাইরি!"

সুমন্ত্র বলিল, "আমি তো সিগারেট খাই না।"

পটোল সন্দেহভরে বলিল, "দাঁত দেকি?"

সুমন্ত্র হাসিল। শুভ্র সুন্দর দন্তপংক্তি দেখিয়া পটোলের সন্দেহ গেল বটে, কিন্তু মনের অপ্রসন্নতা ঘুচিল না। বিরক্তিভরে বলিল, "স্লা আর-জম্মে দিয়ে এসেচেন কি, যে খাবেন?" অগত্যা পটোল নিজের পকেট হইতেই একটা আধপোড়া বিঁড়ি বাহির করিয়া ধরাইতে ধরাইতে স্বগতোক্তি করিল, "স্লা ভাড়াটেও কি জুটল তেমনি অগামারা? সিগ্রেট খায় না,—সে কি মানুস?"

বাড়িটি বহুকালের। ঘরগুলির মেঝে রাস্তার চেয়ে এক হাত নীচু। সারি সারি ছোটো ছোটো ঘর, তিনদিকে অন্য বাড়ির উঁচু পাঁচিল। বাড়িটির ঠিক মধ্যস্থলে দুই হাত চওড়া একটি উঠান, সেইখানেই নোংরা সবচেয়ে বেশি। উঠানের চারদিকে এক হাত করিয়া রক। ঠিক দুপুরের রৌদ্র তাহার ঔজ্জ্বল্য হারাইয়া কোনো-গতিকে সেই উঠানে এবং রকে পৌঁছিয়াছে। উঠানের এক পাশে দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি। কোনো ধাপের ইঁট নড়িতেছে, কোনো ধাপের দুই একখানা খসিয়াও গিয়াছে। সেই ভাঙা ভাঙা সিঁড়ি দিয়া আবর্জনার স্তূপ ডিঙাইয়া লাফাইতে লাফাইতে তাহারা দোতলায় উঠিল। চতুর্দিকে ছেঁড়া কাগজ, পচা ন্যাকড়া ও চট, ভাঙ্গা হাঁড়ি সরা, পশুপক্ষীর মল এবং বিবিধ বিভিন্ন জাতীয় আবর্জনা পচিতেছে, দুর্গন্ধে দম বন্ধ হইয়া আসে। বহুদিন নয়—বহু বৎসর যে সে বাড়িতে মানুষ বাস করে নাই তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল। সুমন্ত্র দমিয়া যাইতেছিল, বলিল, "এ যে ভূতের বাড়ি হয়ে আছে, মশাই?"

পটোল বলিল, "ভূতের বাঁড়িই তো! পাড়ায় খোঁজ না নিয়ে এসেছেন কি ক'রতে? অনেক দিন আগে এক স্লা ভাড়াটের পরিবার গলায় দড়ি দিয়ে মরেছেল যে ঐ ঘরে, সেই থেকে, মোসাই, এ বাড়িতে আর ভাড়াটে ঘেঁসে না।" তারপর নাক দিয়া খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া সুমন্ত্রকে আশ্বাস দিল, "আপনি ব্যাটা ছেলে, একা মানুষ, আপনার ভয় কি, মোসাই? আমরা সব এসে পাহারা দোবো, স্লা ভূতের বাবাও কিছু ক'রতে পারবে না।" এই বলিয়া দোতলার রাস্তার দিকের জানালাটা খুলিয়া দিল। খানিকটা দক্ষিণের বাতাস ঘরে ঢুকিতেই সুমন্ত্রের মনটা একটু প্রসন্ন হইয়া উঠিল, বলিল, "কাছাকাছি কোথাও রেডিও বাজে না তো?"

পটোল বলিল, "সিটি হ'বার জো নেই, মোসাই। আমাদের থিয়েটারের কেলাব আছে, রিহার্সেলের সময় রেডিয়ো বাজলে কাজের বড়ো ক্ষেতি হয়, তাই যখন খুসি হয় বাইরে গিয়ে স্নে আসি, পাড়ার মধ্যে স্লাকে ঢুকতে দিই না। একবার একজনরা এনেছেল, দু' দু'বার জানলা দিয়ে ঢিলিয়ে ফাঁক ক'রে দিতেই স্লারা আর বাজালে না।"

যাক, থিয়েটারের আখড়া, ব্যাণ্ডপার্টি যাহাই থাকুক সে চিন্তা সুমন্ত্রের নয়; ভদ্রেশ্বরের সর্ত—রেডিও না থাকিলেই হইল। সহসা ঘরটার চিড়খাওয়া

অবস্থার দিকে নজর পড়িতেই সুমন্ত্র বলিল, "দেওয়াল মেঝে সব যে ফেটে চৌচির হ'য়ে আছে। মেরামত করিয়ে দেবেন তো?"

পটোল বলিল, "তবেই হ'য়েছে! এ কোম্পানীর আমলের বাড়ি মোসাই, দু'সো বচর বয়েস হোলো, ফাটবে না? ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদা চাল মেরে ক'রে গেসলো সাতখানা বাড়ি, এখন আমরা সালারা মেরামত ক'রতে ম'রছি ফেটে। জানেন মোসাই, আমরা বোনেদি বড়ো লোক, আজকালকার কাপুড়ে-বাবু নই।" তারপর স্বর এক পর্দা নামাইয়া বলিল, "স্লা বাবা এক পয়সা খরচ ক'রবে না, সে আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন। আপনি বাড়িভাড়া কমিয়ে নিন মোসাই, যে টাকাটা বাঁচবে তাই দিয়ে মেরামত করিয়ে নেবেন। স্লা বাড়িওলাকে খাইয়ে আপনার কি লাভ?"

এতক্ষণে সুমন্ত্রর নজরে পড়িল, উপরের ছাদ হইতে চারি পাশে দেওয়ালের গায়ে লোহার হুক ও তার দিয়া আটকানো কয়েকটি লম্বা লম্বা কেরোসিন কাঠের বাক্স ঝুলিতেছে। তাহাতে সারি সারি পায়রার খোপ। একতলায় উঠানে এবং দোতলার ভিতরদিকের বারান্দার রেলিংয়ে গোটাকয়েক পায়রা বসিয়া আছে, তাহা ছাড়া আরও অনেকগুলি এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করিতেছে অথবা খোপে বসিয়া 'বক্ বকুম কুম' করিতেছে। বাড়ির দুর্গন্ধের কারণ এতক্ষণে বোঝা গেল। সুমন্ত্র বলিল, "মানুষ নেই বাড়িতে, এত পায়রা এল কি ক'রে?"



আ-তিতি, আ-তিতি—

পটোল দাঁত বাহির করিয়া বলিল, "ওসব আমার সকের পায়রা মোসাই। আমরা ছাতে ছাতে যাওয়া-আসা করি কিনা! স্লা নিজেদের বাড়ি নোংরা হয় ব'লে বাবা এ বাড়িতে রাকতে বলেচে। মজা দেখবেন? আ-তিতি, আ-তিতি?"

দেখিতে দেখিতে এক ঝাঁক পায়রা উড়িয়া আসিল, গোলা, মুক্কি, লোটন—নানাজাতীয় পায়রা, সুমন্ত্র তাহাদের নামও জানে না। দুইটা

পায়রা পটোলের দুই কাঁধে বসিল আর একটা আসিয়া সুমন্ত্রের মাথায় বসিয়া ডানা ঝাপটাইতে লাগিল। সুমন্ত্র সেটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিল, "এসব কিন্তু আমি রাখব না, আপনাকে সরাতে হবে।"

পটোল হঠাৎ যেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তারপর মুখ ভ্যাঙাইয়া বলিল,—"ইল্লি! প্রাণটা ঠাণ্ডা ক'রে দিলে মাইরি। ওরে আমার বাপের ঠাকুর রে,—অত সুকে আর কাজ নেই। এঃ, পায়রা সরাতে হবে? বাড়ি ভাড়া নিচ্ছেন ব'লে কি মাতা কিনে নিয়েছেন নাকি, মোসাই? বাবা বলে, কুকুর পুসবিনি, মা বলে, বেরাল পুসবিনি, দাদা বলে বিলিতি ইঁদুর পুসবিনি; এইবার সাতপুরুসের কুটুম ভাড়াটে এসে বল্লেন, পায়রা পুসবে না। উনি বাড়িভাড়া নেবেন ব'লে আমি সক ক'রতে পা'ব না! যান যান, মোসাই, এ বাড়ি ভাডা নেওয়া আপনার কম্মো নয়।"

সুমন্ত্র বলিল, "আপনার বাবাকে ব'লে দেখি তিনি কি বলেন।"

পটোল দগ্ধপ্রায় বিঁড়িটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তারপর আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে বলিল, "খবরদার বলচি, বাবাকে যদি এ নিয়ে একটি কথা বলবেন, তবে স্লা আপনার হাড়-এক-জায়গায় মাস-এক-জায়গায় ক'রে ছেড়ে দোবো ব'লে দিচ্চি। হ্যাঃ, বাবাকে বলবে, না আরো কিচু? বাবা তো ঐ চায়, দশটা টাকা পেলে স্লা গায়ের চামড়াখানা বেচে দিতে পারে। পাড়ার সব ছেলে আমার দলে ব'লে কিছু করতে পারে নি এতদিন,—সব্বাইকে ব'লে রেকেচি, ভূতের বাড়ি ব'লে ভাড়াটে এলেই ভাগাবি। তা' না হ'লে এ বাড়ি এতদিন প'ড়ে থাকে! এমনিতে কিছু হোলো না, তাই চুপি চুপি কাগজে লুটিস ঝেড়েছে। স্লা ভগোমানের বিচার নেই, মরেও না।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়াও যখন সুমন্ত্রের কোনো উত্তর পাইল না, তখন যুবক ডান দিকের কাঁধ হইতে একটা পায়রাকে নামাইয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে খানিকটা আত্মসংবরণ করিয়া লইল, তারপর হাসিয়া বলিল, "মোসাই, যা বলি সুনুন, ঘরের ছেলে মানে মানে ঘরে যান। বাবার সঙ্গে ন্যাকা-ট্যাকা ক'রবেন না। পায়রা যদি সরাতে হয় তাহ'লে আপনাকে এ বাড়িতে তেরাত্তির বাস করতে হবে না ব'লে দিচ্চি। স্লা মাথা ফাটিয়ে ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে ছেড়ে দেবো, হ্যাঁ! আমরা বাদুড়-বাগানের ছেলে।"

ভয় না পাইলেও সুমন্ত্র ভাবিয়া দেখিল ঐ অন্ধকূপের জন্য যুবকের মনে আঘাত দেওয়া তাহার কর্তব্য হইবে না।

সে বাড়িওয়ালাকে না জানাইয়াই চলিয়া আসিল।

সকালে যে কয়খানা বাড়ি দেখিয়াছিল, তাহার মধ্যে সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িটি ছিল সব চেয়ে ভালো। বড়রাস্তার উপর তিনতলা দক্ষিণ-খোলা নূতন বাড়ি, তিনটি ফ্ল্যাটে ভাগ করা। প্রত্যেক ফ্ল্যাটে পাঁচখানি ঘর। ইলেকট্রিক কনেকশন আছে, আলো হাওয়া প্রচুর। বাড়িওয়ালা থাকেন একতলায়, তেতলায় একজন এঞ্জিনীয়র সস্ত্রীক থাকেন। দোতলাটা খালি আছে, ভাড়া মাত্র চল্লিশ টাকা। সুমন্ত্রকে বাড়িওয়ালা খুব যত্ন করিয়া ফ্যানের হাওয়া এবং গরম চা ও টোস্ট খাওয়াইলেন, পাঁচ বৎসরের মেয়ে নীতার 'কাজরী নৃত্য' দেখাইলেন, কিন্তু তাহার বিবাহ হয় নাই শুনিয়া এবং তাহার বন্ধুর স্ত্রী সঙ্গে থাকিবেন না শুনিয়া বাঁকিয়া বসিলেন। সুমন্ত্র বলিল, "দেখুন, আমরা ভদ্রসন্তান, আপনার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।" ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, "ঘোর কলি পড়েছে মশায়, বিনা কারণেই কার্য হচ্ছে আজকাল। দেখুন, সত্যি কথা ব'লতে কি, আমার মেয়েরা বড় হচ্ছে, দু'জনের তো বিয়ের বয়েস পেরিয়েই গেছে বলতে গেলে সেকালের হিসেবে। আপনার মুখের সামনে বললে খোসামোদ হবে, তা হোক, আপনার চেহারাখানাও নেহাৎ নিন্দের নয়, মানুষও ভালো বলেই মনে হচ্ছে আপাততঃ। কিন্তু আপনি বৈদ্য, আমরা ব্রাহ্মণ। অবশ্য সন্ধ্যেও করি না, মুর্গীও খাই, মেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়তেও ছেড়ে দিয়েছি, তবু জাতটা খোয়াতে রাজি নই। সুতরাং"—

সুমন্ত্র অপ্রস্তুতভাবে বলিল,—"আচ্ছা, এ সব আপনি কি ব'লছেন?"

ভদ্রলোক বলিলেন, "সত্যি কথাই ব'লছি, রাগ করবেন না। আমি মেয়েদেরও ঐ কথা বলি, প্রেমে প'ড়বি পড়িস, পালটি ঘর দেখে পড়িস, বাপপিতাম'র জাতটা খোয়াস নি। তা' যথাসময়ে কি আর এই সব ওল্ড ফুলদের উপদেশ মনে থাকবে? তবু আমার সাবধান হওয়া কর্তব্য। আপনি অপরাধ নেবেন না, আপনার বন্ধুটি তো বললেন, কুণ্ডু; যজ্ঞকুণ্ডু কি নরককুণ্ডু তা'ও আপনি ভালো ক'রে জানেন না, তেরো বছর পরে দেখা হয়েছে ব'লছেন। যিনি পত্নী ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছেন, তাঁকে

আমি অন্তত শত হস্ত দূরে রাখলেই সুখী হ'ব।" তারপর একটু থামিয়া বলিলেন, "আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে সুখী হ'লুম। যদি আমার অফিসে মাঝে মাঝে আসেন তা হ'লে আরও সুখী হ'ব। আপনার কোনো লিগ্যাল অ্যাড্‌ভাইস যদি দরকার হয়—বিনামূল্যে পাবেন"—

সুমন্ত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ধন্যবাদ। ওটা প্রয়োজন হবে না। আমি নিজেও উকীল, তবে ওকালতিতে কিছু করতে পারলুম না ব'লে ছেড়ে দিয়েছি"—

ভদ্রলোক উঠিয়া বলিলেন, "আশা ছেড়ে দেবার বয়স আপনার হয় নি। আমি প্রথম মক্কেল পাই কবে জানেন, কোর্টে বেরোবার তিন বছর পরে। 'ফি' দিয়েছিল কি জানেন? একটা লাউ। তার ছেলেকে জেল থেকে বাঁচিয়ে ছিলাম—লাউচুরির কেসে। না, না, আপনার ছেড়ে দেওয়া উচিত হয় নি।'


আমি ইলোপ ক'রব বাবা

সুমন্ত্র বলিল, "ভেবে দেখলুম, ধর্ম আর অর্থ একসঙ্গে হবার নয় এপথে। তাই ছেড়ে দিয়েছি, উন্নতির আশা ছিল না ব'লে নয়।"

দুইজনেই দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। সুমন্ত্র বিদায়-নমস্কার করিতে ভদ্রলোক ক্ষুণ্ন হইয়া বলিলেন, "আপনি নিশ্চয় খুব দুঃখিত হয়েছেন, কিন্তু আমি নিরুপায়! এই দেখুন না, দু' মাস আগেই আমাদের পাড়াতে একটা কেস হ'য়ে গেছে। বিরাজবাবুর মেজমেয়েটি 'ইলোপ' করলে তাঁদের পাশের বাড়ির একটা মেসের ছোকরার সঙ্গে।

নীতা নাচ শেষ হইবার পর বাহিরের ঘরে বসিয়া খানিকক্ষণ এটা সেটা নাড়িতেছিল, তারপর কিছুক্ষণ তাহার পিতার কোলে উঠিয়া হাঁ করিয়া তাঁহাদের গল্প শুনিতেছিল। পিতার সঙ্গে সঙ্গে সেও সদর দরজায় আসিয়াছিল, সে সোৎসাহে কোঁকড়া চুলের গোছাশুদ্ধ মাথাটা

নাড়িয়া ঘোষণা করিল, "আমি ইলোপ ক'রব, বাবা!" তাহার পিতা হাসিয়া বলিলেন, "করবে বৈকি, মা, ক'রবে বৈকি। আর একটু বড়ো হও।"

সুমন্ত্র হাসিতে হাসিতে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

বাড়ি-খোঁজার উৎসাহে সেদিন দুপুরে ভাত জুটিল না, চার পয়সার আলুকাবলি এবং রাস্তার কলে একপেট জল খাইয়া গোয়াবাগান লেনের বাড়িটার সন্ধানে গিয়া সুমন্ত্র দেখিল সে বাড়ীব ভাড়াটে আসিয়া গিয়াছে, গরুর গাড়ি হইতে মাল নামিতেছে। সুমন্ত্র সেখানেই সন্ধান পাইল, কার্বালা ট্যাঙ্ক লেনে একটা মাঝারি-গোছ বাড়ি ভাড়া আছে। খোঁজ করিতে করিতে বাড়ি মিলিল। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বাহিরের খোলা দরজার চৌকাঠে উবু হইয়া বসিয়া পরিতৃপ্তিপূর্বক একটি পলতোলা কাঁচের গ্লাসে করিয়া চা খাইতেছিলেন, তাঁহার কোলে এক ঠোঙা লেড়ে-বিস্কুট। তিন ধাপ নীচে পথে দাঁড়াইয়া একটা রোঁয়া-ওঠা কুকুর সোৎসুক নেত্রে ল্যাজ নাড়িতেছিল। সুমন্ত্রর আগমনের উদ্দেশ্য শুনিয়া ভদ্রলোক বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। আর এক ঢোঁক চা খাইয়া আর একখানি বিস্কুট মুখে পুরিলেন এবং কুড়মুড় করিয়া চিবাইতে লাগিলেন। তারপর চায়ের গ্লাসটি এক ঢোঁকে শেষ করিয়া হাঁক দিলেন,—"ম-অ-অ!" ভিতর হইতে প্রশ্ন আসিল, "কেন রে?" ভদ্রলোক জলদগম্ভীরস্বরে হাঁকিলেন, "ভাড়াটে।" ভিতর হইতে আদেশ আসিল "ভেতরে পাঠিয়ে দে।" ভদ্রলোক এক ইঞ্চি সরিয়া বসিলেন, "যান"। সুমন্ত্র তাঁহার ঘাড়ের উপর দিয়া কোনোরূপে লং-জাম্প করিয়া দরজা পার হইয়া ভিতরে গেল।

বাড়িটা দুই-মহলা। মাঝে একটা প্রকাণ্ড উঠান, সেইখানে কল চৌবাচ্চা। পাশেই একটা গরু বাঁধা আছে। গৃহিনীর বয়স ষাটের কম হইবে না, তবে গড়ন আঁটসাট, ঠেঁটি পরিয়া বিধবা কলতলায় বসিয়া একরাশ বাসন মাজিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে হাত তিনেক দূরে একটি বধূ চোখ পর্যন্ত ঘোমটা টানিয়া একটা বড় গামলায় করিয়া চাল ধুইতেছিল, তাহার পাশেই একটি বারো তেরো বছরের মেয়ে জল লইবার জন্য বালতি লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গৃহিণী বাঁ হাতের পিছন দিক দিয়া মাথার কাপড় আধ

ইঞ্চি টানিয়া দিলেন। বলিলেন, "এদিকে এস, বাছা। এই আমাদের বাড়ি; কি দেখবে দ্যাখো। সামনের দিকে ওপরে নীচে দু'খানা করে চারখানা ঘর ভাড়া দে'ব। এমন দক্ষিণ-খোলা খাসা বাড়ি এপাড়ায় আর একটি পাবে না। ভাড়াটি কিন্তু মাসের পয়লা আগাম চাই বাপু, আগের ভাড়াটে দু' মাসের ভাড়া বাকি ফেলে পালিয়েছে।"

সুমন্ত্র বলিল, "সে জন্যে ভাববেন না, বাড়ি পছন্দ হয় তো ছ' মাসের ভাড়া আগাম দে'ব। কিন্তু কল পায়খানা, আলাদা পাব তো?"

গৃহিণী বলিলেন, "আলাদা আর কোথা পা'ব বাছা, ঘরের ছেলের মতো থাকো তো আমাদের কল পাইখানাই দরকার মতো পাবে।"

সুমন্ত্র বলিল, "কিন্তু একটা বাথরুম তো চাই,—মানে,—মানে স্নানের ঘর একটা।"

গৃহিনী বলিলেন, "ও-ও, বৌ বুঝি সাবান মাখবে? তা' এইখানে ব'সেই না হয় মাখলে? কেউ নজর দেবে না। আমরাই না হয় সেকেলে লোক, তা' ব'লে কি আমাদের বাড়িতেই সখ-সৌখিনতা নেই? আমাদের এই বৌমাকেই জিজ্ঞেস করো না, গেল বছরে দু'দু'খানা সাবান কিনে দিয়েছি কি না? কি নাম গা বৌমা, 'মেচেতা' না, কি?"

বধূ মৃদুস্বরে বলিল, "অজন্তা"।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ হোলো। তবেই দ্যাখো, আমরাও ওসব জানি। তা' তোমার বৌ বুঝি স্বাধীন-জেনানা? যাই বলো, আমার পষ্টো কথা বাছা, আজ-কালকার মেয়েগুলো দিন দিন বড় বেহায়া হচ্ছে। ঐ বাথরুমে যে কি কম্মো ক'রতে ঢোকেন, সে তো আমার জানতে বাকি নেই। আমাদের মাথা কেটে ফেললেও কিন্তু ওসব অসভ্যতা আমাদের দ্বারা হবে না!"

সুমন্ত্র কথা বদলাইবার জন্য বলিল, "আচ্ছা ভেবে দেখি। আমরা কিন্তু উপস্থিত কেবল পুরুষমানুষ থাকব। আমার এক বন্ধু নিয়মিত থাকবেন, আমি মাঝে মাঝে যাব আসব।"

গৃহিণী বলিলেন, "কেন, তোমার বৌ বাথরুম না হ'লে আসবে না? মেয়েমানুষের এত কি জেদ? সোমত্ত বয়সে,—বাপের বাড়িতে ফেলে রাখা কি ভালো হ'বে?"

সুমন্ত্র মাথা নীচু করিয়া বলিল, "আমার এখনো বিয়েই হয় নি।"

গৃহিণী শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, "কেন বাছা, কুলে কোনো দোষটোষ

আছে না কি ? একলা পুরুষমানুষ, বাপ-মা এই বয়েস পর্যন্ত ছেড়ে রেখে দিয়েছে যে বড়ো ?"

সুমন্ত্র বলিল, "বাবা, মা, দু'জনেই অনেকদিন হ'ল মারা গেছেন।"

গৃহিণী নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন, "ওঃ, তাই। আমি বলি বুঝি বা'র-টান টান কিছু আছে। তা' বেশ তো, এখানে এসো, আমিই একটা ব্যবস্থা ক'রে দেব যা-হয়। কি নাম বললে ? সুমন্ত্র সেন ? বদ্যি, না কায়েত ? বদ্যি ? বেশ হয়েছে। পুঁটি যাতো, ওবাড়ি থেকে তোর বদ্যি-মাসিমাকে ডেকে আন তো ? আহা, বৌটা কেঁদে কেঁদে মরে, তিন বচ্ছর ধ'রে মেয়েটার একটা ভালো পাত্তর জুটল না। ত্যাখো দিকি, এমন সোনার চাঁদ ছেলে,—এ কি পড়তে পায় ? কেবল মাথার ওপর দাঁড়িয়ে কেউ কাজটা করিয়ে দেবার নেই বলেই না ? তা' বাছা, আমি আছি, তোমার কোনো ভয় নেই।"

সুমন্ত্র কিন্তু মোটেই আশ্বস্ত হইল না, বরং এক কথা দুই কথার পর জরুরী কাজের ছুতা করিয়া পলায়ন করিল। দরজায় উপবিষ্ট ভদ্রলোক দুই ইঞ্চি সরিয়া বসিয়া রাস্তা দিলেন, কোনো প্রশ্ন করিলেন না।

বৈকালে হেদুয়ার মোড়ে সুমন্ত্র সন্ধান পাইল গুলুওস্তাগর লেনে একটা বাড়ি ভাড়া আছে। সদর দরজা খোলাই ছিল। সুমন্ত্র চৌকাঠে দাঁড়াইয়া 'বেয়ারা' বলিয়া হাঁক দিতেই পাশের ঘর হইতে বাড়িওয়ালা বলিলেন, "এটা সাহেব-বাড়ি নয়, মশায়, বেয়ারা ফেয়ারা নেই আমার। আসুন, এই ঘরে। বসুন।"

সুমন্ত্র নমস্কার করিয়া চেয়ারে বসিল, তিনি ঘরের অপর প্রান্তে একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া চুরুট টানিতে টানিতে মিনিটখানেক তাহার আপাদমস্তক তীব্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেন। পরে বলিলেন, "মশায়ের নাম ?"

"শ্রীসুমন্ত্র সেন।"

"আমার নাম অঘোর চক্রবর্তী।"

আবার মিনিট দুই কাটিল, অঘোর চক্রবর্তী হতাশভাবে চেয়ারে হেলান দিয়া শুইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "ব্রাহ্মণ দেখে মাথা নীচু করার প্রথা আজকাল উঠে গেছে, না ? হ্যাঁ, আপনার নিবাস ?"

"নিবাস বর্ধমান, উপস্থিত আসছি পটোলডাঙা থেকে ?"

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হুঁ, গ্রামে কি কীর্তি ক'রে এসেছেন ?"

সুমন্ত্র কথাটা বুঝিতে পারিল না, শঙ্কিতভাবে বলিল, "আজ্ঞে ?"

"বলি, পুলিশ নেই তো পেছনে? কারো বাক্স ভেঙে বা মেরে চুরি ক'রে আসেন নি তো?"

সুমন্ত্র বিরক্ত হইয়া বলিল, "আপনি কি বলছেন?"

"ব'লছি কি তা' আপনি বেশ বুঝতে পারছেন। আজ বর্ধমান, কাল পটোলডাঙা, পরশু গুলুওস্তাগর লেন—কতদিন অ্যাবস্কণ্ড ক'রে আছেন?" পরে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, "পুলিশের কাজ করে চুল পাকালুম, পেনসনই পাচ্ছি সাত বছর। জানতে কোনো মিয়াকেই আমার বাকী নেই। আমার বাড়িতে দু'জাতের ভাড়াটে আসে মশায়, এক ম্যাদামারা গোবেচারা, আর এক দাগী বদমাইস। এই বছর-তুই হ'ল এক ব্যাটা স্বদেশী খুনে এসে আমার বাড়িতে উঠেছিল। আপনারই মতন খদ্দরের জামা, দিব্যি ভালোমানুষের মতো চেহারা। ব্যাটার একবার আস্পর্ধাটা বুঝুন। আমি শালা অঘোর চক্রবর্তী, নিজের ছেলে স্বদেশীতে নুন ক'রতে গেছ'ল ব'লে তাকে জেলে দেবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে চিঠি দিয়েছি, আমার নাকের ওপর সে শালা ডাকাত দেড়টি বচ্ছর বাস করে গেল! আরে মশাই, শেষে পেনসন নিয়ে টানাটানি! কমিশনার সায়েব চটেই লাল, ডেকে পাঠিয়ে বলে, 'তুমি জেনে শুনে স্বদেশী ডাকাত পুষেছ?' ওঃ, কি ফ্যাসাদেই পড়েছিলুম! সায়েবের পায়ে ধ'রে কোনো-রকমে সে যাত্রাটা উদ্ধার পেয়েছি। তারপর থেকে ছ'-মাস আর বাড়ি ভাড়ার নামটি উচ্চারণ করিনি। এদিকে উপরি-আয়ও নেই, অথচ চালটি গেছে বেড়ে, পেনসনের টাকায় তো সংসার চলে না, অগত্যা বাড়ি ভাড়া দিতেই হচ্ছে। তবে আর ওপথে যাচ্ছি না, মান্যগণ্য গভর্ণমেণ্ট অফিসার কারো রেকমেণ্ডেশন যদি আনতে পারেন, তবেই বাড়ি দেখাব।"



দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে

সুমন্ত্র উঠিতেছিল, ভদ্রলোক বলিলেন, "উঠছেন কেন মশাই, একটু বসুন না। পায়ে বাত, বেশী হাঁটতেও পারি না আবার একা ব'সে ব'সে সময়ও কাটে না। চিরদিন পাঁচজনকে নিয়ে কাটানো অভ্যেস কিনা? থানায় যখন ঢুকতুম দুধারে পঁচিশটা সেলাম পড়ত। এখন তো বেঁচে ম'রে আছি মশাই, সেলাম দেবারও কেউ নেই, নেবারও কেউ নেই! পেনসেন আনতে গিয়ে তবু দু'মাসে ছ'মাসে বড়ো বড়ো সাহেব-সুবোকে সেলাম করে প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ত, এখন একদম পঙ্গু। ঐ আরসীতে নিজেকেই নিজে সেলাম করি মাঝে মাঝে। তা' মশায়, দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে?" সুমন্ত্র আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া স্থান ত্যাগ করিল।

পরদিন শিয়ালদহ হইতে বৌবাজার ঘুরিয়া চলিয়াছিল সুমন্ত্র। আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে ল্যাম্প পোস্টের গায়ে আঁটা একটা কাগজে একটি হাতে লেখা বিজ্ঞাপন চোখে পড়িল। যুগোলকিশোর দাস লেনে দক্ষিণ খোলা একটা বাড়ি পঁয়ত্রিশ টাকায় ভাড়া আছে। নম্বর খুঁজিয়া বাড়িটার দরজায় পৌঁছিতেই সুমন্ত্র নারীকণ্ঠের আর্ত-চীৎকার শুনিতে পাইল, "মেরে ফেললে, মেরে ফেললে! ওগো কে আছ? বাঁচাও, বাঁচাও।" মুহূর্তকাল সুমন্ত্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ভদ্রতাজ্ঞান বলিল, অপরের বাড়ির মধ্যে পারিবারিক কলহের ব্যাপারে তাহার হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। পরক্ষণেই আবাব চীৎকার উঠিল, "খুন করলে, খুন ক'রলে। ওরে দেশে কি মানুষ নেই?" সুমন্ত্রর পক্ষে ইহার পব আর ধৈর্য ধারণ করা অসম্ভব হইল। সে প্রথমে জোরে জোরে কড়া নাড়িল, চীৎকার করিয়া কয়েকবার বাড়িওয়ালাকে ডাকিল, তাহার পর দুমদাম করিয়া দরজায় লাথি মারিতে আরম্ভ করিল। দরজা ভাঙিল না, কিন্তু লাথির ফল ফলিল। একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক একটা লাঠি হাতে করিয়া হাঁফাইতে হাঁপাইতে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। বলিলেন, "কি মনে করেছেন বলুন তো? দিনদুপুরে দরজা ভেঙে ডাকাতি ক'রতে এসেছেন?"

সুমন্ত্র কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সংযত করিয়া বলিল, "এসেছিলুম বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন দেখে, কিন্তু—"

ভদ্রলোক লাঠিটা দরজার পাশে রাখিয়া বলিলেন, "ওঃ, বাড়ি, দেখবেন? দাঁড়ান, চাবি নিয়ে আসি। এই পাশেই বাড়ি, দুটো দরজা পরেই"—

সুমন্ত্র বলিল—"কিন্তু উপস্থিত আমি আপনার বাড়ির ভেতরে যেতে চাই।" শব্দ থামিয়া গিয়াছিল, ভদ্রলোক বলিলেন, "ওঃ, শিভ্যালরি? আপনি বুঝি নারীরক্ষা সমিতির মেম্বার? যদি না যেতে দিই?"

সুমন্ত্র কঠোরকণ্ঠে বলিল, "আমি যাবোই, শক্তি থাকে তো আটকান। পুলিস ডাকতে পারেন ইচ্ছে করলে।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "আসুন তবে। আপনি বোধ হয় এ পাড়ায় থাকেন না।"

বৈঠকখানার পিছনেই ভিতর দিকে একটা লম্বা বারান্দা, তাহার পর উঠান। বারান্দায় একসারি খিলান-করা থাম, তাহারই একটির সহিত একটা লম্বা শিকল দিয়া বাঁধা একজন মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক। ভদ্রমহিলার দুই পায়ে বেড়ি, মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, পরনের কাপড়খানি ধূলিধূসরিত, কিন্তু রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। ভদ্রমহিলার মুখখানি বড়ো করুণ, তাঁহার অশ্রুসিক্ত চোখ দুটির দিকে চাহিয়া সুমন্ত্রর রক্ত গরম হইয়া উঠিল। এই বিংশ শতাব্দীতে কলিকাতা শহরের বুকের উপর বসিয়া কোনো পুরুষ যে স্ত্রীলোকের উপর এইরূপ অত্যাচার করিতে পারে তাহা সে কোনোদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই, এদৃশ্য যে কোনোদিন চোখে দেখিতে হইবে তাহা সে কখনও ভাবে নাই। রমণী তাঁহাকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এসেছেন? আমি জানি এদের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে। পুলিশ সঙ্গে এনেছেন? না, না, পুলিশ কিছু ক'রবে না, ষড় আছে। ঐ যে—ঐ উনি"—বলিতে বলিতে তাঁহার বড়ো বড়ো চোখ দুইটিতে রুদ্ধরোষের একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, "উনি আমার ছেলেকে বিষ দিয়ে মেরেছেন, স্বামীকে জেলে দিয়েছেন, বাপকে পথের ভিখিরি করেছেন, তাতেও সাধ মেটেনি ওঁদের। আমাকে কুকুরের মতো বেঁধে রেখে দিয়েছেন, না মরলে আর নিষ্কৃতি নেই আমার।" তারপর সহসা নিজের বাহু দুইটি হইতে কাপড় সরাইয়া বলিলেন, "আমাকে কি রকম মেরেছে দেখছেন? রোজ মারে, সকাল বিকেল মারে। আমি আর পারি না। এত ক'রে বলি, আমায় একবারটি ছেড়ে দাও, আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না, গঙ্গায় ডুবে সকল জ্বালা জুড়োব,—তাও দেবে না। আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন তো?"

সুমন্ত্র গৃহস্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি কি মানুষ?"

"না, পশু। আপনি দিনকতক এসে বাস করুন না আমাদের সঙ্গে।"

সুমন্ত্র বলিল, "আপনার একটু দয়া হয় না ?"

রমণী ব্যঙ্গ হাসিয়া বলিলেন, "হুঃ, দয়া হবে ? পাষাণ, পাষাণ।" পরক্ষণেই উঠানে নামিয়া এককোণ হইতে একটা ঝাঁটা তুলিয়া লইয়া নিজের বাঁ হাতে, পায়ে, সর্বাঙ্গে সপাসপ করিয়া মারিতে মারিতে বলিলেন, "এই রকম ক'রে মারে। আপনি আমাকে মারবেন না তো ?" সুমন্ত্র বলিল, "না মারব না।" কিন্তু তাহার মনে এই প্রথম কেমন একটা সন্দেহ হইল যে, হয়তো রমণীর গায়ের কাল্‌সিটাগুলো তাঁহার স্বকৃত আঘাতেরই ফল।

ঠিক সেই সময়ে একটি পনেরো ষোলো বছরের মেয়ে উঠানের ওপাশের রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহার এক হাতে একটা রেকাবিতে খানকয়েক লুচি ও একটু তরকারী, আর এক হাতে একটি জলের গ্লাস। বারান্দার একপ্রান্তে রেকাব ও গ্লাস নামাইয়া সে দ্রুতপদে আসিয়া রমণীর হাত হইতে ঝাঁটাটা কাড়িয়া লইল, ভৎর্সনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা বাবা, তোমরা দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছ ? কেড়ে নিতে পারোনি ?" তারপর সহসা সুমন্ত্রর দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি কে ? কি করছেন এখানে ?" রমণী বাধা দিয়া বলিলেন, "তার খবরে তোর দরকার কি লা ? উনি আমার নাচ দেখতে এসেছেন।" পরক্ষণে সুমন্ত্রর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি খুব সুন্দর নাচতে পারি। দেখবে তুমি ? দাঁড়াও দেখাচ্ছি।" বলিতে বলিতে বারান্দার কোণ হইতে তিনি একটি বড়ো কেরোসিন-কাঠের বাক্স টানিয়া আনিলেন। সেই বাক্স হইতে একটি বিচিত্র বস্তু বাহির হইল। একটি লম্বা দড়িতে কতকগুলো ভাঙা পুরাতন লণ্ঠন ও ছেঁড়া জুতা বাঁধা ছিল, ভদ্রমহিলা সেই দড়িটি কোমরে বাঁধিয়া বলিলেন, "পায়ের মলগুলো বড্ড ভারী, এ প'রে আমি নাচতে পারি না ভালো।" বলিতে বলিতে দুই পায়ের বেড়িতে বেড়িতে ঠুকিয়া "দেখে যা, নাচ দেখে যা" বলিয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে শরীর বাঁকাইয়া লণ্ঠন ও জুতাগুলি দোলাইয়া নাচিতে লাগিলেন। সুমন্ত্র চোখ নামাইল, পরক্ষণেই ভদ্রমহিলা লাফ দিয়া উঠানে আছাড় খাইয়া পড়িলেন এবং আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "মেরে ফেললে, খুন করলে। বাঁচাও ! বাঁচাও !" ভদ্রলোক বলিলেন, "সারাদিন সারারাত এই চলছে। কচি ছেলেটি নয়, বাইশ বছরের একমাত্র ছেলে একদিনের মধ্যে মারা গেছে কলেরা হ'য়ে।" মেয়েটি ততক্ষণে গিয়া তাহার মায়ের মাথা নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়াছিল এবং ঘটি হইতে জল লইয়া তাঁহার চোখে মুখে ছিটা দিতে দিতে পাখার বাতাস

করিতেছিল, সে সেখান হইতে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "ওঁকে যেতে বলো বাবা।"

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, আমার বাড়ি ভাড়া নিতে হলে স্ট্রং নার্ভের দরকার, আপনি টিঁকতে পারবেন না। আচ্ছা, তাহ'লে"—তিনি পিছন ফিরিয়া সদর দরজার দিকে চলিলেন। সুমন্ত্র তাহার পিছন পিছন চলিতে চলিতে বলিল, "না বুঝে কটু কথা বলেছি, অপরাধ নেবেন না। কিন্তু রাঁচিতে পাঠান না কেন?"

"আমিও ভাবি মাঝে মাঝে। কিন্তু ওকে পাঠিয়ে দিলে বাঁচব কি নিয়ে? তা' ছাড়া সেখানে ও কি ঐ মেয়ের যত্ন পাবে? দেখি আর কিছুদিন। চিকিৎসা তো অনেকরকমই হ'ল"—

সেদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সন্ধান চলিল। কোথাও বাড়িতে ঢুকিতেই শুনিল, "নমস্কার। অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো, ক'লকাতা কেন্দ্র থেকে বলছি"—ইত্যাদি। সুমন্ত্র বিনা বাক্যব্যয়ে সরিয়া পড়িল। কোথাও ঢুকিয়াই দেখিল দশ বারোজন জুটিয়া তবলা পিটিতেছে অথবা হেঁড়ে গলায় হুঙ্কার ছাড়িতেছে, "পাষাণী, আমি তব ধাইব পশ্চাতে"—ইত্যাদি। সেও সুবিধা মনে হইল না। শেষে পাকাবাড়ি ছাড়িয়া সুমন্ত্র দু'একটা খোলার ঘরও দেখিল। কোথাও হৈ হৈ করিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া হিন্দুস্থানীর দল হোলির গান ধরিয়াছে, কোথাও উড়িয়া কালোয়াত হারমোনিয়ম বাজাইয়া 'রসবতী যাউচি' বলিয়া পাশের ঘরে বেসুরা চীৎকার করিতেছে, কোথাও কলের জল কে আগে লইবে তাই লইয়া বাড়ির সামনে জলের কলে ক্ষ্যান্ত, নেত্য, পদী, খেঁদী, পটলি, গেঁড়ি প্রভৃতির মধ্যে ঝুটোপুটি ঝগড়া এবং অশ্লীল গালিগালাজের আদান-প্রদান চলিতেছে। খোলার ঘরেও কাব্য নাটক চর্চার ঢেউ পৌছিয়াছে, সেখানে একটি ঘরে কয়েকটি যুবক ঠিক-দুপুর বেলা যুগপৎ নৃত্যগীত আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের বক্তব্য "যবুনায় তুফান দেকে ভয় পেযো না বেরজাঙ্গনা।"

'দুত্তোর' বলিয়া সুমন্ত্র চলিয়া আসিল।

চারটা বাজিয়া গিয়াছে, শরীর আর চলে না। একটু বিশ্রাম না লইলেই নয়। দুত্তোর বাড়ীভাড়ার নিকুচি করিয়াছে। আজ এই পর্যন্ত, আর না। এইবার বাড়ি গিয়া স্নান করিয়া লম্বা এক ঘুম দিতে হইবে।

বিশ্রামসুখের কল্পনায় সুমন্ত্রের মনটা একটু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, ডাউন ট্রামে বসিবার স্থান পাইয়া মাথার ঝিমঝিমানি এবং পায়ের কনকনানিও একটু কমিল। কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিয়া শরীরটা একটু সুস্থ বোধ হইল সুমন্ত্রের, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্পও বদলাইয়া গেল তাহার। কি হইবে বাড়ী ফিরিয়া এখনই। প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিংএর ধারে সাজানো পুরাতন বইগুলি ডাক দিল তাহাকে, শ্রেণীবদ্ধ বইএ চোখ রাখিয়া এক পা দুই পা করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে কলেজ গেটের কাছাকাছি গিয়া পড়িল সে। একসময়ে এইখানে এবং হিন্দু স্কুলের মোড়ে রাস্তার ওদিকের ফুটপাতের ধারে ও সিঁড়িতে বিছানো পুরাতন বইএর নিয়মিত ক্রেতা ছিল সুমন্ত্র, আজকাল না কিনিলেও অভ্যাসবশে মাঝে মাঝে দেখিয়া যায়। পাঁচখানা বই নাড়িয়া চাড়িয়া সুখ পায়, ন'মাসে ছ'মাসে খুব অল্পমূল্যে পাইলে কদাচ কখনও এক আধখানা কেনে। সেদিন সৌভাগ্যক্রমে এ-ইর (জর্জ রাসেল) কবিতা সংগ্রহ একখানি দুই টাকায় পাইয়া লোভ সংবরণ করিতে পারিল না সুমন্ত্র, কিনিয়া ফেলিল। পকেটে নিজের চার টাকা কয়েক আনা সম্বল, তাহার মধ্য হইতে দুই টাকা খরচ করাটা দুঃসাহসের কাজ হইয়া গেল। যাক আর দুইদিন খাটিয়া ভদ্রেশ্বরের বাড়ির একটা বিহিত সে করিতে পারিবে এবং সে জন্য একশত টাকা পাইবে এ ভরসা তাহার ছিল। অন্যমনস্কভাবে মোড়ের দোকানগুলি দেখিয়া সে অভ্যাসবশে শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটে ঢুকিয়া পড়িল। পথে চলিতে চলিতে সে সদ্যক্রীত বইখানির পাতা উল্টাইতেছিল এমন সময় তাহার ডানদিকের একটা দোকান হইতে ডাক আসিল, "একটু দাঁড়িয়ে যান বড়োবাবু"! সুমন্ত্র দাঁড়াইল। এটাও একটা পুরাতন বইএর দোকান, তবে একটু সম্ভ্রান্তগোছের, অনেক দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য বই এখানে পাওয়া যায়, অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির সমাগম হয় এখানে। দোকানদার সবিনয়ে হাত-জোড় করিয়া বলিল, "সামনে দিয়ে আসেন যান, অনেকদিন পায়ের ধুলো দেননি গরীবের ঘরে। আপনার জন্য একটা ভালো জিনিস রেখেছিলুম, দেখে যান একবার দয়া ক'রে।"

সুমন্ত্র বলিল, "টাকা নেই ইউসুফ।"

"আহা, দেখুনই না, টাকা না হয় পরে দেবেন। আপনি বহুদিন

আগে চেয়েছিলেন একবার, তখন যোগাড় করতে পারিনি। হঠাৎ এক জমিদার বাড়ীর লাইব্রেরী নিলাম হওয়ায় পেয়ে গেছি। এ সুযোগ বরাবর পাবেন না বড়োবাবু।"

"ভনিতা তো অনেক শুনলুম, বইখানার নাম কি? দাম কত?"

"গ্রিফিথের 'অজন্তা'। আপনার সঙ্গে দরদস্তুর করব না, আট শ'ই দেবেন।"

"অজন্তা! আটশ'? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে ইউসুফ। আমাকে বেচলেও হবে না।"

দোকানদার বলিল, "ছ'সাত বছর আগে আপনি কিন্তু হাজার টাকা দিতে রাজি আছেন বলেছিলেন।"

"তখন বাপের পয়সা ছিল ইউসুফ, এখন নিজের রোজগারের পয়সায় কি আর ওসব চলে? তা ছাড়া যে হাতী কিনবে সে চলে গেছে।'

"তার মানে?"

"মানে সে মেজাজ নেই, সে প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এক মাতাল পথের মধ্যে রাজার হাতী দেখে প্রশ্ন করেছিল, দাম কত? পরের দিন নেশা ছুটে যাবার পর আবার সেই হাতীর সঙ্গে পথে দেখা। মাহুত ঠাট্টা ক'রে জিজ্ঞেস করলে, "হাতী কিনবে না?' সে বললে, যে কিনবে সে চলে গেছে। আমাকে মিথ্যে লোভ দেখিও না, ইউসুফ, বইখানা দেখলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।"

দোকানদার বলিল, "আমি কতদিন ধরে আপনার পথ চেয়ে আছি বাবু। এ বই নেবার লোক তো বেশী নেই। দেখবেন যদি কেউ চেনাশোনার মধ্যে নেয়, অনেকগুলো টাকা আটকে গেছে।"

"দেখব নিশ্চয়, দুর্মূল্য বই, দুষ্প্রাপ্য বই! কতদিন ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরীতে গেছি, ও থেকে ছবি কপি করবার জন্য। আচ্ছা, চলি। হ্যাঁ, আমাকে তুমি যে সব বই বেচেছ তার দু'একখানা নিতে পার? ধরো 'চালুক্যান আর্কিটেক্চার', তুমি আমায় ষাট টাকায় দিয়েছিলে, আমি যদি তিরিশে দিই?"

"কি যে বলেন বড়বাবু? আপনি বই বেচবেন?" তারপরে কণ্ঠস্বর নামাইয়া সমবেদনার স্বরে বলিল "সত্যি এই অবস্থা? কিসে গেল? শেয়ার মার্কেটে?"

"মানুষের বাজারে গেছে ভাই। সে অনেক ব্যাপার।"

ইউসুফ বুঝিল। বলিল, "মেয়েমানুষ বড়ো পাজি জিনিস বাবু, কোথায় লাগে মদের নেশা। তাইতো, একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে গেছে আপনাকে? দেখুন দিকি একদিন পান খেলেন না, সিগারেট খেলেন না! আহা।" চুক করিয়া সহানুভূতিব্যঞ্জক একটা শব্দ করিয়া পিছন ফিরিয়া আবার অপ্রতিভভাবে বলিল, "ইস্।" একটি সুশ্রী দীর্ঘাঙ্গী শ্যামবর্ণা তরুণী ঠিক দোকানদারের পিছনে দাঁড়াইয়া একটা বই দেখিতেছিলেন। নিরাভরণ হাতে একখানি মাত্র খাতা, কলেজের ছাত্রী বলিয়া মনে হয়। মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ। দোকানদারের সহকর্মীর সঙ্গে দরে পোষায় নাই বোধ হয় তাই মালিককে ধরিয়া বসিল, "এখানা দশ টাকায় হবে না?"

ইউসুফ মিয়া ততক্ষণে সামলাইয়া লইয়াছে। হাসিয়া বলিল, "পাগল হয়েছেন দিদিমণি? কত বলেছিস রে? কুড়ি? কম বলে ফেলেছিস? ফলকেনবর্গের 'হিষ্ট্রি অফ ফিলজফি' আউট অফ প্রিণ্ট বই দিদিমণি।"

"কিন্তু দশ টাকার বেশী নেই আমার কাছে। আর আসল দামের চেয়ে কমে যদি না হবে তবে আপনার কাছে এলুম কেন?"

"সাধ করে কি এসেছেন? নতুন দোকানে পাবেন না ব'লেই এসেছেন। যান, আপনার কথাও থাক, আমার কথাও থাক, আঠারো টাকাই দিন।"

"তাহ'লে হ'ল না। সত্যিই আমার কাছে দশ টাকার বেশী নেই।" তরুণী বাহির হইয়া যায় দেখিয়া সুমন্ত্র বলিল, "আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো আমি আপনাকে পড়তে দিতে পারি বইখানা। আমার বাড়ী এইখানে কাছেই, এই পটলডাঙ্গা স্ট্রীটে।"

তরুণী বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "আপনি আমাকে চেনেন না, জানেন না, বই দেবেন?"

সুমন্ত্র বলিল, "আপনার প্রয়োজনটাকে তো চিনি। সেই সঙ্গে নিজে গরীব ব'লে দারিদ্র্যটাকেও চিনি।"

তরুণীর মুখ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইল। বলিল, "যদি ফেরৎ না দিই?"

"বুঝব সৎকার্যে লেগেছে। আমার বাবা পড়তেন, আমি পড়ি না।

কেউ পড়লে সার্থক হবে। তবে মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আপনার মুখ বলছে আপনি আমাকে ঠকাতে পারেন না।

তরুণী এবার হাসিল। বলিল, "শিক্ষিত মানুষের ভাষা যেমন তার মনোভাব গোপন করবার জন্যে তার মুখ তার মনের দর্পণ নয়, প্রতারণাময় মুখোস। তাছাড়া এইমাত্র, অপরাধ নেবেন না, আমার শোনবার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও আপনাদের দু'একটা কথা আমার কানে এসেছে,—এইমাত্র আপনার যে পরিচয় পেলুম তা'তে মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার খুব ভালো ধারণা হবার কথা নয়। আপনার সম্বন্ধেও কোনো "ভদ্রমহিলার ভালো ধারণা না হবারই কথা"। সুমন্ত্র তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া পাদপূরণ করিল। "কিন্তু আপনার গোড়ায় গলদ হয়ে গেছে। আমি একটু কবিত্ব করতে গেছলুম, ইউসুফ মিয়ার সেটা মাথায় ঢোকেনি। বাপের পয়সা কিসে ওড়ালুম উনি প্রশ্ন করেছিলেন, আমি বলেছিলুম মানুষের বাজারে! বলতে চেয়েছিলুম, গ্রামের লোকের, দেশের মানুষের সেবার কার্জে, উনি বুঝেছেন কোনো স্ত্রীলোকের জন্য বদ্ খেয়ালিতে। তা আপনার যদি সেজন্যে কোনো সঙ্কোচ থাকে তবে আমাকে সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট দেবার লোক এই পাড়াতেই অনেক মিলবে। সম্পাদক অধীরবাবুর কাগজে আমি অনেকদিন থেকে লিখে আসছি।" মেয়েটি উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, বলিল, "না,না, সার্টিফিকেটের দরকার হবে না। আপনার নাম?"

"সুমন্ত্র সেন?"

"কবি সুমন্ত্র সেন? আপনার লেখা অনেক পড়েছি যে! সেদিনই আপনার লেখা নিয়ে আমার একটি বান্ধবীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল, সেও আপনার লেখার খুব ভক্ত। সুদেষ্ণার নাম শুনেছেন নিশ্চয়, খুব ভালো গান গায়। এবার মিউজিক কনফারেন্সে"—

অপরিচিতা ভদ্রমহিলার গুণের ফিরিস্তি শুনিতে সুমন্ত্রর ইচ্ছা ছিল না, আত্মপ্রশংসা মেয়েদের মুখে শুনিতে ভালো লাগিলেও কর্তব্যবোধে বাধিল। সুমন্ত্র বলিল, "আমি অনেকদিন কলকাতা ছাড়া, কোনো কিছুরই খবর রাখিনা। যাক আপনার প্রয়োজন থাকে তো আমার সঙ্গে আসতে পারেন। আচ্ছা, ইউসুফ, চলি ভাই।"

ইউসুফ অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, "অপরাধ নেবেন না, বড়ো-

বাবু। আপনার কথাটা আমি ঠিক ধরতে পারি নি। তাই বলে আমার বাজার মাটি করবেন না বাবু। আপনার ঘরে বইয়ের পর্বত বিনাপয়সায় দান-ছত্তর করলে আমি ডুবে যাব।"

দুইজনে ততক্ষণে দোকান হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। হ্যারিসন রোড দিয়া পাশাপাশি চলিতে চলিতে তরুণী বলিল, "আমার কিন্তু বড়ো খারাপ লাগছে। আপনার কাছে দয়া নিতে যাচ্ছি অথচ আপনাকেই না জেনে অপমান করে বসলুম।"

"দয়া ভাবছেন কেন, শ্রদ্ধাই মনে করুন না।"

"শ্রদ্ধা কিসের জন্যে?"

"নোট মুখস্থ ক'রে পাশ না ক'রে এখনও যে দু'চারজন আসল বইগুলো পড়ে এ দেখে শ্রদ্ধা হবে না! চুড়ি বাঁধা দিয়ে দশটাকা সংগ্রহ ক'রে বাজে খরচ না ক'রে বই কিনতে এসেছেন দেখলে"—

তরুণী অবাক হইয়া বলিল, "কি ক'রে জানলেন?"

"আপনার হাত খালি কিন্তু চুড়ির দাগ রয়েছে হাতে।"

তরুণী কিছুক্ষণ নীরবে সুমন্ত্রের পাশে পাশে চলিল। তারপর যখন কথা বলিল তখন তাহার কণ্ঠস্বর একটু ভারী। বলিল, "আমি সত্যিই খুব গরিব সুমন্ত্রদা, আপনার কাছে বলতে লজ্জা নেই, আমার বাড়ীর লোকের আমাকে এম এ, পড়াবার শক্তিও ছিল না, ইচ্ছেও ছিল না। নিজের ইউনিভারসিটির খরচ প্রাইভেট টুইশনি করে চালাই। বই অধিকাংশই চেয়ে পড়ি, তার মধ্যে আমার এক বান্ধবীর কাছেই বেশীর ভাগ সাহায্য পাই। এ বইখানা তারও নেই।"

"বেশ তো, তাঁকেও দেবেন পড়তে। দশ বছর পড়ে আছে আমার কাছে, এক বছর আপনাদের কাছে থাকলে কোনো ক্ষতি হবে না।"

"যাঃ, এতক্ষণ আপনাকে নাম ঠিকানা কিছুই বলা হয়নি। আমাকে বই দিয়ে কিন্তু বিপদে পড়তেন শেষকালে। আমার নাম সেবা সরকার। বাড়ি এই পটুয়াতোলাতেই"—

সুমন্ত্র ততক্ষণে নিজের বাড়ির দ্বারে পৌঁছিয়া তালা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিতেছে। বলিল, "আমি একা থাকি সুতরাং অভ্যর্থনা জানাতে পারলুম না আপনাকে। আপনি বরং একটু বাইরেই দাঁড়ান। আর কিছু দরকার আছে? দেকার্ত, লক, হিউম? ব্র্যাড্‌লির "অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাণ্ড রিয়্যালিটি?"

"দেখতে দোষ কি? আর্ডম্যানের ফ্র'ভলিউম আছে আপনার? ইউবার বেগ আছে? পলসনের মেটাফিজিক্স? জোয়াকিম, হোয়াইটহেড, এডিংটন, এঁরা সব আধুনিক লেখক, অ্যালেকজাণ্ডার বা বার্ট্রাণ্ড রাসেলও আধুনিক,—এঁদের বই বোধ হয় আপনার সংগ্রহে পাব না?"

"দেখি। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সঙ্গে আমার একটু পরিচয় আছে।"

সুমন্ত্র আটখানি মোটা মোটা বই লইয়া আসিল। সেবা দেখিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল। বলিল, "সবগুলিই যদি চাই?"

"পাবেন। তবে এ যে মুটের বোঝা? বইতে পারবেন কি?"

"এত বই দিতে ভয় করবে না আপনার?"

"পাশ্চাত্য মহাজনের ভাষায় বলি, 'ভয়' সে কী বস্তু? ভয় করলে পথ থেকে ডেকে আনতুম আপনাকে? তা ছাড়া একটু আগেই তো সম্বন্ধ পাতিয়ে নিয়েছেন, দাদা বলেছেন"—

সেবা লজ্জিতভাবে বলিল, "দাদা বললেই কি সব জিনিস দেওয়া যায় সবাইকে। আমি তো পারতুম না।" একটু থামিয়া বলিল "রবাহূতের জন্য ভূরি ভোজের ব্যবস্থা করলেন শেষ পর্যন্ত। নিশ্চয় ভাবছেন, কি হ্যাংলা মেয়েটা? কি আত্মসম্মান জ্ঞানহীন।"

"জ্ঞানের রাজ্যে ভিক্ষায় আত্মসম্মান যায় না। আমাদের দেশে রাজার ছেলেকে গুরুর গরু চরাতে হ'ত জ্ঞানভিক্ষা করতে গিয়ে। তাছাড়া আপনাকে দিতে পারাতে আমার আনন্দ আছে। অনধিকারী হ'য়ে এই জ্ঞানভাণ্ডার আটকে রাখব অধিকারীর কাছ থেকে? আমি ইতিহাসের ছাত্র, দর্শনের রসে বঞ্চিত।"

সেবা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, "বইগুলো ফেরত দোব কোথায়? এখানেই থাকেন তো আপনি?"

"থাকিও বটে থাকি নাও বটে। তবে বই ফেরত দেবার সহজ উপায়, কলেজস্ট্রীটের কাছাকাছি যে কোনো একটা খদ্দরের দোকানে আমার নাম ক'রে দিয়ে দেওয়া। না হয় অধীরবাবুর কাছে।"

"ওঁরা সবাই বুঝি আপনার বন্ধু? বাংলাদেশের কোনে বড়ো লেখকের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?"

"তা আছে। অনেকেই আমাকে স্নেহ করেন।"

"তাহলে আপনার খদ্দর-বন্ধু, লেখক-বন্ধুদের সন্ধান পেলুম। আর ক'জাতীয় বন্ধু আছেন আপনার?"

"কলেজের ছাত্র-বন্ধু, গ্রামের চাষা-বন্ধু, শান্তিনিকেতনের শিল্পী-বন্ধু, বিভিন্ন আখড়ার সন্ন্যাসী-বন্ধু। নাঃ, পথে দাঁড়িয়ে আর ব'কব না আপনার সঙ্গে। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন আপনি।"

"সত্যি। তাছাড়া আপনাকেও বড়ো ক্লান্ত দেখাচ্ছে, খুব ঘুরেছেন বুঝি সারাদিন? আমি আজ যাই তা হ'লে। এই ঠিকানাটা রাখুন।" সেবা নিজের খাতার একখানা পাতা ছিঁড়িয়া নাম-ঠিকানা লিখিয়া দিল। বলিল, "সুবিধে হ'লেই দেখা করবেন। রবিবার সকালে বাড়ি থাকি। আপনার মুখে আপনার কবিতা শুনতে চাই।"

যাইতে উদ্যত হইয়াও আবার দাঁড়াইয়া গেল সেবা। বলিল, "ধন্যবাদ দিয়ে ছোটো করতে চাই না! অন্ততঃ ভাইফোঁটার দিন একবার পায়ের ধুলো দেবেন। আপনার জন্যে অপেক্ষা করব আমি।"

সুমন্ত্র মুহূর্তকাল ভাবিল। তারপর বলিল, "কথা দিতে পারছি না। অনেক কাজে থাকি আমি, ব্যস্ত মানুষ।"

"অর্থাৎ যাবেন না? স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মন্তব্য করেছি ব'লে রাগ ক'রে না, আমার কোনো অভিসন্ধি আছে সন্দেহ করে? অভিসন্ধি সত্যিই একটা এসেছে মাথায়, তবে তার মধ্যে স্বার্থবুদ্ধি নেই সুমন্ত্রদা।"

সুমন্ত্র অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, না, ওসব কোনো কথাই হচ্ছে না। নিজের একটীমাত্র বোন, তার ভাইফোঁটাতে যেতে পারিনি সাতবচ্ছর, আপনি ব'লতে কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।"

"নিজের বোনের চেয়ে পাতানো বোনেদের দাবী যে বেশি, সুমন্ত্রদা, তা বুঝি জানেন না?" রসিকতা করিতে গিয়া সুমন্ত্রের মুখে বেদনার ছায়া দেখিয়া সেবা অপ্রস্তুত হইয়া গেল। বলিল, "আবার না বুঝে আঘাত দিলুম। আমি একটা 'ক্যাড'।"

সুমন্ত্র বলিল, "না, না, আঘাত কিছু দেন নি। আমার ওপর সত্যিই পরের দাবী বেশি, নিজের লোকেদের চেয়ে। আমার বোন, আমার মাসিমা, পিসিমা, কাকা, কাকীমা, অনেকের কাছে পেয়েছি প্রচুর, দিইনি কিছুই,—শুধু দুঃখ এবং উদ্বেগ ছাড়া।"

কথা ফিরাইবার চেষ্টায় ছিল সেবা। বলিল, "আপনার তো খুব

অ্যাডভেঞ্চারের জীবন। অভিজ্ঞতা নিশ্চয় অনেক জমেছে, গল্প লেখেন না কেন? আজকাল অনেকেই তো লিখছেন নিজেদের জীবনের কথা নিয়ে।"

"সত্যি কথা বলতে কি আমার জীবনে অভিজ্ঞতা থাকলেও রোমান্স নেই। মুখে যে যাই বলুন, মননশীলতার যত প্রশংসা করুন—পাঠকেরা অধিকাংশই চান রোমান্স। নারী সম্পর্ক হীন অ্যাডভেঞ্চারের বই, শুধু জেলখানা আর লাঠি, অপমান আর অত্যাচার,—পড়বে কে?"

"আপনার জীবনে অনাত্মীয়া নারী আসেনি কেউ?"

"এসেছে তবে ছায়াপাত করে নি। আর গ্রামে যেখানে কাজ করছি আপাততঃ? সেখানে নারী থাকলেও 'সেক্স' নেই, রোমান্স নেই। তারা শকুন্তলাও পড়েনি, বার্ট্রণ্ড রাসেলও পড়েনি, সহশিক্ষাতেও অভ্যস্ত নয় তারা। ধান ভানে, ঢেঁকিতে পাড় দেয়, কলার বাসনার ক্ষারে কাপড়-সেদ্ধ করে, ডোবায় হাতজালে মাছ ধরে—"

"এর মধ্যেই তো রোমান্সের গন্ধ পাচ্ছি সুমন্ত্রদা"– সুমন্ত্র বলিয়া চলিল, "একগলা ঘোমটা টেনে অতিথিকে ভাত বেড়ে দেয়, বছরে ন' মাস ম্যালেরিয়ায় কোঁ কোঁ করে, শাশুড়ীননদের গালমন্দ আর তেড়েল মাতাল স্বামীর মার খায় কথায় কথায়। বামুন কায়েতের গাঁ নয়, ঠিক রোমান্টিক পরিবেশ নয়। কোনো কোনো সৌভাগ্যবান সর্বত্রই নায়িকা খুঁজে পান তাই নিয়ে গল্পও লেখেন দেখেছি। আমার সে রকম সৌভাগ্য হয়নি এখনও।"

সেবা হাসিয়া বলিল, "বয়স যায় নি এখনও। 'কালোহ্যয়ং নিরবধি, বিপুলা চ পৃথ্বী।' গ্রামে না থাক, এই বিপুলা ক'লকাতাতেই আপনার জন্য রোমান্স অপেক্ষা করছে, সুমন্ত্রদা।"

"কি ক'রে জানলেন?"

"দর্শনশাস্ত্র পড়ে দিব্য দৃষ্টি খুলে গেছে। সত্যি সুমন্ত্রদা, খুব ভালো মেয়ে আছে সন্ধানে, রোমান্সের ব্যবস্থা ক'রব? পারিশ্রমিক কি দেবেন বলুন?"

প্রাতঃস্মরণীয় গোপাল ভাঁড় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সংসারে ডাক্তারের সংখ্যাই সর্বাধিক। সুমন্ত্র নিজের অভিজ্ঞতায় জানিয়াছে ঘটক-ঘটকীর সংখ্যাও তাহার চেয়ে কম নহে। সে হাসিয়া বলিল, "আমি যে বিয়ের জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছি এটা তুমি কি ক'রে কল্পনা করে নিলে?"

"ব্যস্ এবার থেকে তুমি আর আপনি নয়। বিয়ের কথাতেই কেমন ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেছে দেখছেন তো? তবে এটাই বোঝা গেল আপনি বিংশ শতাব্দীতে জন্মালেও অষ্টাদশ শতকেই আছেন, দণ্ডীসুবন্ধুর প্রাচীন-ভারতেও নয়, আমাদের বর্তমান ক'লকাতাতেও নয়। না হ'লে বিয়ের সঙ্গে রোমান্সকে জড়াতেন না। যাঁরা 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক' চান তেমন অনেক আধুনিক লেখকই জড়ান না। খবরটা জেনে তবু খুশিই হয়েছি সুমন্ত্রদা। আমরাও একটু প্রাচীন-পন্থী। যাক, মন স্থির ক'রে ফেলুন, তাড়াতাড়ি। দরকার হ'লে আমার স্যহায্য নিতে লজ্জা পাবেন না। আচ্ছা আজ চলি।"



বিয়ের কথাতেই কেমন

পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া সাবলীল দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল মেয়েটি। সুমন্ত্র তাহার গতিপথের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, 'সত্যই কি তাহার অবস্থা এইরূপ সঙ্গীন? বাহিরের লোকের কাছেও ধরা পড়িতেছে পদে পদে। সে কথা? ঐ যাঃ, সেবাকে বাড়িভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করা হইল না তো? মেয়েটা পথে ঘাটে ঘোরে, কিছু সন্ধান দিতে পারিত হয় তো; বলিলে খোঁজ লইয়া সাহায্য করিতেও পারিত। যাক গে'—

তাহার বাহিরের ঘরের ভাড়াটিয়া বৃদ্ধ ডাক্তারবাবু ডিস্পেন্সারি খুলিতে ছিলেন। পাশের দরজার সম্মুখে সুমন্ত্রকে 'ন যযৌ, ন তস্থৌ' অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি ভাবছ সুমন্ত্র? গাড়ী চাপা পড়বে যে!"

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ধরিয়া ক্লান্তপদে শ্যামবাজারের দিকে চলিয়াছিল সুমন্ত্র। ডাক্তারবাবু হঠাৎ কি মনে করিয়া দুই মাসের ভাড়া চল্লিশ টাকা এক সঙ্গে দিয়া ফেলিয়াছেন, সুতরাং সুমন্ত্রের বাজার

খরচ আরও কিছু বাড়িয়াছে। তাহার মোটঘাটের বৈচিত্র্য দেখিয়া ট্রাম এবং বাস-কণ্ডাক্টারেরা গাড়ীতে উঠিতে দেয় নাই, রিক্সাওয়ালারা সুযোগ বুঝিয়া দুই টাকা হাঁকিয়াছে, অগত্যা সুমন্ত্র হাঁটিয়াই রওনা হইয়াছে। গ্রামে দশ ক্রোশ হাঁটা অভ্যাস আছে, এখানে এক ক্রোশ আর এমন কি? কিন্তু হাতিবাগানের মোড়ে পৌঁছিবার পূর্বেই তাহার বার বার মনে হইয়াছে, কলিকাতার এক ক্রোশ আর গ্রামের এক ক্রোশে তফাৎ আছে। দূরত্ব ছাড়া আরও কিছু বিবেচ্য বস্তু ছিল ইহার মধ্যে, যাহা সে পূর্বে বিবেচনা করে নাই। ট্রাম, বাস, রিক্সা, মোটর ও ঘোড়ারগাড়ী হইতে বহু কৌতূহলী দৃষ্টি তাহার উপর নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, দুই চারিটা মন্তব্যও কানে আসিতেছিল, 'খাসা মানিয়েছে,' 'দ্যাখ দ্যাখ, গন্ধমাদন নিয়ে যাচ্ছে হনুমান্,' 'আজব চিড়িয়াখানা, বাবা,' 'নারে না, বিজ্ঞাপন দিতে বেরিয়েছে; ধর্মতলায় একটা দোকান খুলেছে দেখিসনি, ছুঁচ থেকে মোটরকার পর্যন্ত সব কিনতে পাওয়া যায়, তারই বিজ্ঞাপন।' একটা মোটরে বসিয়া তিনটি সুবেশা তরুণী তাহাকে দেখিয়া উচ্চহাস্যে ফাটিয়া পড়িল। ট্রাম বাস হইতে কৌতুকপূর্ণ এবং ব্যঙ্গ-হাস্যস্মিত কয়েকটি সুন্দর মুখ তাহাকে লজ্জা দিয়া গেল। আচ্ছা, এমন হয় কেন? পুলিশের লাঠির চেয়ে মেয়েদের হাসিঠাট্টায় বেশী আঘাত লাগে কেন? তা, উহাদেরই বা দোষ কি? সুমন্ত্রের সাজসজ্জা একটু বিচিত্র রকমেরই হইয়াছে যে! তাহার বাঁ কাঁধে খাড়া হইয়া আছে একটা তুলা-ধুনিবার পিঞ্জন, তাহা হইতে ঝুলিতেছে একটি পূর্ণগর্ভ বিরাট খদ্দরের ঝোলা। তাহাতে আড়াই সের পাড়ের সুতা আছে, কলিকাতার এক আত্মীয়ার ফরমাসী কাঁথার জন্য কিছু পুরাতন কাপড় এবং বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের ও নিজের জন্য কাপড়, বাসন, ঔষধ, বই প্রভৃতি আছে। ডান কাঁধের উপর একখানি পাকানো শীতলপাটি ছাড়া উদ্ধৃত ছাতা হইতে ঝুলিতেছে কাপড়ের পুঁটুলিতে বাঁধা এক সের তুলা ও একটা হটওয়াটার ব্যাগ। বাঁদিকের বগলে আছে দুইটি মানচিত্র, একটি মহাত্মাজীর বাঁধানো ছবি, আর ডান হাতে নূতন বালতির মধ্যে আছে একটি হারিকেন লণ্ঠন, একটা স্পিরিটের এবং একটা ইউক্লোরিনের বোতল এবং সেই সঙ্গে বৈঠকখানা বাজারে-কেনা দুইটি গোলাপ চারা। ওজনটা গুরুতর না হইলেও দৃশ্যটা গুরুতর, অর্থাৎ ভারে না কাটিলেও ধারে কাটিতেছে সুমন্ত্র।

পায়ের চলার সঙ্গে মনটাও চলিতেছিল, কিন্তু অনেক দ্রুতবেগে, অনেক বিভিন্ন রাজ্যে। আচ্ছা, কেন সে সাধ করিয়া হাস্যাস্পদ হইতেছে এমন? রিক্সা বা ট্যাক্সি করা কি এমনই কঠিন ছিল? তাই বা কেন? আজ জীবনটাকে লইয়া এভাবে ছিনিমিনি না খেলিলে সে কি মোটা বেতনের সরকারী চাকুরি লইয়া উহাদের মতো কোনো তরুণী বান্ধবী পাশে বসাইয়া মোটর বিহারে বাহির হইতে পারিত না? নাঃ, পারিত না সত্যই। ভর্তৃহরি ঠিকই বলিয়াছেন, সিংহ ক্ষুধায় মরিলেও ঘাস খাইতে পারে না। অনেক দিন পুর্বের একটা কথা মনে পড়িল। বারাসত জেল হইতে বদলি হইয়া কলিকাতার একটা জেলে আসিতেছিল সুমন্ত্রেরা কয়েকজন। শিয়ালদহে নামিবার সময় সঙ্গী পুলিসেরা তাহাদের কোমরে দড়ি বাঁধিল। ইন্সপেক্টরবাবু চাহিয়া দেখিলেন, কিছু বলিলেন না, তাহারাও প্রতিবাদ নিষ্ফল বুঝিয়া আপত্তি করিল না। চীৎপুরের মোড়ে ট্রাম বদল করিতে হইবে, তাহারা নামিল। পরনে হাত কাটা ডোরা মার্কা ফতুয়া এবং জেলের চিহ্নিত হাফপ্যাণ্ট, কোমরে দড়ি। একদল যুবক সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া মন্তব্য করিয়া গেল, "শালারা চোর।"

চোরই বটে, যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর! তোমাদের সকলের পাপ মাথায় করিয়া যে আমরা চোর সাজিয়াছি! সুমন্ত্রের কান মাথা গরম হইয়া উঠিল, সঙ্গীরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাউয়ি করিয়া হাসিল, সে হাসিতে পারিল না। সম্মুখেই তামাকের দোকান, চোখে পড়িল সুবেশ সুপুরুষ স্থূলকায় মুসলমান দোকানদার তাহাদের দিকে তাকাইয়া ঝনঝন করিয়া টাকা বাজাইতেছে। মুহূর্তের জন্য মনে হইল উহার সহিত আমার জীবনটা বদল করিতে পারিলে কেমন হইত? অর্থ, রূপ, নিশ্চিন্ত জীবন যাত্রা, ঘরে হয়তো পরীর মতো রূপসী দুই চারিটি বিবি! নাঃ, এত সুখ সুমন্ত্রের ধাতে সহিবে না। তাহার ভাগ্য সে নিজে রচনা করিয়াছে, এই কারাগারের পরিচয়ই তাহার অলঙ্কার, স্বদেশবাসীর নিকট প্রাপ্ত এই অহেতুক অপমানই তাহার গৌরব। বর্তমানে ফিরিয়া আসিল সুমন্ত্র, অতীতের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বর্তমানে। আজিকার এই ব্যঙ্গ-হাস্যে বিচলিত হইলেও চলিবে না তাহার। সে মনে মনে জপ করিতে লাগিল, 'আমার এই ভালো, আমার এই

প্রাপ্য!' 'খৃস্টের অনুসরণ করিতে হইলে ক্রস বহন না করিয়া গতি নাই'। 'তবু, দুর্বল মন তবু তর্ক করে, ঈশ্বর আর একটু দয়াল হইলে ক্ষতি কি ছিল? দুর্গতের সেবায় দুর্গম পথের বন্ধু যদি মিলিত! বন্ধুর পথের যাত্রা-সহচরী বান্ধবী? হাঁ বান্ধবী, শক্তিদায়িনী—প্রেরণাদায়িনী বান্ধবী। তা, শুধুই বান্ধবী? বীর হস্তে বরমাল্য লইবার যোগ্য হোলো"—

হঠাৎ কানের কাছে ঘ্যাচ করিয়া একটা শব্দ হইল। একখানা পুরাতন বেবি অস্টিন গাড়ী সুমন্ত্রের পাশেই ফুটপাথের গা ঘেঁসিয়া থামিয়া গেল এবং তাহার গর্ভ হইতে বাহির হইয়া তাহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন অধ্যাপক বন্ধু কমল মিত্র। সুঠাম শ্যামবর্ণ দেহে সংহত শক্তির, প্রশস্ত ললাটে ভূয়োদর্শন ও মননের এবং হাস্যোজ্জ্বল চক্ষুদ্বয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি। ইনি চরখাও কাটেন আবার মুগুরও ভাঁজেন। ঘরে বসিয়া দিনের পর দিন লিখিতে ও পুঁথিপত্র ঘাঁটিতে, দেশে দেশে ঘুরিয়া জীর্ণ মন্দিরের ও শীর্ণ মানুষের ফোটো তুলিতে এবং গ্রামে গ্রামে হাঁটিয়া পল্লীসংগঠনের কাজ করিতে ইহার সমান উৎসাহ। দেশকাল সচেতন কর্মী এবং দেশকাল নিরপেক্ষ সাহিত্যিক মহলের মধ্যে ইনি সেতুস্বরূপ। ভদ্রলোক সুমন্ত্রের কাঁধে হাত রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "পরম কারুণিক পরমেশ্বর মানব জাতির কল্যাণের নিমিত্ত যে সমস্ত বিচিত্র পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন"—

সুমন্ত্র পাদ পূরণ করিল, "কমল মিত্র তাহাদের মধ্যে অন্যতম।" এই উক্তিটি বন্ধুমহলে সুপরিচিত কমলবাবুর একটি 'মহাজনবচনসংগ্রহ।' শৈশবে তাঁহাদের বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক ছাত্রদের নিকট রচনা লিখিবার সহজ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এই 'ফরমুলা'টি শিখাইয়া দিয়াছিলেন। গরু, ঘোড়া, বৃক্ষ, নদী, শরৎকাল বা পিতৃভক্তি,—যে-কোনো বিষয়েই রচনা চাওয়া হউক না কেন এই বাক্যটি তাহার গোড়ার ভূমিকা স্বরূপ ব্যবহার করিলে সে লেখার আর মার নাই। বুদ্ধিমান বালকেরা রেলগাড়ী, গ্রামোফোন এবং ম্যালেরিয়াকেও এই ছাঁচে ঢালিয়া মোটা নম্বর পাইত। কমলবাবু এখনও বন্ধুদের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে এটি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সুমন্ত্র তাঁহার সেই অসমাপ্ত বাক্যটিকেই ঘুরাইয়া তাঁহার উপর প্রয়োগ করিল। তখন কমলবাবু বলিলেন, "গুড়ের নাগরী আর ঝাঁটা দেখছি না যে? ইস্, দাঁড়িপাল্লা, হাঁড়ি, গঙ্গাজলের ঘড়া সব ভুলে এসেছেন? আসুন, ঢকে পড়ুন আমার যন্ত্ররথে।

গন্তব্য স্থান তো খাল ধার? পথে লোহা লক্কড় কোথাও কিছু রাখা নেই তো? বলবেন তা'হলে, তুলে নেব।"

"যে খায় চিনি, তাকে যোগান চিন্তামণি।" সুমন্ত্র বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ীতে উঠিল, কমলবাবু তাহার লটবহর অদ্ভুত কৌশলে তাঁহার যন্ত্ররথের ভিতরে বাহিরে পরিস্থাপন করিয়া স্টার্ট দিলেন।

সেদিন কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে একটা পাইস হোটেলে খাইয়া সারা বিকাল ও সন্ধ্যা সুমন্ত্র বাড়ির সন্ধানে ফিরিল। গোটা বাড়ির সম্বন্ধে হতাশ হইয়া সে বিবেকানন্দ রোড, মাণিকতলা স্ট্রীট প্রভৃতি রাস্তায় কয়েকটা ফ্ল্যাটও দেখিল। মাণিকতলা স্পারে একটা প্রকাণ্ড বাড়িতে দোতালায় একটি মনের মত ফ্ল্যাট পাওয়া গেল। নূতন বাড়ি, দক্ষিণ খোলা; দরোয়ানজী সাক্ষ্য দিল বাড়িতে কাহারও রেডিয়ো নাই। ভাড়া বাহান্ন টাকা। এস্টিমেট ছাড়াইয়া যায়, তা' যাক্, ভদ্রেশ্বর তাহাতে কিছু মনে করিবে না। একমাত্র সিঁড়ি ছাড়া অন্য কোথাও কাহারও সহিত কোনো যোগ থাকিবে না, কবির কাব্যরচনার ব্যাঘাত হইবে না। রাত্রি তখন নয়টা; সুমন্ত্র স্থির করিল বাড়িওয়ালার সহিত দেখা করিয়া কালই পাকা কথা কহিবে। বাহির হইয়া আসিবে, এমন সময় মাথার উপর দুম্ দুম্ করিয়া শব্দ আরম্ভ হইল। সুমন্ত্র কৌতূহলী হইয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই পাশের ফ্ল্যাট হইতে কে চীৎকার করিয়া বলিল, "আপনি কি মনে করেছেন বলুন তো? রোজ মাঝরাত্তিরে মাথার ওপর কয়লা ভাঙ্‌বেন?" উপরের জানালা হইতে উত্তর আসিল "কি করি বলুন, ছুটি পাই রাত সাড়ে আটটায়। মনিবকে ব'লে ছুটিটা সকাল সকাল করিয়ে দিন না।" পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক হাঁকিলেন "ওসব কোনো কথা শুনতে চাই না, থামবেন কি না বলুন।" এ প্রশ্নের উত্তরে আবার দ্বিগুণ বেগে দুম্ দুম্ শব্দ আসিতে লাগিল। পাশের ফ্ল্যাট হইতে হুঙ্কার শোনা গেল, "সহ্যেরও একটা সীমা আছে! ভদ্রতা রেখে আর চ'লল না! বলি, মশাই শুনচেন? আজ শেষ ওয়ার্নিং দিচ্ছি আপনাকে, থামবেন তো থামুন,—না হ'লে"।—উপর হইতে ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে জবাব আসিল, "না হ'লে কি করবেন? মাথাটা কেটে ফেলবেন নাকি? ওঃ থাকেন তো পায়ের তলায়, মেজাজ দ্যাখো না! আমি নিজের ঘরে ব'সে যা ইচ্ছে ক'রব, তাতে আপনার কি?" "নাঃ, ভালো কথায় হ'বে না দেখছি। ঘাড় ধ'রে বাড়ি থেকে বা'র করে না দিলে চলছে না। যতসব কয়লার কুলি এসে জুটেছে ভদ্দরলোকের পাড়ায়।" এতক্ষণ উপরতলার কণ্ঠস্বর নীচের তলার হুঙ্কারের চেয়ে এক পর্দা নীচে ছিল,

এইবার তাহাকে ছাড়াইয়া দুই পর্দা উঠিল। "কোনো শালার ধার ধারি না, কারোর বাবার চাকর নই। ওপরে উঠে আসুন না মশাই, কে কাকে বার করে দেয় দেখে নিই। ওরে আমার ভদ্দরলোক রে? বলে 'আধ পয়সার পিড়িংশাক, যেমন মুরোদ তেমনি থাক।' ভদ্দরলোক তো আলাদা বাড়িভাড়া ক'রে থাকোগে যাও না চাঁদ! শালার আস্পর্ধা দেখেছ—বলে কি না ঘাড় ধ'রে বার করব?" পাশের ফ্ল্যাটের হুঙ্কার আরও এক পর্দা চড়িল, "দেখুন, শালা শালা করবেন না বলছি, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দে'ব!" "ওরে আমার জুতোওলারে! বাপের জম্মে জুতো দেখেছ?" চারিদিকের বিভিন্ন ফ্ল্যাট হইতে উভয় পক্ষের সমর্থনে নানারূপ মন্তব্য শোনা গেল। সুমন্ত্র দরোয়ানকে বলিল, "তোমরা কিছু বলো না? এরকম করে কয়লা ভাঙ্‌লে বাড়ি জখম হবে যে।" দরোয়ান বলিল, "কেউ সবেরে ভাঙ্‌বে, কেউ সন্ধ্যাতে ভাঙ্‌বে, কাকে কি বোলা যায়? আওয়াজ তো সারাদিন হোবেই করে। ফেল্যাটকা দস্তুর এহি বাবুজী। বড়বাবুর হুকুম, কাউকে কুছু বলবে না।"

অগত্যা সে বাড়িও চলিল না।

মধ্যে আর একটি দিন, পরদিন বিকালে ভদ্রেশ্বরের আসিবার কথা। সেদিন সকাল হইতে সুমন্ত্র দ্বিগুণ উৎসাহে খোঁজ-খবর আরম্ভ করিল এবং একে একে পাঁচটা বাড়ি দেখিল। কোথাও তাহার বনিল না, কোথাও বাড়িওয়ালার ভাড়াটে পছন্দ হইল না। বেলা বারোটা নাগাদ সে একরূপ হতাশ হইয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। ডি. এল. রায় স্ট্রীট ও চালতা বাগান লেন দিয়া শর্টকাট করিবার অভিপ্রায়ে সে বড়ো রাস্তা ছাড়িয়া গলির পথ ধরিল। শেষের বাড়িটাতে বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া মেজাজটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, চলিতে চলিতে নিজের মনে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'বাড়িভাড়া করা নয়তো, গেরোর ভোগ! ব'লে দে'ব, আমার দ্বারা হ'ল না। এর চেয়ে ইনসিয়োরেন্সের দালালী ভালো ছিল।'

সহসা পাশ হইতে একটি যুবক বলিল, "বাড়ি খুঁজছেন? দেখুন তো, ঐ গ্যাসপোষ্টের সামনের বাড়িটা বোধ হয় ভাড়া আছে।"

সুমন্ত্র বাড়ির দরজায় গিয়া দুই তিনবার কড়া নাড়িল, কেহ সাড়া দিল না। সুমন্ত্র চীৎকার করিয়া ডাকিল, "বেয়ারা!" সাড়া নাই। "ঠাকুর, অ, ঠাকুর!" সাড়া নাই। "ঝি,—অ, ঝি?"

ভিতরে একতলায় কোথায় কে একজন বালতি বালতি জল ঢালিতেছে। সাড়া দেয় না কেন? বাড়িশুদ্ধ সবাই বোবা কালা নাকি? সুমন্ত্র দ্বিগুণ বিক্রমে হাঁকিল "ঝি, অ—ঝিইই!"

এইবার মানুষের সাড়া পাওয়া গেল। উপরতলা হইতে কে বলিল, "উদাসী" দরজাটা খুলে দাও না, ভদ্রলোক কখন থেকে ডাকছেন, শুনতে পাচ্ছ না?" তাহার উত্তরে নীচের তলা হইতে কে বলিল, "উদাসীদাদা ঘুমোলে ডাকাত পড়লেও উঠবে না, মা। আমার হ'য়ে গেছে, যাচ্ছি। ভদ্দরলোক আর কে এমন সময়ে আসবে, বোধ হয় পাড়ার কোনো দুষ্টু ছেলে।" বলিতে বলিতে বছর-কুড়ি-একুশ বয়সের একটি সুন্দরী মেয়ে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। মেয়েটি হঠাৎ সুমন্ত্রকে দেখিবে বলিয়া যেন প্রস্তুত ছিল না। তাহার এক হাতে একখানি লাল গামছা ও একটি কাঁচ-কড়ার সাবানদানি, কাপড়জামা একটু আলুথালু। তাহার মাথার চুলে তখনও জল ঝরিতেছে, মুখে, হাতে, পায়ে ইতস্ততঃ সংলগ্ন শত শত শুভ্র জলকণা তাহার সদ্যস্নান স্নিগ্ধ তনুদেহখানিকে একটা অনির্বচনীয় মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে! সুমন্ত্রও ঠিক এইরূপ একটি দৃশ্য এই পাড়ায় এই সময়ে দেখিবে বলিয়া বোধকরি আশা করে নাই, সে সসম্ভ্রমে এক পা পিছাইয়া আসিল। মেয়েটি সাবানদানি ও গামছাশুদ্ধ হাত দুইটি কোনোরকমে কপালের কাছাকাছি তুলিয়া নমস্কার করিল। বলিল, "কি চান?" সুমন্ত্র থতমত খাইয়া প্রতি-নমস্কার করিতে ভুলিয়া গেল, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "আপনারা কি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন?"

মেয়েটির আরক্তমুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়াই মিলাইয়া গেল, সে বৈঠকখানার শিকলটা খুলিয়া দিয়া বলিল, "আপনি বসুন, আমি মা'কে ডেকে দিচ্ছি।"

সুমন্ত্র বসিল। নারীর কেশসৌরভ অথবা দেহসৌরভ—অর্থাৎ 'নবপুষ্পল' অথবা 'খস্ খস্' সাবান,—কোনটির মোহিনীশক্তি ঠিক দুপুরবেলায় ক্ষুধার্ত অবিবাহিত পুরুষের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করে তাহার মীমাংসা এখনও হয় নাই, কিন্তু সুমন্ত্র অভিভূতের মতো কিছুক্ষণ যে বসিয়াছিল একথা ঠিক। তাহার কি মাথা খারাপ হইয়া গেল? কালিদাস, সেক্সপীয়র, চণ্ডীদাস, রবীন্দ্রনাথ সকলে হঠাৎ অসময়ে মগজের মধ্যে উজ্জীবিত হইয়া উঠিলেন কেন? সহসা বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ।" ঠিক কথা, কিন্তু

দুপুর রৌদ্রে এই শুঁড়িপাড়ার গলিতে? নাঃ, এ চোখের নেশা। সুমন্ত্র সামলাইয়া উঠিল। মিনিট দুয়েক পরেই সে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার,—অর্থাৎ বৈঠকখানা ঘরের সুরুচিসম্মত গৃহসজ্জার,—তদারক করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের মাঝখানে একটি কাশ্মীরী গোলটেবিলে মুরাদাবাদী ফুল-দানিতে রজনীগন্ধার কয়েকটি শুভ্র পুষ্পদণ্ড মৃদু সৌরভ বিতরণ করিতেছে। তাহার চারপাশে শুভ্র আস্তরণে ঢাকা চারিটি ঈষদুচ্চ জলচৌকি। দেওয়ালের গায়ে গায়ে তিনদিকে তিনটি এককোমর উঁচু বইয়ের র‍্যাক। আর দেখিবার সময় হইল না, দোতলা হইতে ডাক শুনিয়া পাশের বাড়ির একটি দশ বারো বছরের ছেলে কিছু পূর্বে এ-বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছিল, সে আসিয়া বলিল, "মাসিমা এসেছেন।" সুমন্ত্র বুঝিল, পুরুষ অভিভাবকের অভাবে গৃহকর্ত্রীর সঙ্গেই কথা কহিতে হইবে। অগত্যা সে তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াই রহিল। পরক্ষণেই ভদ্রমহিলা দ্বারের পাশ হইতে বলিলেন, "ওঁকে ব'সতে বল্, আমি এখান থেকেই কথা ব'লব।" সুমন্ত্র বসিল। "ওঁর নামটা জিজ্ঞেস করতো?" পাশের বাড়ির ছেলেটি প্রশ্ন করিল "আপনার নাম?" "শ্রীসুমন্ত্র সেন।" দরজার পাশ হইতে আবার অনুচ্চস্বরে প্রশ্ন আসিল "জিজ্ঞেসা কর, পড়াশোনা কতদূর করেছেন? সুমন্ত্র বলিল "ইতিহাসে এম, এ দিয়েছিলুম বছর পাঁচেক আগে, ল' পাশ করেছি তার পরের বছর।" প্রশ্ন হইল "আপনাদের বাড়ি?" "আপাতত ক'লকাতাতেই, আগে বর্ধমান জেলায় ছিল।" "বাড়িতে কে কে আছেন?" "বাবা, মা মারা গেছেন। একটি বোন, তার বিয়ে হয়েছে এলাহাবাদে।" "কলকাতায় নিজেদের বাড়ি, না, ভাড়া?" সুমন্ত্র বলিল, "আমার নিজের বাড়িই আছে। উপস্থিত আমার এক বন্ধুর জন্য একটা ভাড়া-বাড়ির দরকার।" দরজার পাশে কিছুক্ষণ কোনো কথা শোনা গেল না, ছেলেটি মধ্যস্থ থাকার কোন প্রয়োজন না দেখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে সরিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে আবার প্রশ্ন হইল "কি রকম চান?" সুমন্ত্র বলিল, "আগে তো দেখি। পছন্দ হলে টাকার জন্য আটকাবে না।" ভদ্রমহিলা আবার প্রশ্ন করিলেন, "অভিভাবক কে? কার সঙ্গে কথা কইতে হবে? আপনি দেখলেই হবে, না আর কেউ দেখবেন?" সুমন্ত্র বলিল, "আমি দেখলেই হবে।" ভদ্রমহিলা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের কি গোত্র?" "ধন্বন্তরি।" ভদ্রমহিলা অনুচ্চস্বরে স্বগতোক্তি করিলেন, "ভালোই হয়েছে, আমরা শক্তি গোত্র।" পরে উচ্চতরকণ্ঠে

বলিলেন, "আপনাদের দেশ কোথায় ছিল শুনেছেন? কোথাকার সেন আপনারা?"

স্মমন্ত্র বলিল, "প্রপিতামহের বাবা সেনহাটি থেকে এসেছিলেন শুনেছি। তারপর বালি, বর্ধমান"—ভদ্রমহিলা আবার স্বগতোক্তি করিলেন, "সেনহাটির সেনগুপ্ত আর 'কালিয়া'র দাশগুপ্ত। ভালোই হবে। আপনি একটু বস্থন। বড় অসময়ে এসেছেন, বাড়িতে এক বুড়ো চাকর ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ-মানুষ নেই। আমার এক দূরসম্পর্কের নন্দাই অবশ্য মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নেন। আমাদের পক্ষ থেকে অভিভাবক এখন তিনিই ব'লতে গেলে। আমার দাদারা থাকেন লাহোরে, দু'দশ বছর অন্তর একবার দেশে আসেন। কিছু মনে করবেন না, আপনার পডাশুনা কতদূর?"

স্মমন্ত্র বলিল, "ইতিহাসে এম, এ, আইনটাও পড়েছি।"

"বয়েস?"

"আটাশের কাছাকাছি।"

"আচ্ছা, আমি এখনি আসছি, একটু অপেক্ষা করুন।"

বলিতে বলিতে ভদ্রমহিলা দরজার পাশ হইতে সরিয়া গেলেন। স্মমন্ত্রর মনের মধ্যে কি যেন একটা সন্দেহ ঘনাইয়া উঠিতেছিল; কোথায় যেন কি একটা গুরুতর ভুল হইয়াছে। এ কি রে বাবা? বাড়ি দেখিব, তাহার জন্য এত বয়স, শিক্ষা, গোত্রকুলের পরিচয় কেন? হঠাৎ খোলা জানালার পর্দার ফাঁক দিয়া চোখে পড়িল গলিব অপর পারে সামনের বাড়ির বারান্দা হইতে একটুকরা সাদা কার্ডবোর্ড ঝুলিতেছে, তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'টু লেট'। তাহা হইলে সে কি ভুল করিয়া অন্য বাড়িতে ঢুকিয়াছে? কি সর্বনাশ! সহসা একটা বুকর‍্যাকের উপর সেদিনকার আনন্দবাজারখানা চোখে পড়িল। কাগজখানা খুলিতেই পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনের তালিকার মধ্যে লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া কয়েকছত্র তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে রুদ্ধনিশ্বাসে পড়িল: 'স্বাস্থ্যবান, স্থশিক্ষিত সচ্চরিত্র পাত্র চাই। পাত্রী বৈদ্য, শক্তিগোত্র, দর্শনে বি, এ; স্থন্দরী, সঙ্গীতজ্ঞা, রন্ধন ও গৃহকর্মনিপুণা। কলিকাতায় বাড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। সকালে বা সন্ধ্যায় পাত্র স্বয়ং আসিলে ভালো হয়। পোস্ট বক্স নং······আনন্দবাজার।' বহু অনুসন্ধানেও চালতাবাগানে কোনো বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন পাওয়া গেল না।

সুমন্ত্রর মাথার মধ্যে কেমন যেন ঝিম ঝিম করিতে লাগিল, সে যেন ভাবিবার শক্তি পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিতেছিল। একবার মনে করিল কেহ কোথাও নাই, এই সময় উঠিয়া পলাইয়া গেলে কিরূপ হয়? পরক্ষণেই এক ঠোঙ্গা খাবার লইয়া সেই পাশের বাড়ির ছেলেটি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল, ভিতর হইতে লুচি ভাজার গন্ধও আসিতে লাগিল। সুমন্ত্র স্থির করিল, 'নাঃ, যখন নামিয়াছে তখন শেষ পর্যন্ত না দেখিয়া ছাড়িবে না। এখন পলায়ন করা কাপুরুষের কাজ হইবে।'

মিনিটপাঁচেক পরে পাশের বাড়ির ছেলেটি ঘরে ঢুকিল। তাহার এক হাতে শ্বেতপাথরের থালায় খানদশেক লুচি ও আলুর দম, তাহার সঙ্গে একটু বাড়ির তৈয়ারি আমের জেলি এবং দুইটি করিয়া বড বড় সন্দেশ ও রসগোল্লা, অপর হাতে শ্বেতপাথরের গ্লাসে কর্পূর দেওয়া ঠাণ্ডা জল। ছেলেটি থালা ও গ্লাস টেবিলে নামাইয়া বলিল, "মাসিমা ব'ললেন, একটু জল খেয়ে নিতে। ওঁরা এখনি আসছেন।"

সুমন্ত্রকে দ্বিতীয়বার বলিতে হইল না। একখানি লুচি এবং একটি রসগোল্লা বাকি থাকিতে হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল, ছেলেটি কখন ভিতরে চলিয়া গিয়া উচ্চৈঃস্বরে গল্প আরম্ভ করিয়াছে, "পেট হাতে ক'রে এসেছিল, মাসিমা, এক এক গালে দু'খানা ক'রে পুরছে। বাপ্‌স্, ঢের ঢের খাওয়া দেখেছি"। সুমন্ত্রর আহারের প্রবৃত্তি হঠাৎ চলিয়া গেল, সে কান খাড়া করিয়া শুনিতে লাগিল গৃহিণী বলিতেছেন, "আহা, এখনও হয়তো ভাত খাওয়া হয়নি। বেশ করেছে খেয়েছে, জোয়ান ছেলে, খাবে না? আর ক'খানা লুচি দিয়ে আসবি? ময়দা মাখাই আছে, আমি এখনি ভেজে দিচ্ছি। হ্যাঁরে সুদেষ্ণা, তোর এখনও হ'ল না?"

সুমন্ত্র একবার ভাবিল পাতে কিছু ফেলিয়া রাখিবে, আবার ভাবিল, পেটুক বদনাম তো হইয়াই গিয়াছে, এই দুর্মূল্যের বাজারে উঁহাদের খাবারগুলো নষ্ট যায় কেন? সে থালাখানি নিঃশেষ করিয়া জানালার বাহিরে হাত বাড়াইয়া পীতাবশিষ্ট জলে মুখ ধুইয়া ভদ্রলোক হইয়া বসিল। সুদেষ্ণা! বেশ নামটি কিন্তু! কোথায় যেন শুনিয়াছে সম্প্রতি? দাড়ি কামাইয়া আসিলেই ঠিক হইত, বড়ো ভুল হইয়া গিয়াছে।

আরও কয়েক মিনিট পরে আধ ঘণ্টা আগেকার দেখা সেই মেয়েটি আসিয়া ঘরে ঢুকিল। গতি কিছু ধীর, বেশবাস কিছু সংস্কৃত ও সংযত।

চুলে এলো খোঁপা এবং কপালে একটি সিঁদুরের টিপ ছাড়া কিন্তু সাজের কোনো লক্ষণ চোখে পড়িল না। সুমন্ত্রকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া সে টেবিলের এক পাশে দাঁড়াইল। সুমন্ত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিনমস্কার করিল, পরে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল করিয়া বলিল, "আপনি বসুন।" মেয়েটি টেবিলের ওপাশে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল, আস্তে পাশের বুকর্যাক হইতে একখানা ছবির বই টানিয়া লইয়া নতনেত্রে নিবিষ্টমনে ছবি দেখিতে লাগিল। সুমন্ত্র খবরের কাগজটা পড়িতে ব্যস্ত ছিল, কেবল হঠাৎ পড়ার ফাঁকে এক নজরে ছবিটা দেখিয়া লইল। একটা অজগর একটা মহিষকে পাকের পর পাক দিয়া জড়াইতেছে, মহিষটা পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছে, তাহার অবস্থা কাহিল। মেয়েটিও ছবি দেখার ফাঁকে সুমন্ত্রর দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল; সুমন্ত্রর পাঠে মনোযোগের অভাব ছিল না, কেবল কাগজটা উল্টা করিয়া ধরা ছিল।

আরও মিনিট পাঁচেক কাটিল। দুই পক্ষই চুপচাপ। দ্বারপ্রান্তে একখানি সাদা থানের আঁচল দেখা গেল। সুকল্যাণী দেবীর কল্যাণমণ্ডিত মুখখানি একবার সুমন্ত্রের দৃষ্টিপথে পড়িল। পরক্ষণে তিনি দরজার আড়ালে সরিয়া গেলেন। মৃদুমধুর কণ্ঠে তাঁহার অনুযোগ আসিল, "আপনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন না?"

সুমন্ত্র সাহস পাইয়া মেয়েটিকে প্রশ্ন করিল, "আপনি কি পড়া ছেড়ে দিয়েছেন?"

মেয়েটি চোখ তুলিয়া বলিল, "না, পড়ছি তো। এবার ফিফ্‌থ ইয়ার হোলো।"

সুমন্ত্র বলিল, "আজ কলেজ যান নি?"

মেয়েটির মুখ ঈষৎ রক্তাভ হইল, সে চোখ নীচু করিয়া বলিল, "বেরিয়েছিলুম, মাঝপথে একটা অ্যাক্সিডেন্টের জন্য একটু আগে বাড়ি ফিরে আসতে হয়েছে।"

সুমন্ত্র ব্যস্ত হইয়া বলিল, "হাড়টাড় কিছু ভাঙেনি তো। দেখুন, আমি ফার্স্ট এড্‌ জানি, যদি কোন উপকারে লাগতে পারি তো বলবেন। ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে? তাহ'লে তো বড়োই অন্যায় হ'ল, আপনাকে এভাবে বসিয়ে রাখা! খুব লাগছে কি?"

মেয়েটি সলজ্জভাবে বলিল, "না, না, সেরকম কিছু নয়।"

দরজার পাশ হইতে মৃদু হাসির শব্দ শোনা গেল। সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "আর ব'লবেন না, মেয়েট আমার বড় তড়বড়ে! রোজ বাড়ি থেকে বেরোবে শেষ মুহূর্তে, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ট্রাম ধ'রবে। আজ রাস্তায় এক উড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছে।"

সুমন্ত্র হাসি চাপিয়া বলিল, "তা' ধাক্কা অমন আমরাও তো অনেক খেয়েছি, কিন্তু ক্লাশ কামাই ক'রে বাড়ি ফিরলেন কেন?"

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া বলিল, "তার মাথায় ছিল এক টিন আলকাতরা, ধাক্কা সামলাতে না পেরে সমস্ত আমার গায়ে ঢেলে দিয়েছিল। সে অবস্থায় কি ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া চলে? তেল দিয়ে সাবান দিয়ে তুলতেই এক ঘণ্টা গেল।"

সুমন্ত্র গম্ভীর হইয়া বলিল, "তাহ'লে তা'র খুব ক্ষতি ক'রে দিয়েছেন বলুন? কি ব'ললে?" পরক্ষণে কণ্ঠস্বর আরও নামাইয়া,—সুকল্যাণী দেবী শুনিতে না পান এরূপ স্বরে,—বলিল, "মারিলি তো মারিলি, ধক্কা মারিলি কাঁই!"

মেয়েটি অনুচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, বলিল, "তার ক্ষতিপূরণ করে দিয়ে এসেছি, আমারই কাপড় জামাগুলো নষ্ট হোলো। লংস্লীভ জামাটা সবে করিয়েছিলুম"—

কথাবার্তা সহজ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া সুকল্যাণী দেবী দরজার পাশ হইতে আর একবার উভয়কে স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। বোধ হয়, সুমন্ত্রর মুখ দেখিয়া এবং থালা দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহার ক্ষুধা মিটে নাই—আর কয়েকখানা লুচি ভাজিবার প্রয়োজন আছে।

সুমন্ত্র এইবার বলিল, "আমাকে আপনি কিছু প্রশ্ন করবেন না?"

মেয়েটি ছবি দেখিতে দেখিতে বলিল, "না।"

"কেন?"

"বিজ্ঞাপন দেখে মাল খরিদ করতে এসেছেন: পছন্দ হ'লে নেবেন, পছন্দ না হলে নেবেন না, এর মধ্যে আমার কি বলবার আছে?"

সুমন্ত্র বলিল, "আপনারাও তো মাল নিজেরা দেখে নেবার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন; সুতরাং অপরাধ একপক্ষের নয়।"

মেয়েটি এইবার আবার হাসিল। বলিল, "আজ চার বছর ধ'রে মার সঙ্গে টাগ্ অব ওয়ার চলছে জানেন? আমিও পড়া ছাড়ব না, মাও বিয়ে দেবে। বি-এ পাশ ক'রবার পর ব'ললে, 'আর কোনো কথা শুনব না।' ঘটক লাগিয়েছিল, ছু'টি মাস জ্বালাতন ক'রে মেরেছে। বড় বড় বনেদি ঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ এল প্রথমে। কেউ দশ হাজার চায়, কেউ বিশ হাজার চায়, কেউ বাবার উইল দেখতে চায়, কেউ আমাকে না দেখেই সম্পত্তির ফর্দ দেখতে চায়। গোড়ায় কারো সামনে বেরুতে চাইনি, মা কাঁদে। বেরোলুম তো, এ এসে বলে 'চুল খোলো,' ও এসে বলে 'পায়ের কাপড় তোলো',—এত অপমান লাগত! আপনি কিছু মনে করবেন না, অনেক বরপক্ষই মেয়েদের অপমান করতে পারলে ভারি খুশি হন দেখেছি। কেউ বললে, 'ছেলের ঠাকুরমার বয়সী,' কেউ ব'ললে 'তাল গাছ,' কেউ বললে, 'নাক বাঁশীর মত নয়', কেউ বললে, 'প্যাঁকাটি'! এক জমিদারগিন্নী এসে প্রশ্ন করলেন, ছেলেমেয়ে ক'টি? প্রথম পক্ষ, না, দ্বিতীয় পক্ষ।" বলিতে বলিতে সহসা অশ্রুভারে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

সুমন্ত্র বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন, অনর্থক আপনার মনে কষ্ট দিচ্ছি—ওসব আলোচনা থাক।"

মেয়েটি বলিল; "ওসবে সত্যিই খুব কষ্ট হয়নি, সব সহ্য করেছিলুম। কিন্তু শিক্ষিত ছেলেরা যখন এসে প্রশ্ন করে, 'স্মোক করি কিনা, ড্রিঙ্ক করি কিনা, কম্প্যানিয়নেট ম্যারেজে আপত্তি আছে কিনা, বল্‌ড্যান্স করতে জানি কিনা,' তখন কি জানি কেন—বড়ো অপমান বোধ হয়।" সহসা মেয়েটি তাহার চোখে চোখ রাখিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনি ক'টি মেয়ে দেখেছেন এভাবে?"

"একটিও না। এই প্রথম এবং যতদূর মনে হয় এই শেষ।"

মেয়েটি বলিতে লাগিল, "আমার এক পিসেমশাই আছেন, মা তাঁকেও হয়রান ক'রে ছেড়েছেন। অবশ্য আমারও দোষ ছিল, তিনি দোজবরে আই সি এস, পাগল প্রফেসার, মাতাল রাজা প্রভৃতি ভালো ভালো পাত্রের সন্ধান দিয়েছেন, তার মধ্যে একজন তো সর্বস্ব লিখে দিতে চেয়েছিলেন আমাকে দেখেই। আমাদের মত হয়নি। আজকাল তিনি আর বড় আসেন না, মা অনেক ক'রে বলাতে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়েছেন।"

বলিতে বলিতে মেয়েটি নিজের প্রগলভতায় নিজেই লজ্জিত হইয়া সহসা যেন থামিয়া গেল। মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আপনি কি ভাবছেন জানি না, এসব কথা সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনো পুরুষের কাছে এভাবে ব'লব, দু'দিন আগে আমি নিজেই ভাবতে পারতুম না। কেন কে জানে, আপনাকে বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছে করে।"

সুমন্ত্র দ্রুত চিন্তা করিতেছিল, সুদেষ্ণার এই কথার পুর্বেই সে নিজের কর্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছিল। এই সরল সুন্দর দেহমনের অধিকারিণীকে,—আজন্ম-সুখলালিতা ধনীর দুলালীকে,—সে তাহার নিরবচ্ছিন্ন দারিদ্র্যের মধ্যে,—গ্রামের কর্তব্যকঠোর কুটিরবাসে বা নগরের উঞ্ছবৃত্তির উপার্জননির্ভর পাইস-হোটেলের কদর্যতার মধ্যে,—টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। ইহাকে প্রতারণা করা তাহার পক্ষে মহাপাপ হইবে। এতক্ষণ অধিকাংশ সময়েই সে খবরের কাগজের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কথাবার্তা কহিতেছিল, এইবার সোজাসুজি মেয়েটির মুখের দিকে তাকাইল। হাঁ, রাজরাণী হইবার যোগ্য রূপ বটে। পরমুহূর্তেই সে নিজেকে সংযত করিয়া লইল, শান্ত অকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমাকে মাফ করবেন, আমি আপনার বিশ্বাসের যোগ্য নই। ভেবে দেখলুম এখানে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" .রর

মেয়েটির মুখের উপর কে যেন সপাং করিয়া এক ঘা চাবুক মারিল, ও মুহূর্তে তাহার সমস্ত মুখ রক্তশূন্য হইয়া গেল। পরমুহূর্তেই অপমানে, লজ্জ:সই ক্রোধে তাহার কান পর্যন্ত টকটকে রাঙা হইয়া উঠিল। সে একবার কি, যেন একটা প্রশ্ন করিতে গেল, কিন্তু খুব সম্ভবতঃ ইহার পর আর কথাটা বাড়াইতে তাহার রুচিজ্ঞানে বাধিল। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া নিঃশব্দে সুমন্ত্রকে, হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল। সুমন্ত্র বলিল, "যাবেন না, দাঁড়ান, একটা কথা বাকি আছে।" সুদেষ্ণা দাঁড়াইল। সুমন্ত্র বলিল, "আমি যে কত দরিদ্র,—আমার আর্থিক অবস্থা যে আপনার চেয়ে কত নীচে,—তা আপনি জানেন না। বিয়ের কথা কোনোদিন ভাবি নি, উপার্জনের চেষ্টা করা কোনোদিন প্রয়োজন ব'লে অনুভব করি নি। পিতৃ-পুণ্যে কলকাতায় একখানা ছোটো বাড়ি আছে, তারই নীচের দু'খানা ঘর ভাড়া দিয়ে একার পাইস-হোটেলের খরচটা কোনোরকমে চ'লে যায়। কয়েকবার চাকরী পেয়েছি, কোনোটাতে টিঁকে থাকতে পারি নি, শেষ

কাজটাও কিছুদিন পূর্বে গেছে। দেশের দশের কাজেই আনন্দ পাই, তাই করেছি এতদিন। চাকরী ক'রতে ভালো লাগে না। সুতরাং বিয়ে করাই আমার মতো লোকের পক্ষে পাপ, আপনার মতো মেয়েকে বিয়ে ক'রবার চিন্তা করাও আমার পক্ষে মহাপাপ। আমি আপনার যোগ্য নই। আমার আপনার পথ আলাদা, পরিবেশ আলাদা, দৃষ্টিভঙ্গীও আলাদা। কোথাও মিলবে না হয় তো।"

সুদেষ্ণা প্রশ্ন করিল, "তবে সব জেনেশুনে এসেছিলেন কেন? তামাসা দেখতে?"

সুমন্ত্র বলিল, "সত্যি কথা ব'লতে কি, আমি আপনার কথা কিছুই জানতুম না। এক বন্ধুর জন্যে বাড়ি খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। একজন ব'ললে, ল্যাম্পপোস্টের পাশে বাড়িটা ভাড়া আছে, তারই খোঁজ নিতে এসেছিলুম। আপনার মা'র সঙ্গে কথাবার্তা অনেকদূর এগোবার পর বুঝতে পারলুম ব্যাপারটা; কিন্তু তখন আর ফেরবার পথ দেখতে পাচ্ছিলুম না।"

মেয়েটির মুখ হইতে বিষাদের মেঘ কাটিয়া গিয়াছিল; বিস্ময় এবং কৌতূহলে পরিপূর্ণ দুইটি বড়ো বড়ো চোখ তুলিয়া সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুমন্ত্রের মুখের দিকে তাকাইয়াছিল। সুমন্ত্র বলিয়া চলিল, "বিশ্বাস ক'রবেন, এখানে এসে আপনাদের বাড়ির ঐ কাগজে ঐ বিজ্ঞাপন দেখার পূর্বে আমি কিছুই জানতুম না।"

"কিন্তু আপনি যে ব'ললেন, বিজ্ঞাপন দেখে এসেছেন?"

"ছেলেটি ব'ললে, বাড়িভাড়া; ভাবলুম নিশ্চয় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। নিঃসন্দেহ হবার জন্য জিজ্ঞেস ক'রেছিলুম, বিজ্ঞাপন দিয়েছেন কি না। উত্তর পাইনি।"

সুন্দর মুখখানি আবার আরক্ত হইয়া উঠিল, মেয়েটি চোখ নামাইয়া পায়ের নখ দিয়া মাটিতে দাগ কাটিতে লাগিল। সুমন্ত্র বলিল, "ইতিপূর্বে বহির্জগতের সমস্যা,—মানুষের দৈহিক দুঃখ, অপমান, দেশের দারিদ্র্য, পরাধীনতা,—এই সব নিয়েই বেশী মাথা ঘামিয়েছি, হৃদয়ের জগৎ বা মেয়েদের সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল কোনোদিনই ছিল না। আপনাকে দেখে হঠাৎ প্রথমটা সব গোলমাল হ'য়ে গেছল, মনে হয়েছিল মন্দ কি? কিন্তু আপনাকে যতই চিনছি, ততই মনে হচ্ছে, অন্যায় করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা ক'রতে চেষ্টা ক'রবেন,—আমার ক্ষণিক মোহ, পাঁচ মিনিটের দুর্বলতা

দিয়ে আমা আমি কিছু করিনি। ঘাড়টি হেঁট ক'রে বসেছিলুম, মুখ বুজে"—
করবার কে মুখ বুজে ব'সে থাকবার মেয়েই বটে তুমি। আচ্ছা, তুই কি
শেষদিক বড়ো হবি না? আমি মানুষকে ডেকে ডেকে আনব, আর তুই
করিয়া সুদে র ক'রে তাড়াবি? বল, ওকে কি বলেছিস, চ'লে যাচ্ছে কেন?
সুদেষ্ণা সহস ওকেই জিজ্ঞেস ক'রছি, কি হ'ল?"
সুমন্ত্র অ বলিল, "না, মা, তোমাকে যেতে হবে না, উনি যাচ্ছেন যান।
এক নিমেষে
কথা?" ী বাধা দিয়া বলিলেন, "যাব ব'ললেই অমনি চ'লে যেতে দেব?
মেয়েটি তুই আমার মেয়ে, আমার কাছে লুকোতে চেষ্টা করিসনি।
আপনার বন্ধু পছন্দ হয়েছে,—আমি বুঝতে পারছি।"
ভাড়া।" বলিল, "হ্যাঁ, তুমি সবই অমনি বুঝতে পারো। ও বিয়ে করবে
সুমন্ত্র িয়ে দেবেই। এওতো বড়ো জুলুম।"
বলিল, "এই ী বলিলেন, "তুই কি জিজ্ঞেস করেছিলি আগে বল। চটল কেন?"
সুদেষ্ণা বলিল, "তুমি বিশ্বাস ক'রবে না, তা' কি বলব? আমি শুধু
না, দরদস্তুর 'সুদেষ্ণা বানান করুন তো?' ঠিক বানান করলে, মূর্ধণ্য ষ
করেন কি?"।"
সুমন্ত্র এম এ পাশ করেছে, তোর চেয়ে বয়সে সাত আট বছরের
শালীর না তাকে ওকথা ব'ললে চ'টবে না?"
কাব্যচর্চা ক পাশ করেছে কিনা সেটা তো জেনে নিতে হবে? তোমার সেই
খোলা থাকা তে পাত্র তো পারেনি! মনে আছে? দস্যু সয়ে নয়ে বলেছিল।
সুদেষ্ণ র জিজ্ঞেস করলুম, কে ছিল জানেন? তাও ঠিক বললে, 'বিরাট
আমাদের ী'। জিজ্ঞেস করলুম সুমন্ত্র কে ছিলেন? তাও ঠিক বললে,
"ও রক ন্ত্রী এবং সারথি'! অবাক কাণ্ড!"
সুদেষ্ণা ী বলিলেন, "তোর জ্বালায় কি আমি পাগল হয়ে যাব?"
বৎসর ভাড় বলিয়া চলিল, "তারপর বললুম আপনি তো হিস্ট্রিতে এম এ,
মফঃস্বলে 'থার্ড ব্যাট্ল্ অফ প্ল্যাসি' কবে হয়েছিল? ঠকে গেল, ব'ললে,
শেষে তাড় াইনি।"
কাব্যচর্চা ক ী বলিলেন, "তুই এমনি করেই নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল
পড়ে, কেউ ইরকম বেহায়াপনা কি কোনো ভদ্রলোকে সহ্য করতে পারে?
কেউ প্রেম র কি কথা হ'ল?"

"আর কি কথা হবে? বিদ্যায় না পেরে তখন বলে কিনা, আপনার উড়ে-স্পর্শ-দোষ ঘটেছে, ছ'মাস প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আমি বললুম, বেশ, ততদিন আপনি আমাদের সামনের বাড়িতে নজরবন্দী থাকুন, আমরাও খোঁজ খবর নিই, আপনার কিছু স্পর্শ-দোষ ঘটেছে কিনা। এই নাও, ছ'মাসের বাড়ি ভাড়া আগাম দিয়েছে, ঐখানে থেকে ছ'মাস আমার সঙ্গে কোর্টশিপ চালাবে।"

সুকল্যাণী অবাক হইয়া বলিলেন, "কি বেহায়া হচ্ছিস, মা, তুই দিন দিন? বেচারী মেয়ে দেখতে এসেছে বলে তার কাছে ছ'মাসের বাড়ি ভাড়া আদায় ক'রলি? না না, আমাদের বাড়ি এসব বেলেল্লাগিরি চ'লবে না। এঁঃ, কোর্টশিপ ক'রতে দেবে, না আরো কিছু! যা, এখুনি টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আয়।" মেয়েটি তৎক্ষণাৎ টাকা ফেরত লইয়া আসিল; বলিল, "মা টাকা নিলেন না।"

সুমন্ত্রের ভীষণ হাসি পাইতেছিল। অনেক কষ্টে গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া বলিল, "কেন বলুন তো?"

মেয়েটি ভালোমানুষের মতো মুখ করিয়া বলিল, "কি জানি? মা'র বোধ হয় সন্দেহ হয়েছে, আপনার কোনো দুরভিসন্ধি আছে। মা'র আমার ঐ রকম। সকল তাতেই সন্দেহ। বলছেন, এল মেয়ে দেখতে, করছে বাড়ি ভাড়া, বলছে তিনকুলে কোথাও কেউ নেই, এ আবার কি? টাকাকড়ি কি চাই তার ফর্দ দিলে না, হীরের আংটি, খাট বিছানা, মোটর সাইকল, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, মেয়ের গায়ে দুশ' ভরি গহনা কিছুই চাইলে না, এ আবার কি রকম? একজনরা তো নমস্কারীই চেয়েছিলেন পাঁচ হাজার টাকার! চাইবে না? মা'র সন্দেহ হয়েছে আপনি যখন ছোটোখাটো কিছু চাইছেন না—তখন নিশ্চয় বড়োরকম কিছুর সন্ধানে আছেন! সামনের বাড়িতে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন সুযোগ সন্ধান জেনে তাঁর লোহার সিন্দুকটি লুঠ করবেন? হীরের গয়নার"—

দরজার ওপাশ হইতে সুকল্যাণী দেবীর ক্রুদ্ধ-কণ্ঠের ডাক শোনা গেল, "সুদেষ্ণা!"

সুদেষ্ণা বলিল, "ইনি টাকা ফেরত নিচ্ছেন না যে! কি করি?"

সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "না নেন, ঐখানে ফেলে রেখে চ'লে এস। দেখুন, আমাদের বংশে এ পর্যন্ত কারো কোর্টশিপ ক'রে বিয়ে হয়নি, সুদেষ্ণারও হবে না। আমার মেয়ে সুন্দর, প্রায় লক্ষ টাকার সম্পত্তি পাবে কমপক্ষে।

কত রাজরাজড়ার বাড়ি থেকে সম্বন্ধ এসেছে; আমাদেরই পাত্র পছন্দ হয়নি ব'লে দিতে পারিনি। আপনার যদি পছন্দ না হ'য়ে থাকে তবে আপনি যেতে পারেন। বাড়ি ভাড়া নিতে হবে না।"

সুমন্ত্র বুঝিল ভদ্রমহিলা মর্মান্তিক আঘাত পাইয়াছেন। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল, "আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি বড়ো গরীব, আপনাদের সঙ্গে আমার অবস্থার তুলনা হয় না। আপনার মেয়েকে বিয়ে করা আমার পক্ষে অন্যায় হবে ব'লেই আমি সে প্রস্তাবে রাজি হইনি। কোর্টশিপের কথা আমি বলি নি"—

সুকল্যাণী দেবী নরম হইয়া বলিলেন, "না, না, আপনার দোষ নেই, আমার মেয়েই বলেছে। ভারি ওটা বেহায়া হচ্ছে দিন দিন, ওর বাবা ওকে আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটি খেয়ে গেছেন। হ্যাঁ, তা আপনি নাকি উড়ে-স্পর্শ-দোষের কথা কি বলেছিলেন? তা দেখুন, ওসব সেকেলে লোকেরা বাছতেন। আপনারা শিক্ষিত ছেলেরাও যদি ঐসব ছোটো কথা নিয়ে মাথা ঘামান তাহ'লে কি চলে? আজকাল মেয়েরা স্বাধীন হয়েছে, পথে-ঘাটে ঘোরাফেরা ক'রতে অমন মাঝে মাঝে লোকের গায়ে গা ঠেকে যায় বই কি?"

"না, না, সে নিয়ে তো আমি কিছুই বলি নি, আপনার মেয়ে বোধ হয় আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করেছেন। আসলে আমার একটা বড়ো ভুল হ'য়ে গেছে। বাড়ি ভাড়া নিতে এসে বোঝবার ভুলে আমি এ-বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। আপনি প্রথমটা যখন আমাকে প্রশ্ন ক'রতে আরম্ভ করলেন, তখনই আমার একটু সন্দেহ হয়। তারপর আর পেছোবার পথ পাচ্ছিলুম না"—

সুকল্যাণী বলিলেন, "তবে যে সুদেষ্ণা ব'ললে বিজ্ঞাপন দেখে এসেছেন? আমরা তো বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন দিইনি।"

সুমন্ত্র বলিল, "ওটা আমার বলবার ভুল হয়েছে। পাড়ায় খবর পেলুম,—ভাবলুম হয়তো বিজ্ঞাপন দিয়েছেন?"

এইবার সুকল্যাণী দেবী অনুচ্চকণ্ঠে হাসিলেন; বলিলেন, "তা যা হবার হয়েছে; কিন্তু এত কথাবার্তার পর ও-বাড়িতে থাকা কি আপনার উচিত হবে?"

সুমন্ত্র বলিল, "আমি তো থাকব না, আমার একটি বন্ধু থাকবেন।"

সুকল্যাণী প্রশ্ন করিলেন, "তিনি কি করেন?"

"কিছু করেন না, বড়োলোক। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, তাই কিছুদিন নির্জন বাস করবেন।"

সুকল্যাণী বলিলেন, "কোনও গোলমাল নেই তো ভেতরে? সত্যি কথা বলতে কি, ঐসব অপদার্থ বড়োলোকের চেয়ে আমার গরীব পাত্রই পছন্দ। তাছাড়া, জীবনে অনেক কিছু দেখলুম কিনা! আমার এক সইএর দক্ষিণ-পাড়ায় বিয়ে হয়েছে রাজবাড়ীতে। হীরে-মুক্তোয় মুড়ে আছে, দাসী-চাকরের অন্ত নেই; কেবল স্বামী রাত্রে বাড়ি থাকেন না, চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে বাইরে যান। তবে স্ত্রীর হাতের রান্না তাঁর বড়ো পছন্দ। একা খেয়ে তৃপ্তি হয় না, তাই স্ত্রীকে টিফিন-কেরিয়ারে পঞ্চব্যঞ্জন সাজিয়ে দিয়ে দিতে হয়,—শুধু তাঁর জন্যে নয়—তাঁর উপসর্গটির জন্যেও!"

একটু থামিয়া সুকল্যাণী দেবী আবার বলিলেন, "সুদেষ্ণার বাবা যখন তার খাবার-পরবার ভাবনা রেখে যাননি, তখন কী দরকার আমার বড়োলোকে? আমি ওকে গরীবি চালেই মানুষ করেছি। আমি চাই একটি সদ্বংশের শিক্ষিত ছেলে, যে আমার মেয়ের মূল্য বুঝবে, তাকে অনাদর করবে না। আচ্ছা, আপনার বাবার নাম কি ছিল বলুন তো? কি করতেন তিনি? দেশ কোথায় বললেন যেন?"

সুমন্ত্র বলিল, "আমার বাবার নাম ৺সুদর্শন সেন। তিনি কিছুদিন বহরমপুর কলেজে প্রফেসারী করেছিলেন, তারপব কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেছেন। আমাদের দেশ বর্ধমান, সেখানে কিছু জমিজায়গা আছে, তবে আদায়-পত্র হয় না। বাবা কলকাতায় একটা ছোটো বাড়ি রেখে গেছেন।"

সুকল্যাণী দেবী দরজার আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন, "তুমি বহরমপুরের সুদর্শনবাবুর ছেলে? তোমার নাম মণ্টু? বহরমপুরে তোমাদের পাশের বাড়ির সবজজবাবুদের কথা মনে পড়ে?"

সুমন্ত্র বলিল, "খুব পড়ে। মাঝখানে একটা পাঁচিল ছিল, একটা পেয়ারা গাছের ডাল তার ওপর দিয়ে ও-বাড়ি থেকে এ-বাড়িতে এসে পড়েছিল। আমরা সেই ডাল ধ'রে ঝুলে ঝুলে গাছে উঠতুম পেয়ারা খেতে। একবার আমরা সাতজন ছিলুম, গাছে উঠতেই মড়মড় ক'রে ডাল ভেঙে পড়ল। কে কোথায় পালাল, অন্য ডালে বা পাঁচিলে লাফিয়ে উঠে বেঁচে গেল, আমি ঝুপ ক'রে প'ড়ে গেলুম নীচে মালীর সামনেই। মালী এই-মারে-তো-এই-মারে, টানতে টানতে নিয়ে গেল বাবুর কাছে।

ভদ্রলোক খুব লম্বা-চওড়া, সুন্দর চেহারা; আমাদের বাড়িতে বাবার কাছে মাঝে মাঝে দেখেছি তাঁকে। তাঁর স্ত্রী তো রোজ দুপুরে আমাদের বাড়ি আসতেন মা'র কাছে, আমরা তাঁকে 'সবজজ-মাসিমা' ব'লতুম। ভদ্রলোক আমাকে দেখে গম্ভীর মুখ ক'রে ব'ললেন,—'পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে কি হয়?' আমি ব'ললুম, 'চুরি করা হয়।' তিনি ব'ললেন, 'তুমি চোর? তুমি না সুদর্শনবাবুর ছেলে?' আমি ব'ললুম, 'এ তো আমার মাসিমার বাড়ি। মাসিমা কি পর?' তিনি বললেন, 'তাহ'লে সদর দরজা দিয়ে ঢুকে রান্নাঘরে যাওনা কেন, তোমার মাসিমা কত কি খেতে দিতে পারেন?' আমি বললুম, 'পাঁচিল ডিঙিয়ে উঠতে খুব মজা লাগে।' তিনি হেসে ব'ললেন, "বেশ, তাই উঠো; তবে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙো না। তুমিও জেলে যাবে, আমিও জেলে যাব তাহ'লে।"

সুকল্যাণী দেবী হাসিয়া বলিলেন, "আমি তোমার সেই মাসিমা, বাবা।"

"সে আমি বুঝেছি" বলিয়া সুমন্ত্র নত হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল। তিনি তাহার মাথায় হাত রাখিয়া মনে-মনে কি যেন আশীর্বাদ করিলেন, তারপর বলিলেন, "কিন্তু তোমার তো খুব মনে থাকে। তোমরা যখন ওখান থেকে চ'লে এলে তখন তো তোমার পাঁচ বছরও পূর্ণ হয়নি! তার বছর তিনেক পরে আমার মেয়ে হ'ল; তখনও তোমার মার সঙ্গে আমার চিঠিপত্র চ'লত। কি সুন্দর কবিতা লিখতেন তিনি— আর কি অদ্ভুত সেবা ক'রতে পারতেন লোকের বিপদে-আপদে! এত বয়েস হ'ল, কিন্তু তোমার মায়ের মতো অমন লক্ষ্মীপ্রতিমা বুদ্ধিমতী মেয়ে আমি আর জীবনে দেখলুম না। হ্যাঁ, যা বলছিলুম; তাঁকেই লিখি, আমার মেয়ের একটা নাম ঠিক ক'রে দিতে। তাতে তিনি লিখলেন, 'সুকল্যাণীর মেয়ে সুদর্শনাই হোক।' তাতে আমি ঠাট্টা ক'রে লিখি, 'দেখা হ'লে তো নাম ধ'রে ডাকতে পারবেন না, তখন কি ব'লবেন? 'কুদর্শনা' না 'নিদর্শনা'? যাই হোক, মেয়ের আমার সেই নামই ছিল বছর-তিনেক। তারপর উনি নিজেই নিজের নামকরণ করলেন। সুদর্শনা উচ্চারণ ক'রতে পারত না, ব'লত 'সুদেষ্ণা'। তখন ওর বাবা ব'ললেন, 'এই নামটাই বা মন্দ কি? ও স্বনামধন্যাই হোক।' আসলে ওর নাম কিন্তু তোমার মায়েরই দেওয়া, বাবা।"

সুমন্ত্র নতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "তুমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে বাবা, একটু বোসো।" সকলেই বাহিরের ঘরে বসিলেন। সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "সেই চিঠির মধ্যে তোমার মা কিন্তু আর একটি কথা লিখেছিলেন।"

সুমন্ত্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইল, তিনি বলিলেন, "লিখেছিলেন, 'আমার ছেলে যদি কখনও মানুষ হয় তাহ'লে আপনার মেয়েটিকে আমি নেব।' সুকল্যাণী দেবী স্থিরদৃষ্টিতে সুমন্ত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুমন্ত্র কাতরভাবে বলিল, "কিন্তু আমি তো মানুষের মতো মানুষ হ'তে পারিনি মাসিমা! না পারলুম দেশের উন্নতি ক'রতে, না পারলুম নিজের উন্নতি ক'রতে। দু'কূল গেছে আমার।"

"তুমি কি ক'রছ এখন?"

"কিছু না, সম্পূর্ণ বেকার। পাশ ক'রে দিনকতক ওকালতি করি। সুবিধে হ'ল না। তারপর একটা খবরের কাগজের সহ-সম্পাদক হয়েছিলুম কিছুদিন। কর্তৃপক্ষের অন্যায় হুকুম না মানতে পারায় মাসকয়েক পরে চাকরী ছাড়তে হ'ল। তারপর এক মার্চেণ্ট অফিসে ঢুকি। সেখানে এক আত্মীয়ের আগ্রহেই গেছলুম, দু'মাস কাটল না। আমার উপরওয়ালা সাহেব একদিন মদ খেয়ে এসে একজন বেহারাকে মুখ খারাপ ক'রে গালাগাল দিচ্ছিল, আমি বারণ করাতে আমার দিকে তেড়ে এল; ব'ললে, 'ইউ সন্ অফ্ এ বীচ্, হাউ ডেয়ার ইউ!' আমি বেশী কিছু না বলে একটি মোক্ষম ঘুষি মারলুম তার নাকে, তারপর সোজা বাড়ি চ'লে এলুম। ভেবেছিলুম পুলিশ কেস ক'রবে, কিছু ক'রলে না। এক মাসের মাইনে পাওনা ছিল, আর এক মাসের আগাম বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে বেয়ারা দিয়ে।"

সুকল্যাণী এবং সুদেষ্ণা উভয়েই মনোযোগের সহিত শুনছিলেন। সুদেষ্ণা মৃদু হাসিল, বলিল, "মোটে একটা ঘুঁষি?" সুকল্যাণী বলিলেন, "তা' যা'ই বলো বাছা, কাজটা ভালো হয়নি। অন্যায় দেখলে ব'লবে বই কি, তবে মুখোমুখি যা হচ্ছিল হচ্ছিল, হাতাহাতি করাটা অন্যায় হয়েছে। ধরো সায়েব, রাজার জাত, যদি জেল দিত?"

সুমন্ত্র বলিল, "সে দেয়নি, তবে পরে অন্য লোকে দিয়েছে। সে মার ধোর ছেড়ে দেবার পর লবণ আইন অমান্য ক'রে এবং খাজনা-বন্ধ আন্দোলন

ক'রে বারকয়েক রাজবাড়িতে ঘুরে এসেছি। গ্রামে গ্রামে অর্ধাহারে অনাহারেও কাটিয়েছি মাঝে মাঝে।"

সুকল্যাণী বলিলেন, "বোলো না, বাবা, বোলো না। শুনলেও কষ্ট হয়। আহা, মায়ের কত যত্নের ছেলে!" সুমন্ত্র বলিয়া চলিল, "গ্রামেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ক'রতে আরম্ভ করেছিলুম পুঁথিপড়া বিদ্যে নিয়েই, সে সঙ্গে বিনাপয়সায় মাস্টারি। কলকাতায় আসি শরীর বেশী খারাপ হ'য়ে প'ড়লে। তা'ছাড়া রোগীদের শুধু বিনা পয়সায় ওষুধ দিলেই চলে না, পথ্যও দিতে হয়, সেই পথ্যের পয়সাও যখন আর জুগিয়ে উঠতে পারি না, তখন অগত্যা কলকাতায় এসে এটা সেটা করি। ইন্সিওরেন্সের দালালিও করেছি কিছুদিন। বড্ড খোসামোদ ক'রতে হয়, পেরে উঠলুম না। কিছুদিন হ'ল সে কাজটাও ছেড়ে দিয়েছি। সম্প্রতি আমি বেকার।"

সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "তুমি যে দুর্ভাগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তা' না হলে এ-বয়সে অমন বাপ মা হারাবে কেন? তবে যেটুকু শুনলুম তা'তে অমানুষের কাজ কোনোটা করেছ ব'লে মনে হ'ল না।"

এমন সময় একটি বৃদ্ধ ভৃত্যশ্রেণীর লোক তামাক খাইতে খাইতে আসিয়া বৈঠকখানার দরজায় দাঁড়াইল। সুমন্ত্রের দিকে চাহিয়া তাহার কি মনে হইল কে জানে, হুঁকাটি দরজার চৌকাঠে ঠেস দিয়া রাখিয়া ঠিক তাহার সামনে মেঝের উপর দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিল। তাহার পর উবু হইয়া বসিয়া প্রশ্ন করিল, "বাবুর বারি কুনানো?"

সুমন্ত্র বলিল, "ক'লকাতাতেই।"

"ঠিক অইসে। বাবুর নাম?"

"সুমন্ত্র সেন।"

"ঠিক অইসে।" তাহার পর দরজার পাশ হইতে হুঁকা-কলিকা আনিয়া তামাকে আর এক টান দিয়া বলিল, "অয়, অউ জামাইয়ই ঠিক অইসে। কহ্ইন্যার লগে মানাইব।" তারপর একটা সুখটান দিয়া মন্তব্য করিল, "বাবুর মুখটা যেমন সান্দর লাখান্। তবে বয়স অইসে, আমার থনি থুরা বরোই অইব।"

সুকল্যাণী বলিলেন, "বাড়ির কাজ সমস্ত প'ড়ে আছে, তুমি যাও দিকি এখন। এখানে ব'সে টিপ্পনি কাটতে হবে না।" সুমন্ত্রর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমাদের চাকর—উদাসী। সিলেটে থাকতে আমাদের

বাড়ীতে ঢোকে, বহুকাল আছে। এখন উনিই আমাদের গতি। মনিব, বামুন, ঝি—সবাইকেই ওঁর কথা শুনে চলতে হয়।"

উদাসী বলির, "অয়, আমি ওইলাম কহ্ন্যা-কহ্র্তা। মা'রে অত করি কহ্ইলাম যে, একটা লগ্গুণ দিলাও, তা দিল না। অয়, তা' আমি অন্যায় কইলাম কি তা? এখন আমারে কিতা দিবায় কও।"

সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "তুমি যাও না 'বাপু' এখান থেকে।"

সুদেষ্ণা বলিল, "উদাসী দাদা, তোমার বিয়ের গল্পটা বলব?"

উদাসী বলিল, "কইবা কও? পুরিটা বরো প্হাজি!"

সুদেষ্ণা বলিল, "বন্ধুর বিয়েতে কন্যেপক্ষ বলে বাজনা চাই। ওর এক বন্ধু ছিল—ওরই মত গরীব। সে একটা কাঁসি চেয়ে এনেছিল কার বাড়ী থেকে, ওকে বলেছিল, আমার বিয়েতে তুই বাজনা বাজা, তোর বিয়েতে আমি বাজাব। সে টোপর মাথায় দিয়ে হেঁটে গেছে, আর ও-বেচারী তার পেছন পেছন কাঁসি পিটতে পিটতে গেছে সারা রাস্তা, আশায় আশায়। তার দু'বছর পরে ওর বিয়ে ঠিক হ'ল, আর ঠিক সেই সময় ওর বন্ধুর হ'ল কলেরা। ওর বিয়েতে বাজনা আর হ'ল না।"

উদাসী উষ্ণ হইয়া কহিল, "আমার অন্যায় অইল কিতা? হে হালা মরিয়া আমারে ঠহাইল, আমার অপহ্রাদ অইল কিতা?" সে গজ গজ করিতে করিতে উঠিয়া গেল, সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

হাসি থামিলে সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "কিন্তু তোমার বাবার তো শেষদিকে বেশ ভালোই প্র্যাক্টিস হয়েছিল শুনেছিলুম, তোমার তো অর্থকষ্ট হবার কথা নয়, বাবা।"

সুমন্ত্র বলিল, "হ্যাঁ, তা হয়েছিল। কিন্তু মা মারা যাবার পর তিনি ওকালতি ছেড়েই দিয়েছিলেন একরকম। শেষদিকটা ক'বছর জমানো টাকা ভেঙে খরচ হয়েছে। তারপর বোনের বিয়ে দিতে হয়েছে, দান ধ্যানও ছিল খুব। কিছুই প্রায় রেখে যেতে পারেননি। বাড়ি কেবল একখানা আছে মাথা গোঁজবার মতন—একশ' তিপ্পান্ন নম্বর পটলডাঙা স্ট্রীটে। টাকা নগদ যাও-বা সামান্য ছিল, আমার গ্রামের কাজে শেষ হ'য়ে গেছে। অবশ্য সে এমন কাজ যে, ক্রোড়টাকা রেখে গেলেও ফুরিয়ে যেত। অল্প ছিল, অল্পই গেছে।"

সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "ঐ যাঃ, তোমার জন্যে আর ক'খানা লুচি ভাজছিলুম, সব ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল এতক্ষণে। তুমি একটু বোসো বাবা, আমি খাবারটা নিয়ে আসি। আচ্ছা, সত্যি বলো তো, তোমার কি আজ দুপুরে ভাত খাওয়া হয়েছে ?"

সুমন্ত্র বলিল, "হয়নি বটে, তবে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। আপনি কিছু ভাববেন না।"

সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "ছ্যাখো দিকি, দেড়টা বাজে। যাই, তোমার নাম ক'রে করেছি, ও ক'খানা তুমি না খেলে বড্ড মন কেমন ক'রবে। তুমি দু'মিনিট বোসো।" বলিতে বলিতে তিনি দ্রুত চলিয়া গেলেন।

সুদেষ্ণা বলিল, "বুনলুম সরষে, হ'ল তিল, ফ'লল রুদ্রাক্ষ, খেলাম কিল।"

সুমন্ত্র হাসিয়া বলিল, "তার মানে ?"

"মানে আর কি রেখেছেন ? দেখে মনে হ'ল পাত্রপক্ষ, দাঁড়াল ভাড়াটে, কথা কইতে বেরোল সাতপুরুষের কুটুম ; এখন মা'র যে রকম বাৎসল্য-রসের বান ডেকেছে, তাতে আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে আপনাকে না পুষ্যিপুত্তুর নিয়ে বসেন। আমার রোমান্সটা মাঝ থেকে মাঠে মারা গেল। যাই, এখন ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে। আপনার জন্যে মা লুচি ভাজছে, দেখি তা'তে ভাগ বসাতে পারি কিনা।"

সুমন্ত্র বলিল, "আপনি সবটাই খেতে পারেন, আমার"—

"পাইস-হোটেল আছে, কি বলুন ? যত্ন করছেন, নিতে দোষ কি ? আমায় কেউ এতটুকু যত্ন ক'রলে আমি তার কেনা গোলাম হ'য়ে থাকি।"

সুমন্ত্র বলিল, "আমিও থাকতুম, শুধু তাঁর নয়, তাঁর মেয়েরও ; কিন্তু যেখানে স্নেহের সঙ্গে গরীবের প্রতি ধনীর দয়া মেশানো থাকে, সেখানে সেই স্নেহের প্রতি লোভ ক'রলে নিজের কাছে ছোটো হ'য়ে যেতে হয়, সুদেষ্ণা দেবী !" সুদেষ্ণা বলিল, "এটা আপনার ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্সের ফল। আপনাকে দয়া আমরা করিনি। আপনার দারিদ্র্য স্বেচ্ছাবৃত,—দয়ার পাত্র আপনি নন। আর ধনীমাত্রেই খারাপ লোক না-ও হতে পারে ; হয়তো সকলে কিছু করবার সুযোগ পায় না—সুমন্ত্র বাবু, কিন্তু মহতের মহত্ত্বটুকু বোঝবার শক্তি অন্ততঃ তাদের মধ্যে কারো কারো থাকতে পারে।"

সুদেষ্ণা দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মিনিট কয়েকের মধ্যে সুকল্যাণী দেবী একখানি বিরাট কাঁসার থালায় খানকুড়ি ফুলকো লুচি এবং কতকগুলি আলুভাজা ও বেগুনভাজা লইয়া প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "তাড়াতাড়িতে আর কিছু হ'ল না; তুমি ঘরের ছেলে, কিছু মনে করবে না জানি।"

সুমন্ত্র বলিল, "আমি কি রাক্কোশ! এ কি করেছেন? এই একটু আগে একপেট খেয়ে—"

সুকল্যাণী বলিলেন, "ক'রতে আর সময় পেলুম কোথায় বাবা? বেলা দুটো বাজে, এখনও ভাত খাওনি; এ ক'খানা খুব খেতে পারবে।" অগত্যা সুমন্ত্র থালাখানা নিঃশেষ করিয়াই ফেলিল। হাত-মুখ ধুইয়া সে সুকল্যাণী দেবীর পদধূলি লইয়া বলিল, "তাহলে বাড়ি ভাড়া দেবেন না?"

সুকল্যাণী বলিলেন, "তুমি ব'লছ তোমার বন্ধুর জন্যে, তাই টাকাটা হাত পেতে নিচ্ছি। তোমার টাকা হ'লে নিতুম না। যাই হোক, তুমি কিন্তু আসবে মাঝে মাঝে।"

সুমন্ত্র ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে আসিবে।

"তাহ'লে একটা রসিদ দিয়ে দিতে বলি?"

"তার জন্যে তাড়াতাড়ি কি? তিনি এসেই নেবেন। আপনি কেবল চাবিটা দিন। কাল সকালে তাকে নিয়ে এসে হয়তো গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ে যেতে হবে। বাড়িটাও ধুইয়ে মুছিয়ে সাফ করিয়ে দিয়ে যাব।"

সুমন্ত্রের হাতে একটা চাবি দিয়া সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "সে তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি কাল সমস্ত নিজে দাঁড়িয়ে সাফ করিয়েছি। তাহ'লে এক কাজ করো না? কাল তো রবিবার আছে, তোমরা দুজনেই না-হয় এখানে খাবে?"

সুমন্ত্র বলিল, "সে কখন এসে পৌঁছোবে তার তো ঠিক নেই। তারপর তার কি কেনা-কাটা আছে, তাতে কতক্ষণ লাগে কে জানে? শূন্যহস্তে তো বাড়ি থেকে চ'লে এসেছে। আপনি কোনো ব্যবস্থা রাখবেন না। কেন অকারণ নষ্ট হবে?"

সুকল্যাণী বলিলেন, "কয়েকখানা তক্তাপোষ ও-বাড়িতে আছে, শুধু বিছানা আনলেই চলবে। কি জানি, বাছা, আমার কেমন ভালো লাগছে

না। তুমি তো বাড়ি না দেখেই ভাড়া নিচ্ছ, শেষে যদি তাঁর পছন্দ না হয়।"

"না হ'লে আমি নিজেই নেব, আপনি ভাববেন না" বলিয়া সুমন্ত্র বাহির হইয়া গেল। সুকল্যাণী দেবী বুঝিলেন, ঔষধ ধরিয়াছে।

সেদিন সারা বৈকালটা সুমন্ত্র বাড়ির বাহির হইল না। বহুদিনপরে হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল, বাড়িটা বড়োই নোংরা হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইল সুমন্ত্র চাকর রাখে না, নিজের হাতেই বাড়ির কাজ সমস্ত করে। এ কয়দিন সারাদিন পথে পথে ঘোরায় বাড়িতে সে বাসিঝাঁট দিবার সময় পায় নাই। একতলার বাহিরের ঘর দুইখানি ভাড়া খাটিত, তাহা ছাড়া নীচে দুইখানি এবং উপরে তিনখানি ঘর ছিল। প্রায় ঘণ্টাচারেক পরিশ্রম করিয়া সে সিঁড়িটা এবং উপরতলার খোলা দু'খানা ঘর ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া সাফ করিল। তারপর দোতলায় যে ঘরটিতে সে পড়াশুনা করিত তাহার মেঝেতে সতরঞ্চের উপর একখানা ফরসা চাদর বিছাইয়া ফুলদানীটাকে মাজিয়া চকচকে করিয়া নিজে স্নান করিয়া কয়েকদিন পরে আরসির আলমারিটার সামনে দাঁড়াইয়া দাড়ি কামাইতে কামাইতে গান ধরিল 'লক্ষ্মী যখন আসবে—তখন কোথায় তারে দিবিরে ঠাঁই?'

এমনসময়ে কে বাহিরের দরজায় কড়া নাড়িল, 'খট খট খট।' 'কে? ভদ্রেশ্বর আসিল নাকি?' মোটরের শব্দ শোনা গেল "ভঁপ ভঁপ অ-ভঁ-অ-প।" সুমন্ত্র জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল একখানা প্রকাণ্ড ঘি-রঙের মোটর তাহারই দরজায় দাঁড়াইয়া আছে, ভিতর হইতে একটি মেয়ের শাড়ির আঁচলের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। কি বিপদ? সুদেষ্ণাদের কি মোটর আছে? তা' হইলে হাঁটিয়া কলেজে যায় কেন? আর কেহ আসিল না তো? এখন উপায়? দাড়ির একটা দিকও তখন পুরা চাঁছা হয় নাই। এ অবস্থায় ভদ্রমহিলার,—তা তিনি যিনিই হউন না কেন, তাঁহার,—সম্মুখে যাওয়া যায় কি করিয়া? অথচ তাহার দাড়ি কামাইতে বেশ একটু দেরীই হয়; বিশেষ করিয়া দিনের আলো কমিয়া আসিতেছে, এখন বিশেষ সাবধানে কামানো প্রয়োজন। ততক্ষণ ভদ্রমহিলাকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া রাখাটা কি উচিত হইবে? কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সুমন্ত্র প্রথমে তাহার দাড়ি কামাইবার—ক্ষুর, সাবান, শেভিং ব্রাস—সমস্তই মেঝেয় বিছানো ফরাসের তলায় গুঁজিয়া দিল, কারণ ধুইয়া মুছিয়া যথাস্থানে তুলিয়া রাখিবার সময় ছিল না। তারপর বুদ্ধি

করিয়া একটা বড় রুমাল লইয়া দাড়ি ও গালে ঢাকা দিয়া মাথায় জড়াইয়া বাঁধিল। তারপর পাঞ্জাবীটা গায়ে গলাইতে গলাইতে চটি পায়ে দিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

দ্বার খুলিতেই উর্দিপরিহিত শোফার সেলাম দিল ; বলিল,

"মেমসা'ব আয়ী হ্যাঁয়।"

সুমন্ত্র একটা নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস রোধ করিয়া হাসিমুখে অপ্রত্যাশিত অতিথি মিসেস কুণ্ডুকে সম্বর্ধনা জানাইল এবং পথ দেখাইয়া উপরে লইয়া গেল। মিসেস কুণ্ডুর সঙ্গে প্রথম দিনের পরিচয়ের প্রথম দিকটায় সে তাঁহার যে স্বাভাবিক রূপ দেখিয়াছিল, পতিবিয়োগসম্ভাবনাব্যাকুল সতী-হৃদয়ের যে অকৃত্রিম সৌন্দর্য সেদিন সহসা তাহার চোখে পড়িয়াছিল, আজ খানিকটা নৈশ্চিন্ত্য ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সে রূপ অন্তর্হিত হইয়াছে ; লিপস্টিক, ক্রীম, পেণ্ট, পাউডার প্রভৃতির মধ্য দিয়া সত্যকার মানুষটিকে আর চেনা যায় না। যেন কোনো নাট্যশালায় অভিনয় করিতে করিতে ভদ্রমহিলা হঠাৎ বাহির হইয়া আসিয়াছেন। কেবল বেশে-বাসে নয়, কথায় এবং ব্যবহারে তাহার অভিনয়ের কৃত্রিমতা সুমন্ত্রকে পীড়া দিতেছিল। হায়, ইহারই জন্য কি সে সারা বৈকালটা ধরিয়া সযত্নে বাড়ি সাজাইয়াছে? ইহাকেই বলে 'উল্টা বুঝলি রাম'!

মিসেস কুণ্ডু উচ্চকণ্ঠে হাসিতে হাসিতে গাড়ি হইতে নামিলেন। মাথাটা ঈষৎ কাৎ করিয়া সুমন্ত্রর মুখের বিব্রত ভাবটা আধ মিনিটকাল উপভোগ করিলেন। তারপর মন্তব্য করিলেন, "কট্!"

প্রথমটা সুমন্ত্র ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল। এ কি বলে রে বাবা? তান্ত্রিক মন্ত্র আওড়াইতেছে নাকি? স্বামীশোকে মাথা খারাপ হইয়া গেল? পরক্ষণেই মনে পড়িল, ভূধরবাবুর ক্লাসের 'ক্যাচ কট, কট'। ঠিক। ইংরেজিই বলিতেছে, ভয়ের কারণ নাই। এবার মিসেস কুণ্ডু উচ্চতর কণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন, "কেমন ধ'রে ফেলেছি? যাবেন ব'লে গেলেন না যে?"

অভিমানের পর বিস্ময়ের সুর আসিল, "আপনার গালে কি হ'ল? আই হোপ, নথিং সিরিয়স? অ্যাবসেস? পুলটিস দিচ্ছেন?"

সুমন্ত্র হাসিয়া বলিল, "ও কিছু না, একটু ব্যথা হয়েছে, সেরে যাবে।"

"নো, নো, ইউ মাস্ট বি ভেরী কেয়ারফুল।"

মিসেস কুণ্ডু সুমন্ত্রের পিছন পিছন দোতালায় উঠিয়া তাহার পড়িবার ঘরে সন্ত-বিছানো ফরাসের উপর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "মাই গুডনেস। কি কামড়াল ?"



মাই গুড্‌নেস! কি কামড়ালো ?

সুমন্ত্র ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ও কিছু না, আমার ক্ষুর। বেশি লাগেনি তো? না, না, কাটবার ভয় নেই; মধ্যে মাতুর আছে, সতরঞ্চিও আছে, চাদর আছে"—

মিসেস কুণ্ডু নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছিলেন না। বলিলেন, "রেজর? মাই! দেখুন দিকি কাণ্ড! বিছানার তলায় মানুষে 'রেজর' পুরে রাখে?" তিনি দাঁড়াইয়াই রহিলেন।

সুমন্ত্র ফরাস তুলিয়া জিনিসপত্র সরাইতেছিল, অনুতপ্ত হইয়া বলিল, "আমি কি একটা মানুষ?"

মিসেস কুণ্ডু চেয়ারের অন্বেষণে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন; সুমন্ত্রের মন্তব্যে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এক্সকিউজ মি, মিস্টার সেন,—আই মিন সুমন্ত্রবাবু, আপনাদের বাড়িতে কি বসবার আর কোনোরকম 'অ্যারেঞ্জমেণ্ট'—মানে ব্যবস্থা নেই? অর্থাৎ চেয়ার-টেয়ার? আই ডোণ্ট থিঙ্ক, দে কস্ট মাচ্?"

সুমন্ত্র অপ্রস্তুতভাবে বলিল, "আপনার কষ্ট হ'ল বুঝতে পারছি। আগে জানতে পারলে ব্যবস্থা রাখতুম। আমাদের তেমন প্রয়োজন হয় না। নিন, বসুন, আর কোনো ভয় নেই।"

মিসেস কুণ্ডু বলিলেন, "ভরসাও নেই। যে রকম স্বদেশী ব্যাপার দেখছি!" বলিতে বলিতে তিনি আবার হাসিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই অতি সন্তর্পণে জুতা ফরাসের বাহিরে রাখিয়া প্রথমটা হাঁটু গাড়িয়া এবং ক্রমে সম্পূর্ণরূপেই পা মুড়িয়া বসিয়া পড়িলেন। সুমন্ত্রও একটু দূরে ফরাসের উপর বসিল।

মিসেস কুণ্ডু এইবার মুখখানাকে অস্বাভাবিকরূপে গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "আমার এভাবে 'উইদাউট এস্‌কর্ট' আসাটা আপনি বোধ হয় 'লাইক'

করেন নি? আপনি কি 'ব্যাচিলর'? আই সি! তাই এই রকম অবস্থা। আমি অবশ্য পূর্বে জানতুম না! 'হাউ এভার', আই হ্যাড নো আদার অল্টারনেটিভ, মিঃ সেন,—'আই মিন' সুমন্ত্রবাবু,– এছাড়া আমার আর পথ ছিল না। ইউ আর দি ওন্‌লি পারসন, আপনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি আমার 'হাসব্যাণ্ডের হোয়্যারঅ্যাবাউটস্' জানেন। না, না,—লেট মি ফিনিশ',—আমাকে শেষ ক'রতে দিন। সুতরাং—আমার 'মেণ্ট্যাল অ্যাংজাইটির' কথা বিবেচনা ক'রে আপনি নিশ্চয় আমাকে 'এক্সকিউজ' ক'রবেন,—'অ্যাট লিস্ট আই হোপ সো'—অন্ততঃ আমি তাই আশা করি। তা'ছাড়া মিস্টার কুণ্ডুর কাছে আপনার কথা যেটুকু শুনেছি, তা'তে আমার ধারণা হয়েছিল—'ইউ ক্যান বি ট্রস্টেড'—আপনাকে বিশ্বাস করা চলে। 'ইউ ওয়্যার দি ওনলি বয়'—ওঁদের ক্লাসে আপনিই নাকি একমাত্র ভালো ছেলে ছিলেন,—যিনি 'লাস্ট বেঞ্চের' ছেলেদের সঙ্গে মিশতে লজ্জাবোধ ক'রতেন না। আপনার বাড়িতে একা এসেছি শুনলে আপনার 'ফ্রেণ্ড' নিশ্চয়ই কিছু 'মাইণ্ড' ক'রবেন না।"

মিসেস কুণ্ডু জুতা খুলিয়া ভালো করিয়া বসিলেন।

সুমন্ত্র বলিল, "আমরা কেউ কিছু মনে ক'রব না, আপনি কেন ভাবছেন?"

মিসেস কুণ্ডু বলিলেন, "আপনার ফ্রেণ্ডের এদিক নেই, ওদিক আছে কিনা! 'জেলাসি'টি আছে ষোলো আনা। হ্যাঁ, আপনার 'অ্যাড্রেস' পেলুম কোথায়? সেদিন জিজ্ঞেস ক'রে নিতে ভুল হ'য়ে গেছল, আপনি বেরিয়ে যাবার পর মনে প'ড়ল। অনেককে জিজ্ঞেস ক'রলুম, টেলিফোন-গাইডে দেখলুম,—একটা ফোন রাখেন না কেন? হাল ছেড়েই দিয়েছিলুম। আজ বিকেলে ওঁর চেনাশোনা বন্ধুবান্ধব,—যাঁদের ঠিকানা জানি,—সকলের কাছে সন্ধান নেওয়া শেষ ক'রে ওঁর একটা পুরোনো ঠিকানার খাতা ঘাঁটছিলুম, হঠাৎ দেখি তাইতে আপনার ঠিকানা। তেরো বছর আগেকার ঠিকানা অবশ্য, এতদিন পরে এ-বাড়িতে পাব আশা করিনি। তবু 'আই টুক দি চান্স', যদি পাই ব'লে কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়লুম। 'অ্যাণ্ড আই অ্যাম লাকি!' আমার ভাগ্য নিতান্ত ভালো—তাই ধ'রতে পেরেছি। যাই হোক, আপনি গেলেন না কেন, তাই বলুন? আমি অন্য সমস্ত 'এনগেজমেণ্ট' ক্যান্সেল ক'রে দিয়ে ক'দিন ধ'রে আপনার জন্যে 'ওয়েট' করেছি। 'গুডনেস', কেবল বাজে কথাই ব'কছি। 'এনি নিউজ',—আপনার ফ্রেণ্ডের নতুন খবর কিছু আছে?"

সুমন্ত্র বলিল, “সন্ধান পেয়েছি, সে কাশী যায়নি। ক’লকাতার কাছেই একটা কোনো গ্রামে আছে বোধ হয়। এখনও সন্ন্যাস নেয়নি, যিনি দেখে এসেছেন, তিনি ব’ললেন, ওজন কিছু কমেছে, জামা-কাপড় ঠিকই আছে। আমার না যাবার তো কোনো কারণ নেই, এখনও কিছু ঠিক করে নি সে। একটা পাকা খবর পেলেই আপনার কাছে যেতুম।”

মিসেস কুণ্ডু ইলেকট্রিক ফ্যানের সন্ধানে উর্ধ্বে ব্যর্থ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “উপস্থিত মহম্মদ না যাওয়ায় পর্বতই এসে হাজির হয়েছে।” বলিতে বলিতে নিজের রসিকতায় নিজেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

সুমন্ত্র আশ্বাস দিয়া বলিল, “না, না, আপনাকে পর্বত বলা চলে না, একটু পরিপুষ্ট, ইংরেজিতে যাকে বলে ‘প্লাম্প’। আমি অবশ্য ভদ্রেশ্বরের কথা শুনে আপনাকে আরো একটু”—

শ্রীমতী কুণ্ডু হাসিয়া বলিলেন, “আপনার কাছেও নিন্দে ক’রে গেছেন তো? আর ব’লবেন না, তেষট্টি পাউণ্ড ওজন বেড়েছি তিন বছরে, তাই আর সহ্য হচ্ছে না, খুঁড়ে খুঁড়ে শেষ ক’রলেন। তা’ পোড়ার শরীর একটু টসকায়ও না তো? এত ক’রে আঙ্গপেটা খেলুম, মিষ্টি খাওয়া ছাড়লুম”—

এতক্ষণে প্রাণের কথা বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় বাহির হইল।

সুমন্ত্র বলিল, “না, না, ও-সব ক’রবেন না, স্বাস্থ্য ভেঙে যাবে। তা’ছাড়া ভদ্রেশ্বর নিজে তো ঐ! সে কোন্ মুখে আপনাকে খোঁড়ে?”

শ্রীমতী কুণ্ডু বলিলেন, “বলুন তো! ওঁর তো আবার কাঠখোট্টা রসিকতা জানেন। কীর্তনের সুরে এক গান বেঁধেছেন—‘আমি শুটকী দেখিয়া বিবাহ করিনু মুটকী হইয়া গেল’।” বলিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “সত্যি তখন বেশ স্লিম ছিলুম—আমি বিয়ে-এ পড়তে পড়তে আমার বিয়ে হয় কিনা। ওঁর তো বিদ্যে জানেন? ‘উনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে ঘায়েল হ’য়ে থামল শেষে’।” বলিতে বলিতে আবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, “মোটে দু’বার ফেল ক’রেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাড়ীতে তো ও-সব পাঠ ছিল না, আমি আসার পর অ্যাটমসফিয়ার কিছুটা ব’দলেছে উপস্থিত। হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল। ওঁর ‘আর-একবার-ডাকিলেই-খাইব’ গোছের অবস্থা কি? আমি চুপ ক’রে ব’সে থাকলে নিজেই ফিরবেন ব’লে মনে হয় দু’চার দিনের মধ্যে?”

সুমন্ত্র বলিল, "ফিরবে, তবে তা'র রাগ পড়েনি। আপনার সঙ্গে থাকবে না, ভিন্ন হবে। আমাকে একটা বাড়ি ভাড়া ক'রতে লিখেছে। ভেবে দেখলুম, তা'র মানসিক চিকিৎসার পক্ষে এখন দিনকতক আলাদা থাকাই ভালো। বাড়ি আমারও রয়েছে একটা দেখছেন তো, কিন্তু সে এখানে থাকবে না। যাই হোক, এইদিকেই একটা বাড়ি ভাড়া করেছি,—ছ'মাসের ভাড়া আগাম দেওয়া হ'য়ে গেছে।"

মিসেস কুণ্ডু বলিলেন, "তাঁকে সেপারেট থাকতে দিচ্ছি কিনা? হাউস্ রেণ্ট অ্যাড্ভান্স দেওয়া হ'য়ে থাকে, কিছু আক্কেল-সেলামী যাবে তাঁর।"

সুমন্ত্র বলিল, "আপনি বুঝতে পারছেন না, গোড়ায় একটু আল্গা দেওয়া ভালো। বিরহে এবং অযত্নে কিছুদিন কষ্ট পেয়ে যখন ঠিক ধাতে আসবে তখনই আপনাকে খবর দেব। আমার নাম ক'রবেন না, আপনি যেন অন্য কা'রো কাছে খবর পেয়েছেন—এইভাবে একদিন গিয়ে পড়বেন। আমি ব'লে দিয়েছি জানলে সে আমার মুখদর্শন ক'রবে না কিন্তু।"

মিসেস কুণ্ডু বলিলেন, "বন্ধুকে বিট্রে যখন ক'রবেনই তখন আর মিথ্যে দেরী ক'রছেন কেন, মিস্টার সেন? আপনি মিথ্যে কথা ভালো ক'রে ব'লতে পারেন না, আপনার মুখ আপনাকে বিট্রে করে। আপনি ঠিক জানেন, এই মুহূর্তে তিনি কোথায় আছেন। দয়া ক'রে আমাকে নিয়ে চলুন! আমার কি-ভাবে দিন কাটছে আপনি বুঝতে পারছেন না। সারভেণ্টদের কাছে পর্যন্ত আমার মুখ দেখাতে লজ্জা করে।" বলিতে বলিতে তিনি নাকে চোখে আলতোভাবে রুমাল ঠেকাইলেন। সুমন্ত্র এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করিল, তারপর বলিল, "আমি ঠিকানা জানি সত্যি, কিন্তু বাড়ি জানি না। তবে খুঁজে বার ক'রতে পারব মনে হয়।"

"বেশ, তাহ'লে চলুন।"

"এখনি? এই সন্ধ্যেবেলা!"

"আমার 'কার' সঙ্গে আছে, ভয় কি?"

"তা' বটে। তা'হ'লে আমাকে একটু"—

শ্রীমতী কুণ্ডু বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি, আপনি 'শেভ' করাটা শেষ ক'রে নিন। গালে রুমাল বেঁধে অসুবিধে হচ্ছে।" এইবার উভয়েই উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। সুমন্ত্র দাড়ি কামাইয়া প্রস্তুত হইলে শ্রীমতী কুণ্ডু আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আপনার ভয় নেই, বাড়ির সন্ধান পেলেই আপনাকে

দূর থেকে বিদায় দে'ব।" উভয়ে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিলেন। সুমন্ত্র বলিল, "তা দেবেন বই কি! 'আমে দুধে এক হয়, আঁদাড়ের আঁটি আঁদাড়ে যায়'। মোটরে চ'ড়ে যাব, হোঁচট খেতে খেতে ফিরব।"

উভয়েই আবার উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে শ্রীমতী কুণ্ডু বলিলেন, "সে কি কথা? আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাব। তারপর একদিন আপনাকে নিয়ে পার্টি ক'রব আমাদের বাড়িতে। যা খেতে ভালোবাসেন"—

সুমন্ত্র বলিল "এটা কিন্তু আমাকে অপমান করা হ'ল। মিষ্টান্ন ইতরের জন্যে,—শাস্ত্রে আছে। তা আপনি যা-খুশি বলুন। ভদ্রেশ্বর বাড়ি ছেড়েছে ব'লে আমি বাড়ি ছাড়ছি না।" উভয়ে হাসিতে হাসিতে আসিয়া মোটরে উঠিল।

সুদেষ্ণা সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত দোতলার ঘরে একটা বই মুখে দিয়া বসিয়া রহিল। পিতা বর্তমানে সে বাহিরের ঘরে বসিয়াই পড়াশোনা করিত এবং কেহ আসিলে দরজা খুলিয়া দেওয়ার কাজটা তাহার প্রায় একচেটিয়া ছিল, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর বাড়িতে কোনো পুরুষ অভিভাবক না থাকায় সুকল্যাণী তাহার নীচের ঘরে নিয়মিত বসা বন্ধ করিয়াছিলেন। আজকাল দরজা খুলিয়া দেয় সাধারণতঃ উদাসী; সে ঘুমাইলে বা বাড়িতে না থাকিলে এবং দুপুরে ঠাকুর এবং ঠিকা ঝি উভয়েই অনুপস্থিত থাকিলে আজকাল কদাচ কখনও সুদেষ্ণাকে দরজা খুলিতে হয়। আজ এমনই একটা পরিস্থিতিতে দরজা খুলিতে গিয়া কি জানি কি একটা বিপর্যয়কাণ্ড হইয়া গেল, সারা দিন ধরিয়া কেমন একটা অভূতপূর্ব সুখদুঃখমিশ্রিত অনুভূতি তাহার সমস্ত দেহমন আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। বৈকালে অক্ষুধার ছুতা করিয়া সে কিছু খাইল না। নীচে কয়েকবার কড়া নাড়ার শব্দ হইল। তিনজন যুবক এবং একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক পাত্রীর সন্ধানে আসিয়া ফিরিয়া গেলেন। উদাসী প্রথমবার উপরে খবর দিয়াছিল, সুকল্যাণী উপর হইতেই বলিয়া দিলেন,—"বাবুকে ব'লে দাও সাতদিন পরে খবর নিতে। ঠিকানা রেখে যেতে বল। আসছে রবিবার মেয়ের পিসেমশাইকে আসতে ব'লব, তাঁর সঙ্গে কথা হবে।" উদাসী ব্যাপারটা বুঝিল, প্রথমতঃ কয়েকজনের ঠিকানা রাখিল, তাহার পর কয়দিন ধরিয়া যে-কেহ আসিয়া সন্ধান লইল প্রত্যেককে সে জানাইয়া দিল, পাত্র স্থির হইয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যায় কিছু পূর্বে সুকল্যাণী বলিলেন, "হ্যাঁরে, মুখ হাত ধুবি না, কিচ্ছু ক'রবি না?" সুদেষ্ণা বলিল, "মাথাটা বড্ড ধরেছে মা, কিছু ভালো লাগছে না।" মা বলিলেন "সারাক্ষণ বই মুখে দিয়ে বসে থাকলে মাথা ধরবে না? গা ধুয়ে একটু ছাদে ঘুরে আয় দেখি?" সুদেষ্ণা মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে বাথরুমে ঢুকিল, কিন্তু সেদিন তাহার গা ধুইতে অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশী সময়ই লাগিল। হাতের ও পায়ের আলকাত্‌রার কালি সম্পূর্ণ দূর হয় নাই বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় বেশ কিছুক্ষণ মুখটায় শুদ্ধ সাবান ঘসিয়া স্নানশেষে আরক্ত গৌরবর্ণ দেহে ধবধবে সাদা শান্তিপুরে শাড়ী এবং গরদের ব্লাউজ পরিয়া সে যখন বাহির হইল ততক্ষণে তাহার মনোভাবের বোধ হয় ঈষৎ পরিবর্তন হইয়াছে; সুকল্যাণী ভাঁড়ার ঘরে কুটনা কুটিতে বসিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া বলিল, "মা, আমি একটু বাইরে ঘুরে আসি। তোমার ঐ ছাদের ওপর দু'হাত জমির মধ্যে পায়চারি ক'রলে আমার মাথা ছাড়বে না।" সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "তা' যাবি যা, উদাসীকে সঙ্গে নিয়ে যা।"

"হ্যাঁ, উদাসীকে নিয়ে যাবে না আরো কিছু। তার সঙ্গে ঠুক ঠুক ক'রে হাঁটতে আমি পারব না মা, তার চেয়ে আমার ঘরে ব'সে থাকাই ভালো।" সুকল্যাণী বলিলেন, "তোমার যা খুশি করো বাপু, কেবল ফিরতে রাত কোরো না। রাস্তাঘাট খারাপ, আমার বড্ড ভয় করে।" সুদেষ্ণা অনুমতি পাইয়া নিজের ঘরে আসিল, একবারটি বড়ো আরসিটার সামনে দাঁড়াইয়া তাহার স্বভাবকুঞ্চিত চুলগুলাকে চিরুনির সাহায্যে সংযত করিয়া একটা এলো খোঁপা বাঁধিল। তারপর কপালে একটি সিঁদুরের টিপ পরিয়া এবং জয়পুরী ব্রোচটা কাপড়ে আটকাইয়া সে যখন বেড়াইতে বাহির হইল তখন ভয়ঙ্কর মাথা-ধরার কোনো চিহ্ন তাহার মুখে চোখে কোথাও প্রতিফলিত হইতে দেখা গেল না। নারীসুলভ গজেন্দ্রগমন তাহার কোষ্ঠীতে ছিল না। সে যে অভিসারে চলিয়াছে, সে কথাটা তাহার নিজের কাছেও বোধ হয় তখনও সুস্পষ্ট হয় নাই, সুতরাং দুই সহস্র বৎসর পূর্বে যে ভীরু অভিসারিকারা সূচীভেদ্য অন্ধকারে রুদ্ধালোকে উজ্জয়িনীর 'নরপতি-পথে' গোপন পদ-সঞ্চারে যাত্রা করিত, তাহাদের সহিত এই আধুনিকা অভিসারিকার কোথাও কোনো মিল ছিল না। দীর্ঘ ঋজুদেহ শুভ্রবসনে শোভিত করিয়া সে যেন অবাধগতি অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ললাটে জয়পত্র বাঁধিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছে। জুতার শব্দে নিঃশব্দ গলি-পথ সচকিত করিয়া অন্যান্য

পথিকদিগের বিমুগ্ধ দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া সে যখন বড়োরাস্তায় গিয়া পড়িল তখন ল্যাম্প-পোষ্টের নীচে দাঁড়াইয়া বিঁড়ি ধরাইতে ধরাইতে শুঁড়িপাড়ার একটা বখা ছেলে কেবল মন্তব্য করিল, "ইস্‌স্‌! মাঁনোয়ারী গোরা!"

স্বপ্নচালিতের মতো আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে সুদেষ্ণা যখন পটোলডাঙ্গার গলির মুখে আসিয়া পৌঁছিল তখনও তাহার কোনো ধারণা ছিল না, সে কোথায় যাইতেছে এবং কেন যাইতেছে। খুঁজিতে খুঁজিতে একটা বিশেষ নম্বরের বাড়ির সম্মুখে সে যখন গিয়া দাঁড়াইল তখন অকস্মাৎ কোথা হইতে রাজ্যের লজ্জা তাহাকে পাইয়া বসিল। কলেজে, পথে, ট্রামে, বাসে, —পিতৃহীন হইবার পর যেদিন হইতে নিজের-পায়ে-না-দাঁড়াইলে-নয় এ বিশ্বাস তাহার হইয়াছে—সেদিন হইতে সর্বত্র—সে নারীসুলভ লজ্জাকে সযত্নে পরিহার করিয়া চলিয়াছে। তাহার তীব্র দৃষ্টি এবং শাণিত ভাষার ভয়ে ইচ্ছা সত্ত্বেও ক্লাসের সহপাঠী ছাত্রেরা তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে সাহস করিত না। ইউনিভার্সিটিতে কয়েকটি ফাজিল সহপাঠী আড়ালে তাহার নাম দিয়াছিল 'মিলিটারি পিসিমা'। কথাটি তাহার কানে উঠিলেও তাহাকে লজ্জা দিতে পারে নাই। আজ বহুদিন পরে একটা বিশেষ নম্বরের অপরিচিত বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে নিজের মাতৃ-মাতামহীর সনাতন রক্তধারার সহিত তাঁহাদের নারীত্বের সনাতন দুর্বলতার উত্তরাধিকারিণী বলিয়া নিজেকে নিজে আবিষ্কার করিয়া সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে একি করিল, কোথায় আসিল? তাহার এই ব্যবহারে না-জানি তিনি কি মনে করিবেন? হয়তো ভাবিবেন, এই তাহার স্বভাব, অপরিচিত সুশ্রী পুরুষের পিছনে ছুটিয়া বেড়ানোই তাহার পেশা! ছি ছি, কি লজ্জা! একবার ভাবিল, কেহ তো দেখে নাই এখনও ফিরিয়া গেলে কেহ কিছুই জানিতে পারিবে না। পরমুহূর্তে মনে হইল, এই বাড়িটার ভিতরের রহস্য একটু জানিয়া লইতে, ইহার অধিকারীর গোপন মনের কথা স্পষ্ট ভাষায় শুনিয়া যাইতে, দোষ কি? চিরজীবনের জন্য যাহার সহিত নিজের জীবন যুক্ত করিতে যাইতেছে, তাহার সঙ্গে পূর্বাহ্নে একটা বোঝাপড়া করিয়া লওয়া কি কর্তব্য নয়? তিনি যাহাই মনে করুন, সুদেষ্ণার তো মনে কোনো পাপ নাই। তিনি মানুষ হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে ভুল বুঝিবেন না। যদি ভুল বোঝেন, তবে সুদেষ্ণার যোগ্য তিনি সত্যই নন। বাড়িটা কিন্তু বেশ,

ছোটোর মধ্যে। একটু বদল করা দরকার,—আর সামনের ঘরে ভাড়াটে সে রাখিবে না। সহসা তীব্র হর্ন শুনিয়া সে পথ ছাড়িয়া ওপাশের একটা বাড়ি ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল; তাহার পাশ দিয়া একখানা প্রকাণ্ড মোটর একশত তিপান্ন নম্বর বাড়িখানার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়িখানার মধ্যে উগ্ররকমের উজ্জ্বল সাজ-পোষাক পরিহিতা এনামেল-করা-মুখ একজন স্থূলাঙ্গিনী বিলাসিনী রমণী বিচিত্র ভঙ্গীতে হেলিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার বাঁ হাতের ঘোর লাল রং করা নখগুলি ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে পাউডার বাহির করিয়া নাকে লাগাইবার সময় সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারেও স্পষ্ট দেখা গেল। শোফার কড়া নাড়িতেই সুমন্ত্র ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিল এবং রমণীকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেল। সেখান হইতে সাত আট হাত দূরে তাহারই প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মানা সুন্দরী অভিসারিকার দিকে একবার ফিরিয়াও তাকাইল না। কিন্তু গালে ফেট্টি বাঁধা কেন? কোনো অসুখ করে নাই তো? একবেলার মধ্যে আবার কি হইল? যাহাই হউক, সে চিন্তা সুদেষ্ণার নয়। যিনি আসিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার পুর্বপরিচিতা, বাড়িতে ঢুকিবার সময় তিনি যে পলাতক সুমন্ত্রকে ধরিতে আসিয়াছেন সে কথা উচ্চকণ্ঠে উচ্চহাস্যের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরেই বাড়ির ভিতর হইতে আবার ঘন ঘন উচ্চহাস্যের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। সুদেষ্ণা একবার নিজ মনে বলিল,—"কী রুচি! এইজন্যে এতদিন বিয়ে করা হয় নি?" একবার মনে হইল, ঐ ধনী বিলাসিনীর নর্মসহচর দরিদ্র অপদার্থটাকে বেশ করিয়া দুই কথা শুনাইয়া সে জন্মের মতো বিদায় লইবে। আবার ভাবিল, বিদায় লওয়া তো পড়িয়াই আছে, লইলে ঠেকাইবে কে? কিন্তু আদালতে খুনী আসামীকেও নিজের পক্ষ সমর্থন করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, লোকটাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ না দেওয়া অন্যায় হইবে। যাক, ঐ মুখপুড়ীটা আগে চলিয়া যাক, একটা বোঝাপড়া করিয়া সেও যাইবে। দু'একজন পথচারী তাহাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেছে দেখিয়া সুদেষ্ণা বাড়ি খোঁজার ভান করিয়া গলির মধ্যে খানিকটা পায়চারি করিয়া আসিল, কিন্তু বোঝাপড়ার সুযোগ আর হইল না। সুমন্ত্র সেই রমণীর সহিত হাসিতে হাসিতে আসিয়া গাড়ীতে উঠিল, মোটরখানা হর্ণের শব্দে গলি কাঁপাইয়া হেডলাইট জ্বালিয়া তাহার গা ঘেঁসিয়া বাহির হইয়া গেল। সুদেষ্ণার একবার মনে হইল তাহার পা দুইটা কেমন যেন কাঁপিতেছে, মাথাটা

ঘুরিতেছে, এখনই বোধ হয় সে পড়িয়া যাইবে। অনেক কষ্টে একটা বাড়ির গায়ে হেলান দিয়া সে কিছুক্ষণ ধরিয়া বল সংগ্রহ করিল, তারপর ধীরে ধীরে শূন্য মনে বাড়ির দিকে রওনা হইল। আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে ক্রমে চোখে মুখে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া সে খানিকটা প্রকৃতিস্থ হইল, ক্রমে গতির বেগ বাড়াইয়া দিল। হন হন করিয়া চলিতে চলিতে নিজের মনে বলিতে লাগিল, 'ও আমার যোগ্য নয়, সত্যিই ও আমার যোগ্য নয়।'

সেদিন সারারাত সুদেষ্ণার ঘুম হইল না। ভোররাত্রে কখন হঠাৎ একবারটি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সে। স্বপ্ন দেখিল, সুমন্ত্র যেন একটা ঘি-রঙের প্রকাণ্ড মোটর লইয়া তাহাদের বাড়ির দরজায় আসিয়া তাহাকে ডাকিতেছে, —সে যেন ঠোঁটে এবং নখে রঙ্ মাখিয়া ক্রেপের শাড়ী পড়িয়া প্রস্তুত; মোটরে উঠিতে যাইবে এমন সময় সুমন্ত্রের মুখটা সেই উড়িয়া মজুরটার মতো হইয়া গেল, সে হুড়হুড় করিয়া এক টিন আলকাৎরা তাহার গায়ে মাথায় ঢালিয়া দিল। সুদেষ্ণার ঘুম ভাঙিয়া গেল, সে ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল।

পরদিন সকাল হইতে চারজন প্রার্থী ফিরিয়া গেল; সুদেষ্ণা উপরে বসিয়া তাহাদের আগমন এবং বিসর্জনের সমস্ত সংবাদই পাইল। একবার ভাবিল মা'কে স্পষ্ট বলিয়া দিবে, সে যাহাকে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে তিনি তাহার যোগ্য ন'ন, সুতরাং আজীবন কৌমার্যব্রত পালন করা ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, মা তো সকলকেই ফিরাইয়া দিতেছেন, যতদিন না বিশেষ কোনো একজনকে বিবাহ করিবার জন্য চাপ দেন, ততদিন খুঁচাইয়া ঘা করিবার দরকার কি?

রবিবার দিন সুদেষ্ণা মাঝে মাঝে তাহার দুই একটি বান্ধবীর বাড়ি বেড়াইতে যাইত, আজ তাহার বাড়ির বাহির হইতে ইচ্ছা হইল না। খাটে শুইয়া, টেবিলের কাছে পড়িতে বসিয়া, মার পুজার ঘরের অথবা রান্না-ঘরের কাজে সাহায্য করিতে গিয়া—তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল সেই অপদার্থ লোকটা এখনই বোধ হয় আসিবে। তাহার সহিত কথা কহিতে হইবে ভাবিয়াই সুদেষ্ণার মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। না, সে তাহার সামনে আর বাহির হইবে না। ভাড়াটে ভাড়াটের মতোই থাকা ভালো, কুকুরকে নাই দিলে মাথায় উঠিতে পারে। কিন্তু সারাদিনের মধ্যেও সেই অপদার্থটা বা তাহার বন্ধু আসিল না তো?

সোমবার সকালে সুদেষ্ণার কলেজ যাইবার সময় সুকল্যাণী বলিলেন, "কি পাগলা ছেলে, বাবা! বাড়ির ভাড়া আগাম দিয়ে ব'সে রইল, তারপর আর কোনো খোঁজখবর নেই। কিন্তু ওর মনটা বড়ো ভালো! জানিস,

ছোটোবেলায় রাজ্যের কানা খোঁড়া কুকুর-বেরালকে নিজের খাবার থেকে খেতে দিত। একবার দেখি কোথাকার একটা নেড়ি কুকুর কা'র বাড়ি হাঁড়ি খেতে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙে এসেছে, ও ব'সে ব'সে তার পায়ে ন্যাকড়ার ফালি দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে। গ্যাখ, অর্থভাগ্য সকলের হয় না, কিন্তু ওর মা-বাপের রক্ত ওর দেহে আছে, ও-ছেলে কখনো মন্দ হ'তে পারে না। ওকে যে স্বামিরূপে পাবে সে ভাগ্যবতী।"

সুদেষ্ণা বলিল, "ছোটোবেলায় কে কি ক'রেছিল তাই দিয়ে বুড়ো বয়সে তা'র চরিত্র বিচার করা ঠিক নয়, মা। আর মা-বাপ ভালো হ'লেই ছেলে ভালো হ'বে এমন কোনো কথা নেই। অনেক মহাপুরুষের ছেলেও মহাপাপী হয়েছে, ইতিহাস তার সাক্ষী।"

সুকল্যাণী বলিলেন, "তুই কি ব'লতে চাস স্পষ্ট ক'রে বল দিকি? সুমন্ত্রকে বিয়ে করা তোর মত নয়?"

সুদেষ্ণা বলিল, "আমি কিছুই ব'লতে চাই না! শুধু ভালো ক'রে খোঁজখবর না নিয়ে তোমরা আমাকে যা'র তা'র হাতে গছিয়ে দিয়ো না, এই অনুরোধ। তিনি যদি আসেন তাহ'লেও তাঁর সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠতা করা আমার মত নয়। ভাড়াটে ভাড়াটের মতন থাকবেন।" সে দ্রুতপদে চোখের জল চাপিতে চাপিতে বই খাতা গুছাইয়া লইয়া নীচে নামিয়া গেল। সুকল্যাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তাহার পিছন পিছন নামিয়া গেলেন। সুদেষ্ণা বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেলে তিনি 'দুর্গা, দুর্গা' বলিয়া ফিরিয়া স্নানের ঘরে ঢুকিলেন। মনে মনে বলিলেন, "আজকালকার ছেলেমেয়েদের অন্ত পাওয়া ভার। কার মনে যে কি আছে?"

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনেও সুমন্ত্র যখন বাড়ির দখল লইতে আসিল না তখন সুকল্যাণী সত্যই বড়ো চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন,

"হ্যাঁরে, ছেলেটা ট্রামে বাসে কোথাও চাপা প'ড়ল না তো? কাগজ দেখেছিলি আজ?"

সুদেষ্ণা নিজেও ক্রমে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল। তবু ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "কচি খোকা! ট্রামে চাপা পড়েনি মা, ছেলেধরায় ধ'রে নিয়ে গেছে।" সুকল্যাণী বলিলেন, "তোর সব তা'তে ঠাট্টা। ওর যদি আজ মা থাকত তা'হ'লে কি ওকে ঐ রকম বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে বেড়াতে দিত?" সুদেষ্ণা চুপ করিয়া মাথা নীচু করিয়া একটা বই দেখিতে লাগিল। সুকল্যাণী শেষ

পর্যন্ত উদাসীকে পটোলডাঙ্গায় খোঁজ লইতে পাঠানোই কর্তব্য স্থির করিলেন। উদাসী দুপুরে কাজকর্ম সারিয়া সুমন্ত্রের সন্ধানে গেল। ঘণ্টা দুই পরে ফিরিয়া খবর দিল, তিনদিন হইল বাবু কোথায় গিয়াছেন কেহ জানে না। তবে বাহিরের ঘরের ডাক্তারবাবু তাহার দরজা খোলা দেখিয়া চাবি দিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বলিলেন, বাবু কলিকাতায় নাই, তাঁহার খুব অসুখ। সুদেষ্ণা কলেজ হইতে ফিরিয়া তখন সবেমাত্র জুতা খুলিতেছিল, সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তারপর বলিল, "মা, আমি যা'ব?" সুকল্যাণী বলিলেন, "তুমি একলা মেয়েমানুষ, গিয়ে কি ক'রবে, মা?"

"মানুষটা বাঁচল কি ম'রল একবার খোঁজও নেবে না।"

"তারা তো কেউ ঠিকানা জানে না বলেছে।"

"উদাসীদাদার কাণ্ড তো? আমি নিজে একবার খোঁজ নিয়ে আসি, মা?"

সুকল্যাণী বলিলেন, "আচ্ছা যাবে যাও, একটা ট্যাক্সি ক'রে নিয়ো, আর উদাসীকে সঙ্গে নিয়ে যাও। ক'দিন তোমার শরীরটা ভালো নেই, বেশি হেঁটো না। টাকা যা দরকার হয় নিয়ে যাও।"

সুকল্যাণী আঁচল হইতে তাঁহার লোহার সিন্দুকের চাবি খুলিয়া দিলেন। সুদেষ্ণা সিন্দুক খুলিয়া দু'খানি নোট বাহির করিয়া তাহার হাত-ব্যাগে পুরিল। বাহির হইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ কি মনে হওয়াতে থামিয়া তাহার স্বর্গীয় পিতার ছবিখানির নীচে আসিয়া দাঁড়াইল এবং নতজানু হইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। তারপর মা'কে চাবি ফেরত দিয়া ধীরপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। সুকল্যাণী দূর হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, কন্যা বাহির হইয়া যাইবার পর তিনিও আসিয়া নিঃশব্দে স্বামীর ছবির তলায় দাঁড়াইয়া কি যেন প্রার্থনা করলেন, তারপর নতজানু এবং গলবস্ত্র হইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন।

ট্যাক্সি হইতে নামিয়া সুদেষ্ণা সোজা ডানদিকের বাহিরের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ হোমিওপ্যাথ অধরবাবু থতমত খাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

সুদেষ্ণা একবার ইতস্ততঃ করিল। পরমুহূর্তে হাসিয়া বলিল, "আমাকে আপনি চেনেন না। আমি সুমন্ত্রবাবুর মাসিমার বাড়ি থেকে আসছি। ক'দিন তাঁর কোনো দেখাসাক্ষাৎ নেই, তাই খোঁজ নিতে এলুম।"

অধরবাবু তাহাকে একখানা চেয়ার আগাইয়া দিয়া বলিলেন, "তাঁর কথা আর ব'লবেন না। তিনি থাকেন কোথায় এখানে যে দেখা পাবেন? সাতদিন দশদিনের জন্তে কলকাতায় এল, চরকির মত ঘুরল সহরের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো, কিছু ছবিটবি বেচলে, ব্যস, তারপর তিনমাস উধাও। এই তো চলছে আজ পাঁচ ছ' বছর। আগে আগে কখনও কখনও পুলিসে এসে খোঁজ নিত, আমাকে জেরা ক'রে মারত, এদিকে দরজায় তালা এঁটে দিয়ে যেত, আজকাল দেখছি সে উপদ্রবটা গেছে। যে ক'দিন থাকেন এখানে কোনদিন খান, কোনদিন খান না, কোথায় কখন যান, তারও ঠিকানা নেই। থাকেন সাধু-সন্ন্যাসীর মতন, পানটি পর্যন্ত খান না, কিন্তু কত লোকে যে তাঁকে ঠকিয়ে খায়! সুদিনে কা'রও মনে পড়ে না, দুর্দিনে ব্যাগার খাটবার দরকার হ'লে অমনি তাঁর খোঁজ পড়ে। সম্প্রতি কে-এক বন্ধু খুব অসুখে পড়েছেন, তিনি তাঁর সেবা ক'রতে গেছেন। তা' যাবি যা, দরজাটা পর্যন্ত বাইরের খুলে রেখে চ'লে গেছে! কি ব'লব মা, এত ক'রে বলি, 'সুমন্ত্রবাবু, হয় বিয়ে করুন, না হয় ঠাকুর চাকর রাখুন।' তাতে বলে কি, 'বাবুয়ানি অভ্যেস ক'রলেই বেড়ে চলে; আত্মসম্মান খুইয়ে ওপর চাল বজায় রাখবার জন্তে শেষে পরের গোলামী করতে হয়,—টাকার জন্তে অন্যায়কে মেনে নিয়েও। সে আমার দ্বারা হ'বে না।" ভদ্রলোক সুমন্ত্রকে 'তুমি'ই বলিতেন, অপরিচিতের কাছে সম্মান দেখাইতে গিয়া কেবলই তুমিও আপনি মিশাইয়া ফেলিতেছিলেন।

সুদেষ্ণা বলিল, "ওঁর অসুখ শুনেছিলুম। সেটা তা' হ'লে সত্যি নয়?"

অধরবাবু বলিলেন, "তা'তো আমি কিছু শুনিনি, মা। হঠাৎ একবস্ত্রে চ'লে গেছলেন দরজা খুলে। ভাগ্যি আমার চোখে পড়ে, তাই আমি রাত্রে তালা লাগিয়ে রাখি। সকালে মিস্টার কুণ্ডুর শোফার এসে ব'ললে, তার বাবুর খুব অসুখ, ম্যালিগ্ন্যান্ট ম্যালেরিয়া না কি হয়েছে, সেনবাবু এখন কিছুদিন ফিরবে না। একটা স্লিপ এনেছিল, তার হাতের লেখা, দু'খানা জামা আর কাপড় চেয়ে পাঠিয়েছিল। বোঝো দিকি নি মা, আমার কি এ-সব পোষায় এই বয়সে? বাক্স তোরঙ্গ একরাশ, অথচ কাপড়চোপড় কোথাও কিছু নেই, সব বইয়ে বোঝাই। এককালে ওঁর ঐ একমাত্র নেশা ছিল, পুরোনো বই কেনা। সেদিন সে কি বিপদ! একে বুড়ো মানুষ খুঁজে পাই না, তা'তে বড়োলোকের শোফার খালি তাড়া মারে!"

সুদেষ্ণা বলিল, "তাহ'লে কি ক'রলেন শেষ পর্যন্ত ?"

"কি আর ক'রব, অনেক খোঁজপত্তর ক'রে দু'টো পাঞ্জাবী পেলুম আধময়লা, তাই দিয়ে দিচ্ছিলুম। তারপর মনে প'ড়ল উনি তো আবার খদ্দর ছাড়া পরেন না, পরের বাড়িতে গিয়ে কষ্ট পাবেন। শুধু পাঞ্জাবী প'রে তো আর বাইরে যাওয়া চলে না ? বাড়িতে কি করে ওই জানে ! হয় তো সব একসঙ্গে ধোপার বাড়ি দিয়েছে। ভেবে চিন্তে শেষে বুদ্ধি যোগাল, সেই মোটরেই গিয়ে খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে দু'খানা কাপড় কিনে দিয়ে দিলুম। ভাড়ায় বাদ যাবে।"

সুদেষ্ণা হাস্য দমন করিয়া বলিল, "আচ্ছা, তাঁর বাড়িতে মেয়েরা কাঁ'রা খুব আসেন, তাঁরা একটু গুছিয়ে দিয়ে যেতে পারেন না ?"

অধরবাবু বলিলেন, "ও কথা বোলো না, মা। আমি তো ওঁর বাবার আমল থেকে ভাড়া আছি, মেয়েদের কাউকে আসতে যেতে দেখিনি। তবে হ্যাঁ, আগে যখন ক'লকাতায় থাকত নিয়মিত তখন পাড়ার গরীব দুঃখী মেয়েছেলে আসত বই কি। বাবা ব'লল এসে প'ড়ে—টাকাটা সিকেটা, ওষুধটা কাপড়টা নিয়ে যেত বই কি ! যখন কোনো ভালো চাকরী পেত তখন তাদের ভিড় বাড়ত, চাকরী গেলেই তা'রা এসে ফিরে যেত গাল দিতে দিতে। ওঁর বাবার মা'র কম কাপড়চোপড ছিল না কি ? সবই তো ঐ ক'রে গেছে। তোমরা যে তা'র আত্মীয় ক'লকাতায় আছ তা' কি জানি ? তা' হ'লে এর আগেই গিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আসতুম।"

সুদেষ্ণা বলিল, "কিন্তু আমি শুনেছি একজন খুব সাজ-পোষাক-পরা ভদ্র-মহিলা রোজ মোটরে ক'রে আসেন"—

অধরবাবু বলিলেন, "আপনি বোধ হয় ঐ কুণ্ডুবাবুর স্ত্রীর কথা ব'লছেন। তা' তিনি তো সেই একদিনই এসেছিলেন। তাঁর কর্তা বাড়ি ছেড়ে চ'লে এসেছেন, সুমন্ত্রবাবু তাঁর ঠিকানা জানতেন, তাই কুণ্ডু-গিন্নী তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে কোথায় কোন্ গাঁয়ে গেছেন সেইরাত্রে। শোফার ব'ললে কি না, গিয়ে দেখেন তাঁর বেহুঁস জ্বর। ব্যস, সেইখানেই আটকে গেছেন। আপনারা বোধ হয় পাড়ার লোক কা'রো কাছে শুনে থাকবেন মন্দ কথা। তা' যা' রং-চং মেখে বেড়ান ওঁরা, তা'তে লোকে মন্দ কথা ব'লতে পারে বই কি। তবে সুমন্ত্রবাবু, মা, ওসব পছন্দ করেন না, এ আমি জোর ক'রে

ব'লতে পারি। বলেন, 'যারা নিজের জন্যে বেশী খরচ করে, পরের জন্যে তাদের খরচ ক'রবার পয়সা থাকে না।"

সুদেষ্ণা বিদায় লইবার জন্য নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অধরবাবু বলিলেন, "এবার ফিরে এলে"—

সুদেষ্ণা বলিল, "হ্যাঁ ফিরে এলেই ব'লবেন, তাঁকে তাঁর মাসিমা ডেকেছেন। আমরা বড্ড দুশ্চিন্তায় আছি।"

অধরবাবু বলিলেন, "বুড়ো মানুষ, আমারও ভুল হ'য়ে গেল ঠিকানাটা জেনে নিতে।"

সুদেষ্ণা বলিল, "বাড়ির চাবি কি শোফার এনেছিল? নিয়ে গেছে?"

অধরবাবু বলিলেন, "না মা, কখন আবার কি ফরমাস আসে, তাই আমার কাছেই রেখেছি।"

সুদেষ্ণা বলিল, "আমাকে দিতে আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো দিতে পারেন। এবার কেউ এলেই তা'কে তা' হ'লে আমার কাছে যেতে হবে। এই ঠিকানাটা রাখুন।" সুদেষ্ণা নাম ঠিকানা লিখিয়া দিল। অধরবাবু চাবিটি বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন, "তোমরা হ'লে মা তা'র আপনার লোক। তোমরা ভার নিলে তো আমি বাঁচি। বুড়োবয়সে কি আমার আর এ-সব পোষায়? আমি কেবল অবাক হ'য়ে যাচ্ছি, মা, এত কাছে তোমরা আছ, অথচ তার অসুখেবিসুখেও কেউ একবার উঁকি মেরে দেখ না! সে একা রাজ্যের লোকের ক'রে মরে, নিজে অসুখে প'ড়লে তার মুখে জল দেবার দ্বিতীয় লোক নেই। সাবুটা বার্লিটা জোটে না!"

সুদেষ্ণা বলিল, "সত্যি, আমাদের অপরাধ হয়েছে। উনিও কোনো খোঁজ খবর রাখতেন না, আমরাও রাখতুম না। এখন মাঝে মাঝে যান, তাই না গেলে দুর্ভাবনা হয়।"

অধরবাবু আর কিছু বলিলেন না, তাহাকে ট্যাক্সিতে তুলিয়া দিলেন। সুদেষ্ণা গাড়িতে বসিয়া একবার ভাবিল, "ট্যাক্সিটা ভাড়া না ক'রলেই হ'ত।" তাহার শরীর মন সবই যেন হাল্কা লাগিতেছিল, তাহার বুকের উপর হইতে একটা গুরুভার বোঝা কে যেন এইমাত্র তুলিয়া লইয়াছে। আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়া ট্যাক্সি ছুটিতেছিল, সুদেষ্ণা একবার ভাবিল, আর আট আনা উঠিলেই নামিয়া পড়িবে। পরক্ষণে ড্রাইভারের পাশে নিদ্রামগ্ন উদাসীকে দেখিয়া তাহার দয়া হইল, ভাবিল, "থাক, কত আর খরচ হবে।" উদাসী গাড়িতে

উঠিয়া চোখ বুজিয়াছিল, বাড়ির দরজায় ড্রাইভারের ধাক্কা খাইয়া চোখ খুলিল। সুদেষ্ণা বলিল, "ভালো লোককে মা পাহারা দিতে পাঠিয়েছিলেন আমার সঙ্গে!" উদাসী অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "মজার সাথ ঘুম দিসি একটা!"

সাতদিনের দিন দুপুরে ভদ্রেশ্বরকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া সুমন্ত্র বাড়ি ফিরিল। ভদ্রেশ্বরের অসুখ খুব বেশীই হইয়াছিল, তাহারা সময়ে গিয়া না পৌঁছিলে তাহার কি অবস্থা হইত কে জানে! দিনকয়েক জীবন লইয়া যমে মানুষে টানাটানি চলিয়াছে, রক্ত-পরীক্ষা, ডাক্তার, ঔষধ, ইঞ্জেক্সন, মাথা-ধোয়ানো, পথ্য-তৈয়ারী প্রভৃতি লইয়া সুমন্ত্রের নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না। ইহার মধ্যে বার-পাঁচেক্ সে ভদ্রেশ্বরের মোটরে ঔষধ কিনিতে বা ডাক্তার ডাকিতে কলিকাতায় আসিয়াছে, কিন্তু চালতাবাগানে যাইবার সুযোগ একবারও হয় নাই। আজ জ্বর ছাড়িতে ডাক্তারের অনুমতি লইয়া ভদ্রেশ্বরকে মোটরে শায়িত অবস্থায় কলিকাতায় আনা হইয়াছে। সে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছিলে ভবিষ্যতে খুব সাবধানে রাখিবার পরামর্শ এবং ঔষধ ও পথ্য-তালিকা ঠিক করিয়া দিয়া সুমন্ত্র বিদায় লইয়াছে। কয়দিনের অতিরিক্ত পরিশ্রমে এবং রাত্রি জাগরণে তাহার শরীরটা বড়োই ক্লান্ত বোধ হইতেছিল, স্থির করিয়াছিল বাড়ি ফিরিয়া বেশ একটি লম্বা ঘুম দিবে। অধরবাবুর কাছে চাবি চাহিতেই তিনি বলিলেন, "চাবিটাবি আমি জানি না। তোমার মাসিমার বাড়ি থেকে চাবি নিয়ে গেছে।"

সুমন্ত্র বলিল, "বলেন কি, আমার মাসিমার বাড়ি থেকে? আমার তো মাসিমা এখানে কেউ নেই।" এইবার অধরবাবুর মুখ শুকাইল। বলিলেন, "সে কি? অমন মুখ, অমন চেহারা, সে কি আমাকে ঠকিয়ে নিয়ে গেল? চালতা-বাগানে বাড়ি ব'ললে। এই যে ঠিকানা রেখে গেছে। এও কি সব মিথ্যে তা' হ'লে?" তিনি স্লিপ কাগজখানি বাহির করিয়া দিলেন, তাহাতে গোটা গোটা মেয়েলি হস্তাক্ষরে সুদেষ্ণাদের ঠিকানা। সুমন্ত্র কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহা হইলে সুদেষ্ণা নিজে তাহার সন্ধানে আসিয়াছিল? সত্যই তাহা হইলে তাহাদের স্নেহযত্ন দরিদ্রের প্রতি ধনীর দয়ার নামান্তর নয়? কিন্তু এমন সময়ে আসিল সে—যে তাহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইবার লোক বাড়িতে নাই! অধরবাবুর এই ময়লা বেঞ্চিটাতেই হয়তো বসিয়াছিল। তাহার লক্ষ্মী তাহার গৃহদ্বারে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, হৃদয়সরোবরে পদ্মটি প্রস্তুত ছিল না। তা'

না হয় গেল, কিন্তু চাবি লইয়া গিয়া যে তাহাকে বিপদে ফেলিয়া গেল। এই ময়লাকাপড়ে একমুখ দাড়ি লইয়া সে কি করিয়া এখন লক্ষ্মীর মাতৃগৃহে যাত্রা করিবে? তাহার হঠাৎ খেয়াল হইল, অধরবাবু শঙ্কিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। বলিল, "না, না, আপনাকে ঠকায়নি। আমারই ভুল হয়েছিল। উনি, মানে আমার, ঠিক আমার নিজের মাসিমা নন। মানে,—মা'র খুব বন্ধু ছিলেন।" অধরবাবু বলিলেন, "আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে! তা' যাও না, তাঁদের বাড়ি গিয়েই একেবারে নাওয়া খাওয়া সেরে এসো না? অনেক ক'রে ব'লে গেছে। তোমার চাবি খুলেই বা কি রাজ-ঐশ্বর্য পেতে? কাপড় তো একখানি নেই, সব কি ধোপার বাড়ি দিয়েছ?" সুমন্ত্র বলিল, "ঠিক বলেছেন, এই কাছেই একটা ডায়িং ক্লিনিংএ দিয়েছি। দাঁড়ান, নিয়ে আসি।" মিনিট-দশেক পরে ময়লা কাপড় পুঁটুলি বাঁধিয়া অধরবাবুর আলমারির পিছনে রাখিয়া সুমন্ত্র ফরসা ধুতি-পাঞ্জাবী পরিয়া বাহির হইল। হ্যারিসন রোডের মোড়ে হিন্দুস্থানী নাপিতের কাছে পথে বসিয়া দাড়ি কামাইয়া বেশ করিয়া কলের জলে মুখ হাত ধুইয়া সুমন্ত্র চালতাবাগানে গেল। সুদেষ্ণাদের বাড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া একবার ইতস্তত: করিল, তারপর ভাড়াবাড়ির দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। এই পাড়ায় এত অল্প-মূল্যে এইরকম বাড়ি সে আশা করে নাই। ঘরগুলির লাল সিমেন্টের মেঝে নিয়মিত ধোয়ামোছায় ঝকঝক্ করিতেছে। দরজা জানালা সমস্ত খোলা। দোতালায় একখানি বড়ো ঘরে খাট-বিছানা পাতাই আছে। কলঘরে চৌবাচ্চা ভর্তি জল, সাবান, তোয়ালে এবং কুঁজায় টাট্‌কা তোলা জল দেখিয়া হঠাৎ তাহার মনে হইল,



'সুমুন্দিবাবু অমনে দি আও'

গৃহস্থালী সমস্ত প্রস্তুত, একটি গৃহিণী হইলেই হয়। যাহা হউক, অনেক দিন পরে সুমন্ত্র তৃপ্তি করিয়া স্নান করিল, তারপর এক গ্লাস জল খাইয়া আরাম করিয়া খাটে গিয়া শুইল। যখন ঘুম ভাঙিল তখন বেলা চারটা।

উদাসী ডাকিতেছিল, "সুমুন্দিবাবু, অমনে দি আও, মায়ে ডাকইন্।" সুমন্ত্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে সুকল্যাণীর বাড়ি গেল। মনে পড়িল, মাথার চুলটা আঁচড়ানো হয় নাই, কিন্তু আরশি চিরুনি দেখিতে না পাওয়ায় হাত দিয়াই চুলগুলোকে সংযত করিয়া লইল।

বাড়ির সকলেই দোতলায়; সুমন্ত্র সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেল। প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "তুমি আচ্ছা ছেলে যা-হোক, বাছা! পরের দিন আসবে ব'লে গেলে, সাতদিন খোঁজ-খবর নেই। আমরা এদিকে ভেবে মরি! একটা খবরও তো দিতে হয়?" সুমন্ত্র স্বীকার করিল, তাহার অপরাধ হইয়া গিয়াছে। তাহার বন্ধুর জীবন লইয়া টানাটানি চলিতেছিল, আজ তাঁহার জ্বর ছাড়িতে তাঁহাকে কলিকাতার বাড়িতে নামাইয়া দিয়াই সে আসিয়াছে। সুকল্যাণী বলিলেন, "আমরা সে খবর নিয়েছি। তোমরা যে কোথায় ছিলে, সেই ঠিকানাটা জানতুম না ব'লেই সেখানে সন্ধান নিতে পারিনি। তা বাড়ির তাহলে কি ব্যবস্থা হবে? তাঁরা কি আসবেন? তোমার টাকা না হয় ফেরত নাও, বাপু, আমি অন্য লোক দেখি।"

সুমন্ত্র মাথা চুলকাইয়া বলিল, "তাঁরা আসবেন না, তবে টাকা ফেরতও নেবেন না। আমিই মাঝে মাঝে এসে থাকব, আর কি হবে? ভদ্রেশ্বর বলেছে, আমি যদি ঘরের খেয়ে পড়াতে রাজি থাকি তবে সে আজীবন বাড়িভাড়া দেবে—একটা গরিবের ছেলেমেয়েদের ফ্রি স্কুল করবার জন্যে। ভাবছি, রাজি হব কি না?"

সুকল্যাণী বলিলেন, "তুমি যা ভালো বোঝো করো, বাছা, তবে আমার মাথার অসুখ। সামনের বাড়িতে বেশী চেঁচামেচি হলে"—সুমন্ত্র বলিল, "আমার নিজের বাড়িতেই স্কুলটা ক'রব তা' হ'লে। আপনাদের ভাড়া বাড়িতে খাওয়া শোওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।" সুকল্যাণী বলিলেন, "সুদেষ্ণাকে ডেকে দিই, সে কি বলে দেখ। সুদেষ্ণা, শুনে যা এদিকে। সুমন্ত্র এসেছে, কি বলে শোন্! ঐ এক মেয়ে, বাছা! এদিকে বলে তোমার সামনে বেরোবে না, এদিকে দু'দিন না আসতেই ভেবে অস্থির। তা' তোমরা কথাবার্তা কও, আমি রান্নার কতদূর কি হ'ল দেখি। আজ তো সারাদিন পেটে ভাত পড়েনি, ঘুমিয়েই কাটালে। উদাসী বেলা এগারোটার পর এসে খবর দিলে বাবু এসে ঘুমোচ্ছে। ভাবলুম, আহা, বন্ধুর অসুখে রাতটাত জেগেছে ক'দিন, ঘুমুচ্ছে ঘুমোক। ভাত ডাল সমস্ত হয়েছে, শুধু একটা কফি-চচ্চড়ি

ক'রতে দিয়ে এসেছি ঠাকুরকে, সেইটে হ'লেই হয়। তুমি আসবে আসবে ক'রে রোজ স্নানের জল আর খাবার জল ধরিয়ে রাখছি ক'দিন।" দরজার বাহিরে উড়িয়া পাচকের ডাক শোনা গেল। বলভদ্র এক বৎসর বাংলাদেশে আছে, সুতরাং বাংলার মিশাল দিয়া উড়িয়া ভাষা বলে, ফলে যাহা হয় তাহা বাংলাও নহে, উড়িয়াও নহে। সে ডাকিল, "মা, ইয়ড়ে আসেন—"


মদিখানে রয়ি গলা

"কেন, কি হ'ল? চচ্চড়ি নেমেছে?"

"সে চচ্চড়িও হ'লানি, ঝোলও হ'লানি, মদিখানে রয়ি গলা। সে মু পারিব নি।"

সুকল্যাণী বলিলেন, "খুব লোককে রাঁধতে দিয়ে এসেছিলুম।" বলিতে বলিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

সুদেষ্ণা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সুমন্ত্র বলিল, "আপনার শুনলুম আমার সামনে বা'র হ'তে বাধা আছে। কা'রো ওপর জুলুম করা আমার ইচ্ছে নয়—"

সুদেষ্ণা বলিল, "কি ক'রব? মাতৃ-আজ্ঞা।"

সুমন্ত্র বলিল, "আমার বাড়ির চাবিটা যে নিয়ে এসেছেন, সেও কি মাতৃ-আজ্ঞায়?"

সুদেষ্ণা শঙ্কিতভাবে বলিল, "মা'র কাছে বলেছেন নাকি?"—

"না, কিন্তু কারণটা জানতে কৌতূহল হচ্ছে?" সুদেষ্ণা বলিল, "বাড়ীতে রংবেরং-এর মেয়েরা আসা-যাওয়া এবং হাসিতামাসা ক'রলে পাড়ায় আপনার বদনাম হ'তে পারে, তাই চাবিটা নিজের কাছেই রেখেছি। সেইজন্যেই সামনে বেরোনো উচিত কিনা ভাবছিলুম।"

সুমন্ত্র অপ্রত্যাশিত আঘাতে সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল। পরক্ষণেই উত্তেজিতভাবে বলিল, "আমি? আমার বাড়িতে মেয়েরা যাতায়াত করে? আপনি ব'লছেন কি? কে বলেছে আপনাকে?"

সুদেষ্ণা বলিল, "কেউ বলেনি, আমারই দুর্মতি, আমি গত শনিবার সন্ধ্যাবেলা আপনার বাড়ি দেখতে গেছলুম। সেই এনামেলকরা ভদ্রমহিলাকে

মোটর থেকে আপনি যখন হাসতে হাসতে নামিয়ে নিয়ে গেলেন, তখন আমি হাতকয়েক দূরে দাঁড়িয়ে। ঘন ঘন হাসির শব্দে পাড়া তোলপাড় হচ্ছিল, তাও শুনে এসেছি।”

সুমন্ত্র কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর ম্লান হাসিয়া বলিল, “সমস্তই আমার ভাগ্য। সেদিন আমার মন বলেছিল, আপনি আসবেন, আমি তাই বাড়ি সাজিয়ে গুছিয়ে বসেছিলুম। সেই আপনি গেলেন, কিন্তু শুধু আঘাত পেয়েই ফিরে এলেন বাইরে থেকে। যিনি ভেতরে গিয়ে ব'সলেন তিনি আমার বন্ধুপত্নী, মিসেস কুণ্ডু। পাছে তিনি বাড়িতে আসেন, সেই ভয়ে আমি তাঁকে ঠিকানা দিইনি, জীবনে তার পূর্বে একবারমাত্র তাঁকে দেখেছি, দেখে বড়ো শ্রদ্ধা হয়নি। তিনি ভদ্রেশ্বরের ঠিকানার খাতায় আমার সন্ধান পেয়ে এসেছিলেন আমাকে ধ'রে নিয়ে তাঁর স্বামীর সন্ধানে যাবার জন্যে। আমি দাড়ি কামাতে কামাতে উঠে এসেছিলুম, ক্ষুরটা ফরাসের তলায় লুকিয়ে রেখে, তিনি তারই ওপর গিয়ে বসলেন ভাগ্যক্রমে। তাইতে একটু হাসাহাসি হয়। আমার আধখানা-কামানো দাড়ি রুমাল দিয়ে ঢেকেছিলুম, তাই নিয়েও তিনি হেসেছিলেন। নিজেকে পর্বতের সঙ্গে তুলনা ক'রেও একবার হেসেছিলেন। স্বামীর সন্ধান পেলেই আমায় বিদায় দেবেন বলেছেন, তাতে একটু টিপ্পনি করি, তা'তেও হাসাহাসি হয়। হ্যাঁ, পতিবিয়োগকাতরা সতীর পক্ষে এতটা হাসি সকলের চোখে ভালো লাগবার কথা নয়, কিন্তু সকলের স্বভাব তো একরকম নয়, সুদেষ্ণা দেবী। কেউ সন্দেশ খায় গোমড়ামুখ ক'রে, কেউ ফাঁসিকাঠে চড়ে হাসতে হাসতে। আমি নিজেও হয়তো তাই ক'রব, সেজন্যে যদি বন্ধুরা আমায় বর্জন করেন তবে আমি নাচার। আপনার মনে যখন সন্দেহ এসেছে, তখন আপনার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা, আপনাকে আমি আর বিরক্ত ক'রব না। তবে আমার এই কথাটা বিশ্বাস ক'রবেন, সুরুচি এবং মাত্রাজ্ঞান সকলের সমান থাকে না, কিন্তু তাই ব'লে এনামেল-করা মেয়েমাত্রেই খারাপ নয়। ভদ্রেশ্বরের অসুখে যে সেবা তাঁকে ক'রতে দেখেছি, তাতে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা হয়েছে। আর আমার নিজের কথা? আপনি বিশ্বাস করুন, বা না করুন, জীবনে এমন কোনো কাজ আমি করিনি, যা'র জন্যে কোন ভদ্রনারীর চোখের দিকে চোখ তুলে চাইতে আমি লজ্জিত হ'তে পারি, কিংবা কোনো ভালো মেয়ের স্নেহপ্রীতি থেকে বঞ্চিত হ'তে পারি।”

সুমন্ত্র এমনিতে সহজে রাগে না, কিন্তু একবার রাগিলে তাহার আর জ্ঞান থাকে না। বিশেষ করিয়া তাহার জীবনের প্রথম প্রণয়াস্পদা,—তাহার সবচেয়ে স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্রী, যখন তাহার গ্লানিহীন শুভ্রচরিত্রে অযথা দোষারোপ করিতে উদ্যত হইল তখন হঠাৎ যেন তাহার মাথার মধ্যে দপ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, সেই মুহূর্তে একেবারেই ধৈর্য হারাইল সে। নিজের দীর্ঘ বক্তৃতার উত্তরে সুদেষ্ণাকে কোনো কথা বলিবার সুযোগ না দিয়াই সে দ্রুতপদে দোতলার ঘর হইতে বাহির হইয়া তড় তড় করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল।

নীচের তলায় রান্নাঘরের সম্মুখের বারান্দায় সুকল্যাণী দেবী তাহার ঠাঁই করিয়া ভাত বাড়িতেছিলেন, পাচক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সাহায্য করিতেছি সুমন্ত্র বিনা বাক্যব্যয়ে আসিয়া আসনে বসিয়া গেল এবং নিঃশব্দে খাই আরম্ভ করিল। সুকল্যাণী দেবী হাসিয়া বলিলেন, "পেটটা জ্বলছে, না হবে না? সাড়ে চারটে বাজে। আমিও এদিকে আয়োজন কিছু ক'রতে পারিনি, বাবা। ক'দিন ধ'রে ফেলাফেলি হ'ল কিনা, তাই ভরসা ক'রে কিছু বাজারও ক'রতে দিইনি সকালে। কি ভাগ্যি মেয়েটা আজ দু'টোর পরেই বাড়ি ফিরেছে। ঠাকুর তো আমার,—সংসার হেজে যাক, মজে যাক,— দুপুরে একবার চ'রতে বেরোবেই। ওতো এই আধঘণ্টা হ'ল বাড়ি ঢুকছে। খাবার কষ্ট হ'বে খুব তোমার।"

সুমন্ত্র কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আপনারা বুঝি রোজ আমার জন্যে ভাত রাখছিলেন? খুব লোকসান করিয়েছি তাহ'লে বলুন?"

"লোকসান আর কি এমন?" সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "তবে দু'চার পদ ভালোমন্দ রাঁধতুম নিজেরা রোজ তোমার নাম ক'রে-সেগুলো ঠাকুর-চাকরকে ধ'রে দিতে মন কেমন ক'রত বইকি। আজ কিছুই নেই বাড়িতে, তুমি এলে। তোমার ভাগ্য!"

সুমন্ত্র বলিল, "আপনার স্নেহটা তো আছে, মাসিমা, সেটার দাম কি কম? তবে হ্যাঁ, আমার ভাগ্যটাও খারাপ বইকি। এই দেখুন না, এত কাছে রয়েছেন আপনারা, আমি জানতুমই না এতদিন। কত কি খাওয়া যেত, কত স্নেহযত্ন পাওয়া যেত, সব মাঠে মারা গেছে।"

সুকল্যাণী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কেউ ছিলেন না কাছাকাছি?"

সুমন্ত্র বলিল, "তা ছিলেন বইকি। বন্ধু তো পথে পথে খইমুড়কির মতো ছড়িয়ে আছে। আত্মীয়রা স্নেহ করেন সকলেই, তবে তাঁরা সব বেশীর ভাগই বাইরে থাকেন। যাঁরা কাছে থাকেন, সত্যি কথা ব'লতে কি আমিই তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখিনি। জেল থেকে গ্রামের কংগ্রেস-শিবির, আবার গ্রাম থেকে জেল,—এই ক'রেই কেটেছে তিন বছর। কিছুদিন তো অর্ডিন্যান্স ছিল, কংগ্রেসের লোককে আশ্রয় দিলে বাড়ি বাজেয়াপ্ত হবার সম্ভাবনা ছিল। কা'কে বিপদে ফেলব বলুন? গ্রাম থেকে কোনো কাজে দু'একদিনের জন্যে ক'লকাতায় এলে নিজের বাড়িতে উঠতুম ভয়ে কদাচিৎ কোনো বন্ধুবান্ধব ধ'রে নিয়ে গেলে গেছি তার বাড়ি, না হ'লে দেলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলার ছাদই ছিল আমাদের ভরসা।"

আ সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "সেখানে কে থাকত?"

যা "সেখানে অনেক গৃহহীন লোক,—রাস্তার মুটেমজুর, গরিব ফিরিওয়ালা,—শুয়ে থাকত রাত্রে, মাসিমা। তাদের মধ্যেই একটু জায়গা ক'রে নিয়ে কম্বল বিছিয়ে রাত কাটানো যেত।"

সুকল্যাণী দেবী সজলচক্ষে বলিলেন, "বোলো না, বাবা, আর বোলো না। কেন সাধ ক'রে এই গেরো বলোদিকি?"

সুমন্ত্রকে তখন আত্মপ্রচারের নেশা পাইয়া বসিয়াছিল। বলিয়া চলিল,

"খাদিমগুলের পাশে একটা দোকান ছিল হিন্দুস্থানীর, দু'পয়সায় পাঁচখানা রুটি দিত, তার সঙ্গেখানিকটা অড়রডাল ফাউ। সেই রুটি আর ডাল কি ভালোই লাগত তখন! গ্রামের লোকের সঙ্গে তো তখনও তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি, তারা শুধু ভিক্ষের চাল দিত। সে রেঁধে খাওয়া এক ঝকমারি! গাছ কেটে শুকিয়ে জ্বালানি কাঠ করাও এক দারুণ ব্যাপার। সকাল সন্ধ্যে কচু কি বেগুন কি কাঁচকলা,—কিছু একটা দিয়ে সেই ভাত, কখনো তার সঙ্গে মুসুর ডাল বা গুড়-তেঁতুল। সেগুলো ছিল বিলাস। জলখাবার ছিল ঘরের তৈরি নুন দিয়ে পান্তা, ওদেশে বলে 'পষ্টি ভাত'। কদাচিৎ মুড়িগুড় জুটল তো রাজভোগ। ক'লকাতায় এলে মুখ বদল হ'ত তবু। সেই ডাল-রুটি খেয়ে একপেট রাস্তার কলের জল খেয়ে মহানন্দে গ্রামে ফিরে যেতুম। আত্মীয় বন্ধুদের বাড়ি এক আধদিন সত্যিই রাজভোগ জুটেছে মাঝে মাঝে, তবে তা'তেও তৃপ্তি হ'ত না। আমার সঙ্গীসাথীদের কথা মনে প'ড়লে একা কিছু ভালো জিনিস খেতে গেলে যেন রুচত না মুখে, আত্মীয়দের বাড়ি তাই যেতুম

না বেশী। তবে হ্যাঁ, তাঁদের স্নেহ ভুলিনি। কেউ পকেটে দুটো কমলালেবু ভ'রে দিয়েছেন, কেউ কিছু মিষ্টি। আমার দিদিমা বেঁচেছিলেন তখনও, কলকাতায় এক মাসিমার বাড়িতে থাকতেন এসে মাঝে মাঝে। আমার পকেটে চুপি চুপি বাদাম-পেস্তা ভ'রে দিতেন দেখা হ'লেই। পরামর্শ দিতেন "পিকেটিং-এ সবার পেছনে থাকবি, আর পুলিস মারতে এলেই শুয়ে পড়বি, মাথা ফাটবে না তা' হ'লে'।" সুমন্ত্র ক্ষণিকের জন্য পূর্বস্মৃতির সমুদ্রে ডুবিয়া গেল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল তাহার।

সুকল্যাণী দেবী চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, "আমি দেখেছি তাঁকে বহরমপুরের বাড়ীতে। পাকা আমটির মতো সুন্দর চেহারা, কমবয়সে ডাকের সুন্দরী ছিলেন। ভারী মজার মানুষ। তাঁকেও হারিয়েছ বুঝি? আহা!"

সুমন্ত্র মিনিটখানেক নীরব থাকিয়া হাসিয়া বলিল, "মজার মজার কত উপদেশই দিতেন। একদিন বলেছিলেন 'বিয়ে যদি কখনো করিস, মণ্টু, সুন্দর দেখেই করিস। ঘর ক'রতে গেলে বউএর মুখঝামটা খেতে হবেই একদিন না একদিন। সুন্দর মুখের দাঁতখিচুনিও ভালো লাগবে, প্যাঁস্তাখ্যাচা কেউ যদি এসে দাঁত খিঁচোয় তাহ'লে সহ্য ক'রতে পারবি না তুই'।" উভয়ে হাসিয়া উঠিলেন।

সুমন্ত্র পরক্ষণেই সন্দেহভরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে সময়ে আপনাদের বাড়িতেও আসা চ'লত না, বোধ হয়, না মাসিমা?" সুকল্যাণী ছলছল চোখে বলিলেন, "আমার বাবা ছিলেন বিপ্লবী। অনেক দুঃখ দুর্গতি গেছে দেখেছি সেই নিয়ে আমার বাপের বাড়িতে। স্বামী ছিলেন সরকারী কর্মচারী, কিন্তু রাজভক্তিটা তাঁরও ধাতস্থ হয়নি। বাড়িতে আশ্রয় না দিলেও স্বদেশী-ও'লাদের তিনি অনেকরকমেই সাহায্য করতেন। তোমার বেলায় কি ক'রতুম ব'লতে পারিনা, বাবা। আমার নিজের ছেলে যদি স্বদেশী হ'ত তাহ'লে কি ফেলতে পারতুম? আবার সহায়হীনা মেয়েমানুষ আমি, ঘাড়ে ঐ অবুঝ আগুনের-খাপরা মেয়ে, ওর কথাও ভাবতে হয় বই কি? স্বদেশীর ফল তো আজ পর্যন্ত কিছু দেখলুম না, তাই ওদিকে যেতে ভয় হয়। আমি চাই এমন একটি ছেলে, যে অসময়ে আমাদের অভিভাবক হ'য়ে দাঁড়াতে পারবে।"

সুমন্ত্র মুহূর্তকাল ভাবিল। তাহার ব্রত বা ইচ্ছা যাহাই হউক, ইহাদের বহুদিনের ভয় বা সংস্কার সে একবারে দূর করিতে পারিবে না। অকারণ

বক্তৃতা দিয়া লাভ নাই। সুদেষ্ণাকে তো সে এইমাত্র খরচের খাতায় লিখিয়া আসিয়াছে। সে দূরে সরিয়া যায় যাক, নিজের পথেই সুখী হোক। বলিল, "আমার জানা ভালো ছেলে আছে, মাসিমা, আপনার মেয়ের জন্যে খোঁজ ক'রব? বলেন তো দেখি।"

সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "তাই দেখ, বাবা। তুমি ঘরের ছেলে, তোমায় আর কি ব'লব? কোনো চেষ্টাই যেন হচ্ছে না আমাদের পক্ষ থেকে। পুরুষমানুষ নিজের লোক কেউ কোমর বেঁধে না লাগলে কি হয়? কথায় বলে লাখ কথার কমে বিয়ে হয় না। হ্যাঁ বাবা, ঐ সুক্তোটা কেমন লাগল বল তো? আর ঐ মোচার ঘণ্টটা?"

সুমন্ত্র বলিল, "চমৎকার। আপনার রান্না খারাপ হ'তে পারে? কতদিন এমন মোচার ঘণ্ট খাইনি।"

"না বাবা, আমার নয়, সুদেষ্ণা রেঁধেছে ও-দু'টোই তোমার জন্যে। পায়েসটা ধরিয়ে ফেলেছে অবশ্য। তেতে পুড়ে এল ইউনিভার্সিটি থেকে, এসেই ঢুকেছে রান্নাঘরে। ঠাকুর আসতে আমিই জোর ক'রে নিয়ে গেছলুম ওপরে। স্বদেশীও'লাদের ওপর ওর ভারী ভক্তি। মাতামহের রক্ত গায়ে আছে তো।"

সুমন্ত্রের মনের ভিতর দিয়া সহসা যেন একটা আনন্দের দমকা হাওয়া অনতিপূর্বসঞ্চিত অপ্রসন্নতার সমস্ত কালো মেঘ উড়াইয়া লইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুদেষ্ণার জন্য পাত্র দেখার উৎসাহটাও তাহার যেন ফুরাইয়া গেল। পোড়াপায়সের বাটি নিঃশব্দে শেষ করিয়া সে উঠিয়া পড়িল। সুকল্যাণী দেবীর অনুরোধে ব্যঞ্জনের প্রত্যেকটি পদ বার-দুই করিয়া লইতে হইয়াছিল, ফলে খাওয়াটা একটু অতিরিক্তই হইয়া গিয়াছে। আঁচাইতে আঁচাইতে বলিল, "নাঃ, মাসিমা, আর আপনাদের বাড়ী কোনোদিন খাব না।"

সুকল্যাণী দেবী শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, "কেন বাবা, কি হ'ল?"

"এ-রকম খাওয়া সাতদিন খেলে আর বাঁচবনা। ফাঁসির খাওয়া বোধ হয় একেই বলে।"

সুকল্যাণী আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "বালাই ষাট, ওকি কথা? মাছ মাংস কিছুই হ'লনা আজ, মিথ্যে লজ্জা দিয়ো না বাবা।—"

সুমন্ত্র বলিল, "মাছ মাংস তো আমি খাইনা, মাসিমা।"

"ও হরি! তোমারও ঐ দশা? আমার মেয়ে না হয় আমার জন্যে মাছ

ছেড়েছে, তুমি কোন দুঃখে ছাড়লে বাবা ? এত ক'রে বলি মেয়েমানুষ কোথায় পড়বি তার ঠিক নেই, আইবুড়ো মেয়ের মাছ না খাওয়া অলক্ষণ"—

সুমন্ত্র যে সেটাকে সুলক্ষণ বলিয়াই মনে করে সে কথাটা বলিতে গিয়াও লজ্জায় বলিতে পারিল না। চুপ করিয়া রহিল। সুকল্যাণী বলিলেন,

"আবার কবে আসছ তাহ'লে !"

সুমন্ত্রের কর্তব্যজ্ঞান মাথা চাড়া দিয়া উঠিল, বলিল, "ভালো পাত্রের সন্ধান পেলেই আসব। আপনি কিন্তু আমার জন্যে আর কোনোদিন কোনো ব্যবস্থা রাখবেন না। আমি ভবঘুরে লোক আমার আবার খাওয়া! সামনের বাড়িটা খুলব হয়তো মাঝে মাঝে এসে, তবে সব সময়ে আপনাদের বিরক্ত ক'রব না। আপনারা কিছু মনে ক'রতে পারবেন না সেজন্যে। বিজ্ঞাপন দেখে যারা এসে ফিরে গেছে তাদের স্লিপগুলো দেবেন তো, মাসিমা, দেখা করে আসব একবার সবার সঙ্গে। তাদের মধ্যেও তো ভালো ছেলে থাকতে পারে ?"

"সত্যিই তো, কার হাঁড়িতে চাল দেওয়া আছে কে বল'তে পারে ? দেখ চেষ্টা করে।" সুকল্যাণী একগোছা টুকরা কাগজ আনিয়া দিলেন, সুমন্ত্রের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহার হাতে কিছু এলাচ ও সুপারির কুচা দিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন তিনি।

সুমন্ত্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একবার এদিক ওদিক চাহিল। কাহারও দেখা পাওয়া গেল না, কেবল দোতলায় উঠিবার সিঁড়ির বাঁকে একটা ছায়া সরিয়া গেল বলিয়া সন্দেহ হইল।

সুদেষ্ণাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সুমন্ত্র লোহাপটির মধ্য দিয়া হন হন করিয়া আমহার্স্ট স্ট্রীটের দিকে অগ্রসর হইল। মাথায় তখন তাহার হাজার চিন্তা ঘুরপাক খাইতেছে—আকাশ-পাতাল চিন্তা। সুদেষ্ণা কি তাহাকে সত্যই ভালোবাসিয়াছে? না হইলে সে তাহার জন্য রাঁধিতে বসিবে কেন, তাহার খোঁজ লইতে তাহার বাড়িতে ছুটিবে কেন? আবার সে যে সুমন্ত্রকে সন্দেহ করে সে কথাতো সে নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছে। একদা কলেজের সহপাঠিনীদের মধ্যে কেহ কেহ সুমন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; চন্দ্রাকে মনে পড়ে, অনিন্দিতাকে মনে পড়ে, অপরাজিতাকে মনে পড়ে। কিন্তু সে তো সেদিন সসম্মানে সে-সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। আর আজ কিনা মিসেস কুণ্ডুর জন্য সুদেষ্ণা তাহাকে দুর্নাম দিতে চায়? এত ছোটো মন তাহার? দূর হোক, কি দরকার তাহার ওসব চিন্তায়? সে দেশসেবক, পরাধীন দেশে স্বাধীনতার পূজারীর পক্ষে বিবাহের চিন্তাই পাপ। আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে অন্যমনস্কভাবে সুমন্ত্র বারতিনেক তিনজন পথচারীর সঙ্গে ধাক্কা খাইল, একবার রাস্তা পার হইবার সময় মোটর চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। অন্যের কটূক্তি তাহার কর্ণে ঢুকিলেও মর্মে প্রবেশ করিল না, তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিতে পারিল না। কিন্তু আচমকা একটা কথা মনে পড়িতেই সে চিন্তাজগৎ হইতে একটা প্রচণ্ড হোঁচট খাইয়া বাস্তবজগতে ফিরিয়া আসিল। হৃষীকেশ পার্কের কাছে আসিয়া হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, সুদেষ্ণার নিকট হইতে তাহার পটোলডাঙার বাড়ির চাবিটা চাহিয়া লওয়া হয় নাই। সুমন্ত্র পথের মধ্যেই থমকিয়া দাঁড়াইল। এখন উপায়? একবার ভাবিল চালতাবাগানে ফিরিয়া যাইবে, নিজের বাড়ীর চাবি চাহিতে লজ্জার কি আছে? আবার মনে হইল, সুদেষ্ণা তাহার এই ফিরিয়া যাওয়ার ভুল অর্থ করিতে পারে। সে হয়-তো ভাবিবে, লোকটার মধ্যে লজ্জা বা মানসম্ভ্রম বলিয়া কোনো পদার্থ নাই; এইমাত্র অপমানিত হইয়া মেজাজ দেখাইয়া গিয়াছে, ইহারই মধ্যে তাহার সুন্দর মুখখানার লোভ সামলাইতে না পারিয়া

লেজ নাড়িতে নাড়িতে ফিরিয়া আসিয়াছে। নাঃ, সে অসম্ভব। সুকল্যাণী দেবীর কাছে সে স্নেহযত্ন পাইয়াছে, তিনি তাহার মাতৃস্থানীয়া। তাঁহার কাছে সে কথা দিয়াছে সুদেষ্ণার জন্য পাত্র সন্ধান করিবে। সে-কথা সে রাখিবে, কর্তব্যের ত্রুটি করিবে না। কিন্তু সুদেষ্ণার নিকট হইতে শেষ দেখা বলিয়া যখন সে বাহির হইয়া আসিয়াছে তখন ভবিষ্যতে সাধ্যমতো তাহাকে সে বর্জন করিয়া চলিবে। তাহাদের বাড়িতে গেলেও এমন সময়ে যাইবে যে-সময়ে সুদেষ্ণা বাড়ি থাকে না। কিন্তু তাহার নিজের বাড়ি ঢুকিবার ব্যবস্থা কি হইবে? সুদেষ্ণার মা'র অসাক্ষাতে সুদেষ্ণার মুখদর্শন না করিয়া তাহার নিকট হইতে চাবিটা কি করিয়া উদ্ধার করা যায় তাহা কিছুতেই তাহার বুদ্ধিতে আসিল না। চিঠি লিখিলে মা'র হাতে পড়িবে, তাহাকে অপ্রস্তুতে ফেলা হইবে। হয় তো সে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিবে না, ভাবিবে চাবি চাওয়ার ছল করিয়া তাহার কাছে চিঠি লিখিয়া সুমন্ত্র কৃতার্থ হইয়াছে। ভালো বিপদেই পড়া গেল! সুদেষ্ণার এ কিন্তু ভারি অন্যায়! অপরিচিত একজন ভদ্রলোকের বাড়ির চাবি তাহার এ ভাবে আটকাইয়া রাখার কোনো অর্থ হয় না। তাহাকে মনে মনে দোষারোপ করিতে গিয়া সে যে কেন এই দুঃশীলা মেয়েটির অন্যায় আচরণের অনির্বচনীয় মাধুর্য অনুভব করিয়া অকারণে পুলকিত হইয়া উঠিল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। হ্যারিসন রোডের মোড়ে পৌঁছিয়া তাহার হুঁস হইল—আর চিন্তার সময় নাই, অবিলম্বে ভালোমন্দ যেরূপ হোক একটা আস্তানা তাহাকে যোগাড় করিতেই হইবে। পথের দু'ধারে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে, রাত্রে সে শুইবে কোথায়? ভদ্রেশ্বরের ভাড়া করা বাড়িতে ফিরিয়া যাইবে? সে বাড়ির চাবি তো তাহার পকেটেই রহিয়াছে? নাঃ, সে হয় না। তবে কি সেই কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ছাদে? সেও এখন অসম্ভব। সুদেষ্ণাকে জানিবার পর হইতে কেন যেন দুঃখ-বিলাসের বাহাদুরির লোভ তাহার চলিয়া গিয়াছে। আহারের জন্য না হয় কালিকা ভোজন আশ্রম আছে,—এখন কি জানি কেন সেখানকার স্মৃতিও তাহার কাছে অস্বস্তিকর বোধ হইতেছে,—কিন্তু স্নান করিবার, জামা কাপড় ছাড়িবার জন্যও তো একটা ঘরের দরকার? হঠাৎ মনে হইল, ভদ্রেশ্বরের বাড়ি গেলে কেমন হয়? অসুস্থ বন্ধুর খোঁজ লওয়া তো প্রয়োজন? তাহাকে দেখিলে স্বামীস্ত্রী দুইজনেই খুশি হইবে, খানিকটা ভরসা পাইবে, সে বিষয়ে

সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ বড়োমানুষী চালের মধ্যে সে কি টিঁকিতে পারিবে? যাক্, আজ রাত্রিটা তো কাটুক, কালকার চিন্তা কাল হইবে। সুমন্ত্র বালিগঞ্জেই গেল।

ভদ্রেশ্বরেরা যেন তাহার পথ চাহিয়াই ছিল। সে আসিবামাত্র শ্রীমতী কুণ্ডু দোতলায় একখানি সাজানো ঘর তাহাকে দেখাইয়া দিলেন। ছোটো একখানি খাট, তাহাতে ধবধবে সাদা খদ্দরের চাদর পাতা, আলনায় দুইখানি নূতন খদ্দরের ধুতি, দুইটি ফতুয়া, একটি তোয়ালে এবং একখানি মুগাপাড় খদ্দরের চাদর ঝুলিতেছে। টেবিলে কাঁচের ফুলদানীতে তিনটি সাদা গোলাপ, সেইসঙ্গে একটি দামী লেটার প্যাড, কিছু খাম, পোষ্টকার্ড ও টাইমপিস ছাড়া একটি মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো নূতন সাদা খাতা। দেয়ালে গান্ধীজীর ছবি।

সুমন্ত্র খুশি হইল, জামাকাপড়ের ব্যাপারে কিছুটা নিশ্চিন্ত হইল, তবু ইঁহাদের ব্যয় বাহুল্যের জন্য একটু বিব্রত বোধ না করিয়া পারিল না। বলিল,

"করেছেন কি মিসেস কুণ্ডু? একদিন কি দু'দিন থাকব, তা'র জন্যে কেন এত পয়সা নষ্ট ক'রলেন?"

শ্রীমতী কুণ্ডু হাসিয়া বলিলেন, "ফতুয়াটা প'রে জামাটা ছেড়ে দিন। পাঞ্জাবীর কাপড় আনানো আছে, আজ রাত্রেই কল চালিয়ে আপনার দু'টো জামা ক'রে দেব। কাল সকালে বেরোতে হবে তো ভদ্রসমাজে, সাবান দিলে শুকোবে না।"

সুমন্ত্র এবার সত্যই মুগ্ধ হইল। বলিল, "টাকার শ্রাদ্ধ ক'রছি আপনাদের,—পরিশ্রমেরও। বাড়িতে তো সবই ছিল আমার"—

শ্রীমতী কুণ্ডু বলিলেন, "ডোণ্ট ওয়রি, আই মীন্, ভাববেন না। 'কত ধন যায় রাজমহিষীর এক প্রহরের প্রমোদে'। আপনি আমার স্বামীর জীবন বাঁচিয়েছেন মিঃ সেন, মানে সুমন্ত্রবাবু, সে'কথা আমি ভুলবো না। এ আমার সার্থক খরচ। আর বাড়ি যাওয়া? একমাসের মধ্যে বাড়ি যাওয়ার চিন্তা ছেড়ে দিন। মিস্টার কুণ্ডুর তো এই সবে জ্বর ছাড়ল, তিনি একটু গায়ে বল পাবেন, আপনার সঙ্গে দিনকতক কাব্যচর্চা ক'রবেন, আপনার অন্ততঃ দশ পাউণ্ড ওজন বাড়বে,—তবে আপনার ছুটি।"

সুমন্ত্র হাসিয়া বলিল, "অর্থাৎ লাঙ্গুলহীন শৃগালেরা অন্যের লাঙ্গুল না কেটে ছাড়বেন না? আমাকে ভদ্রেশ্বরের মতো একটি পিপে না বানিয়ে মুক্তি দেবেন না স্থির করেছেন? আমি কিন্তু সে-ব্যবস্থাটা মেনে নিতে পারলুম না। আমার এখন অনেক কাজ। আর এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রামে ফিরতেই

হবে; এর মধ্যে দিনকয়েক উপার্জনের চেষ্টা ক'রতে হবে। সম্প্রতি আবার এক নোতুন দায়িত্ব ঘাড়ে চেপেছে। তা' বেশ, এখন সাতদিন আমি রাত্রে আপনাদের বাড়িতে থা'কব কথা রইল, দিনের বেলাটা কিন্তু আমায় ঘুরতে দিতে হবে। তা' ভদ্রেশ্বরের কি খবর? তা'র কাছে কে আছে?"

শ্রীমতী কুণ্ডু বলিলেন, "আবার ব'লছি 'ডোণ্ট ওয়রি' ভাববেন না। আপনার বন্ধু ভালোই আছেন, সৎসংসর্গেই আছেন।"

"সৎসংসর্গ? সে কি? সাধুসন্ন্যাসী কেউ এসেছেন নাকি?"

"আপনি ভুল ক'রছেন, সাধুসন্ন্যাসীদের সংসর্গ মোটেই 'হেল্‌দি' অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর নয়। আমি বলতে চেয়েছিলাম, 'হি ইজ ইন গুড কম্পানী', বাংলাটা বোধ হয় যথেষ্ট স্পষ্ট হয়নি। ইংরেজ নার্স রেখেছি, মিস মিল্‌ওয়ার্ড। লোক ভালো, একবার আমার অসুখের জন্য একমাস রেখেছিলুম ওকে। খুব যত্ন করে। রাত্রে আসবে মিসেস জনসন।"

ভদ্রেশ্বরের সেবাযত্নের তাহা হইলে ত্রুটি হইতেছে না। সুমন্ত্র অবশ্য নার্সের সেবার চেয়ে স্ত্রীর সেবা,—তা' যতই অপটুহস্তের হোক সে,—পছন্দ করিত, ভদ্রেশ্বরও হয়তো অন্তরে অন্তরে তাই করে, কিন্তু এ ব্যাপারে তাহার কথা বলা অনধিকারচর্চা হইবে। এখন তাহার চিন্তা হইল, সে নিজে কি বলিয়া আর ইহাদের বাড়ি আড্ডা গাড়িবে? সাংসারিক বুদ্ধি বিবেককে বুঝাইল, নিজের প্রয়োজনে যদিও উপস্থিত তাহাকে দিনকতক এ-বাড়িতে থাকিতে হইতেছে কিন্তু সে কাছে থাকিলে রোগীর মন ভালো থাকিবে, বাড়ির লোক একটু ভরসা পাইবে। তাহা ছাড়া ক'দিন ইহাদের জন্যই রাত্রি জাগরণ করিয়া তাহার শরীরটা ক্লান্ত হইয়াছে, দিনকতক এটাকে বিশ্রাম দেওয়া দরকার। সে আর কথা না বাড়াইয়া বলিল,

"চলুন, তা'কে একবার দেখে আসি।"

দুইজনে পর্দা সরাইয়া ভদ্রেশ্বরের ঘরে ঢুকিল। ঘসা কাঁচের মধ্য দিয়া বিচ্ছুরিত মৃদু বৈদ্যুতিক আলোকে ঘরের শ্বেতপাথরের মেঝেয় খানিকটা জল চকচক করিতেছিল। প্রথমেই কানে আসিল একটা চাপা গর্জন এবং ফোঁপানির শব্দ। জানালার দিকে চোখ পড়িল ছোটো টেবিলটাতে একটা এনামেলের গামলা, একটা বড় জগ, একটা স্পঞ্জ এবং একটা তোয়ালে; তাহারই মধ্যে মাথা গুঁজিয়া মিস মিল্‌ওয়ার্ড কাঁদিতেছে। এদিকে অসুস্থ ভদ্রেশ্বর পালঙ্কের একপ্রান্তে উঠিয়া বসিয়া কাতরস্বরে বলিতেছে,

"এক্সকিউজ মি, মিস।"

সুমন্ত্রের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। অপদার্থটা নিশ্চয় তরুণী শ্বেতাঙ্গিনীকে প্রেমনিবেদন করিতে গিয়াছিল। কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সংযত রাখিয়া সে প্রশ্ন করিল, "হয়েছে কি ?"

"হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। গা ধুইয়ে দিলে, মাথা আঁচড়ে দিলে, আমার হঠাৎ কেমন ছোটোবেলার কথা—আমার মা'র কথা মনে পড়ে গেল। দোষের মধ্যে বলেছি 'ইউ আর লাইক মাই মাদার', তুমি আমার মা'র মতো! তাইতে ক্ষেপে কেঁদে অস্থির। কিসে কি হয় ওদের বুঝি না, বাবা! বেশ ছিলুম ছকু খানসামার গলিতে"—

এই ব্যাপার! সুমন্ত্রের যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। মেমসাহেবের কাছে গিয়া বলিল, "কাঁদছ কেন ? মন্দ কথাটা কি বলেছে তোমাকে ?"

শ্রীমতী কুণ্ডু দাম বাড়াইবার জন্য ইংরেজ বলিয়া উল্লেখ করিলেও আসলে ভদ্রমহিলা দোঁ-আশলা অর্থাৎ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। বয়স চল্লিশ কি পঁয়ত্রিশ বলা যায় না, তবে যৌবন যাই যাই করিতেছে, অনেক কষ্টে তাহাকে ধরিয়া রাখা হইয়াছে। সুমন্ত্রের কথায় মেমসাহেব ফোঁস করিয়া উঠিল, ইংরাজীতে বলিল, "বলো কি ? অ্যাম আই লাইক হিজ মাদার ? আমি কি ওর মার বয়সী ? আমার কি পঞ্চাশ পার হয়েছে ? আমার কি দাঁত পড়ে গেছে ? চুল পেকে গেছে ? গায়ের মাংস কুঁচকে গেছে ? ও তো মানবদেহে একটা কূপো, ওর মা ! সাংঘাতিক ! ভাবলে আমার গা শিউরে ওঠে। আমার টাকা মিটিয়ে দাও, আমি আজই চলে যাব। ওঃ, আমার ফিয়াঁসে শুনলে ব'লবে কি ? জানো এই কোঁকড়া সোনালি চুল আমার নিজের, একটা দাঁতও আমার বাঁধানো নয়"—



অ্যাম আই লাইক হিজ মাদার

. নকল তরুণীর দুঃখ সুমন্ত্র বুঝিল। তাহার কথা অর্ধেক মিথ্যা হইলেও সে সত্য বলিয়া মানিয়া লইল। তাহাকে বুঝাইল, ভদ্রেশ্বর ভালো ইংরাজী জানেনা, 'সিষ্টার' বলিতে ভুল করিয়া 'মাদার' বলিয়াছে। "ডোণ্ট বি টু হার্ড অন হিম।" ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ হইবে না এই প্রতিশ্রুতি দিয়া তখনকার মতো তাহাকে শান্ত করিল। শ্রীমতী কুণ্ডু প্রথমটা খুবই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, শেষে হাঁফ ছাড়িয়া মেমসাহেবকে আর এক কাপ কড়া চা আনাইয়া দিলেন, স্বামীর দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "সিলি! যা করবে সব বাড়াবাড়ি। থ্যাঙ্ক গড, সুমন্ত্রবাবু ছিলেন এসময়ে।"

অতঃপর অনিশ্চিত কালের জন্য সুমন্ত্রের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা ভদ্রেশ্বরের বাড়িতেই হইল। কক্ষসংলগ্ন স্নানঘরে প্রত্যুষে স্নান সারিয়া বাহির হইলেই খানসামা টিপয়ের উপর পঞ্চোপচারে জলখাবার সাজাইয়া দিয়া যায়। প্রথম প্রথম দুই তিন দিন গৃহকর্ত্রী নিজে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বেলায় ওঠা অভ্যাস জানিয়া সুমন্ত্র বারণ করিয়া দিয়াছে। দুপুরে কোনোদিন হোটেলে, কোনোদিন কোনো বন্ধুর বাড়িতে বিনা নোটিসে মধ্যাহ্নভোজনের পাটটা সারিয়া লয়। রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া ভদ্রেশ্বরের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে, তারপর ষোড়শোপচারে আহার সারিয়া নিজের ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়ে। বাহিরে সে কি করে সে বিষয়ে ভদ্রেশ্বর বা তাহার স্ত্রী তাহাকে কোনো প্রশ্ন করেন না। নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রাত্রি একটা পর্যন্ত কবিতা লিখিলে বা নভেল পড়িলে কেহ তাহাকে বাধা দেয় না বা বিরক্ত করে না। এখানকার বৈঠকখানায়, ডাইনিং হলে বা টেনিস কোর্টে যে আর-একজাতায় জীবনযাত্রার ধারা বহিয়া চলিয়াছে, সে দূর হইতে তাহার আভাস পায় কিন্তু সেখানে তাহার ডাক পড়ে না। বাড়ির মধ্যে একখানি দক্ষিণের ঘরে তাহার অবারিত স্বাধীনতা। এইরূপ একটি বন্ধনহীন আশ্রয়েরই প্রয়োজন ছিল তাহার। সুমন্ত্র এই বাড়ির সুগৃহিণী গৃহকর্ত্রীর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অনুভব করিল। বিশেষ করিয়া ভালো লাগিল মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো খাতাখানি। পর পর কয়েকটি বিনিদ্র রজনীর আশা-আশঙ্কা-উদ্বেগের পরিচয়লিপি বহন করিয়া তাহার সাদা পাতাগুলি একে একে ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

সুমন্ত্র পাত্র খুঁজিতেছে। প্রথমত: সুকল্যাণীদেবীর নিকট হইতে সংগৃহীত বিবাহার্থীদের পরিচয়পত্রগুলি দেখিয়া সে একে একে প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করিল। বিজ্ঞাপনে 'স্বাস্থ্যবান' সচ্চরিত্র পাত্র, চাওয়া হইয়াছিল। বৈঠকখানা রোডে একজন স্বাস্থ্যবান সৎপাত্র অনেক ডাকাডাকির পর ম্যালেরিয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া আসিলেন। দরজা খুলিয়া বলিলেন,

"বাড়িতে কেউ নেই স্যার, একটু বার্লি ক'রে দেবার লোক নেই। পিলের ব্যথাটা আজ আবার খুব চাগিয়েছে। আপনি বুঝি ঐ মোড়ের ডিস্‌পেন্সারিতে নোতুন বসছেন?"

"আপনিই অপরেশবাবু? না আমি ডাক্তার নই, উকীল। সেদিন চালতাবাগানে কি আপনি নিজে গেছলেন? আপনার তো যাবার মতো অবস্থা মনে হচ্ছে না—"

অপরেশবাবু কঙ্কালসার দেহটাকে কোঁচার খুট দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করিতে করিতে ভীতকণ্ঠে বলিলেন, "আমার মামাতো ভাই গেছল, স্যার। তার চেহারাখানা সুন্দর, তাকেই পাঠিয়েছিলুম। এই শ্রীমূর্তি দেখলে পাছে পাত্রীপক্ষ ভড়কে যায়"—

সুমন্ত্র প্রশ্ন করিল, "বিয়েটা ক'রত কে? আপনি, না, আপনার মামাতো ভাই?"

অপরেশবাবু হাত কচলাইয়া বলিলেন, "বড্ড অভাবের সংসার, স্যার, তা'ছাড়া দু'টো রেঁধে দেবার লোক নেই। বিয়েটা আমিই ক'রতুম টাকা পেলে। একেবারে বিয়ের আসরে পিঁড়েয় গিয়ে ব'সলে কি আর কনে উঠে যেত?"

"তা' যেত। আপনি কাদের সঙ্গে জোচ্চুরি কর'তে গেছলেন জানেন না। আমি আপনার নামে কেস আনব 'ফল্‌স্ পারসনিফিকেশনের'।"

অপরেশবাবু দুই হাতে সুমন্ত্রের পা জড়াইয়া ধরিলেন, "দোহাই ধরম-বাবা, এযাত্রা ছেড়ে দিন, আর কখনও এমন কাজ ক'রব না!" সুমন্ত্রের দয়া হইল; আর কথা না বাড়াইয়া ফিরিল সে। চলিয়া আসিতে আসিতে শুনিল, "ঐ

মোড়ের ডাক্তারখানায় একটু ব'লে যাবেন, স্যার, আবার জ্বর আসছে"—। বলিয়া গেল সে, নাম ঠিকানা দিয়া গেল।

মাণিকতলা বাজারের কাছে বিডন স্ট্রীটের সচ্চরিত্র ভদ্রলোকটির বাড়িতে আসর বসিয়াছিল। দুইটি বন্ধুর মধ্যে একজন তবলায় চাঁটি দিতেছিলেন আর একজন সারেঙ্গী ধরিয়াছিলেন। ভদ্রলোক নিজে পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া নানা ভঙ্গীতে নাচিতে নাচিতে গাহিতেছিলেন,

'ওকি টিপ পরেছ মনমোহিনী, চাঁদপানা মুখে।'

সুমন্ত্রের আগমনে রসভঙ্গ হইল। ভদ্রলোক অপ্রসন্নমুখে বলিলেন,

"কে বাবা, অসময়ে জ্বালাতে এলে? চাঁদা ফাঁদা হবে না, ও খদ্দরে আর ভুলছি না।"

সুমন্ত্র বলিল, "চাঁদা চাইতে আসিনি। আপনারা কি বেস্পতিবার চালতাবাগানে একটি পাত্রীর সন্ধানে গেছলেন? পশুপতিবাবু কা'র নাম?"

মুহূর্তমধ্যে গৃহকর্তার মেজাজ বদলাইয়া গেল। "আপনি চালতাবাগান থেকে আসছেন? আরে আসুন, আসুন। আপনার পথ চেয়ে চেয়ে, মশাই, ক'দিনে চোখ কানা হ'য়ে গেল। কি বলো হে তোমরা, হয়নি?"

মোসাহেব দুইজন সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—

"আলবৎ! কানা কি, অন্ধ একেবারে! যাকে বলে ব্লাইণ্ড!"

পশুপতিবাবু বলিলেন, "বেশ, বেশ। বসুন, মশাই, এই তাকিয়াটা টেনে নিন ভালো ক'রে। একপাত্র চলবে? খাস বিলিতী মাল, হোয়াইট হর্স, পোর্ট, স্কচ,—হুইস্কি যা পছন্দ।"

"মাফ ক'রবেন। অভ্যেস নেই।"

পশুপতিবাবু বলিলেন, "তবে গোল্ডফ্লেক সিগারেট একটা? এও চলে না? আপনি যে কলিকালের শুকদেব এলেন, মশাই? ওরে রামা চা আনতে বল বাবুর জন্যে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারপর, কাজের কথা বলুন। কনে দেখাচ্ছেন কবে? আমার এক বন্ধু থাকে ঐ পাড়ায়, তার কাছে শুনেছি মেয়ে না কি অদ্ভুত সুন্দরী। আরে মশাই, মেয়েমানুষের আবার সুন্দর অসুন্দর। ঘরে এলে সব সমান। লাল চোখে কালোও সুন্দর লাগে মশাই। তবে হ্যাঁ, গান! শুনেছি নাকি গানও গায় ভালো!" তারপর ঘনিষ্ঠ হইয়া কানে কানে প্রশ্ন করিলেন, "নাচ জানে না কি? কি মশাই,

কথা কইছেন না যে? আজ কাল বেদেনী নৃত্য, চরকী নৃত্য তো ঘরে ঘরে, বলি বিলিতি নাচ জানে? ফক্স ট্রট? আমি দিনকতক শিখেছিলুম মশাই, আমার হাতে প'ড়লে সব শিখিয়ে নেব,—আহা! ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়। আহাহা! সুইট সিক্সটিন! হ্যাঁ মশাই, কত বয়েস হবে মেয়েটির?"

এই মাতালের হাতে সুদেষ্ণা! ছবিটা কল্পনানেত্রে দেখিয়া সুমন্ত্রের মিথ্যা কথা বলিতে বাধিল না। বলিল,

"আপনি যে কথা কইতেই সময় দিচ্ছেন না! ওঁদের অন্য জায়গায় পাত্র স্থির হ'য়ে গেছে, সেই কথাটা জানাতে এসেছিলুম।"

পশুপতিবাবু অবাক হইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন,

"আপনি মানুষ খুন কর'তে পারেন মশাই!"

মোসাহেব দুইজন চীৎকার করিয়া উঠিল, "খুন, খুন।"

সুমন্ত্র বাহির হইয়া আসিল।

•

দর্জিপাড়ার ভদ্রলোকটির ব্যবস্থা আরও চমৎকার। সদর দরজা হাট করিয়া খোলা, সেই পথ দিয়া সাত আট হইতে দশ বারো বৎসর বয়সের একদল ছেলে শ্রেণীবদ্ধভাবে যুদ্ধযাত্রায় চলিয়াছিল। সম্মুখবর্তী দলপতির বয়স এগারোর বেশী হইবে না, সে বলিল, "আমি যেই ব'লব ওয়ান, টু, থ্রি অমনি তোরা মার্চ ক'রে বেরিয়ে পড়বি। ওয়ান, টু—এই ক্যাবলা নাক খুঁটিসনি, গুঁতো, লাইন ভাঙচিস ফের? নাউ ওয়ান-টু থ্রি—ডবল মার্চ,—লেফট রাইট"—

সুমন্ত্রের পাশ দিয়া পাঁচজন প্যাকাটিনিন্দিতদেহ বীরবালক ঝড়ের বেগে পথে বাহির হইয়া গেল। সুমন্ত্র ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল তখনও যুদ্ধ শেষ হয় নাই, সামনের উঠানে আরও দুইটি পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সের ছেলে মারামারি কামড়াকামড়ি করিতেছে আর একটি বছরতিনেক বয়সের শিশু পিছন হইতে দুই চোখ বড়ো বড়ো করিয়া তাহাদের সেই বালি-সুগ্রীবের যুদ্ধ-দৃশ্য উপভোগ করিতেছে। নিমেষমধ্যে বড়ো ছেলেটি ছোট ছেলেটিকে ল্যাং মারিয়া চিৎ করিয়া ফেলিল, হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, "শেষ ক'রে দে'ব একেবারে"—

পিছন হইতে সেই ছোটো মেয়েটি বাঁশির মতো সরু গলায় মন্তব্য করিল, "ফুলদা বন্দুক দিয়ে গুলি ক'রে দে।"

সুমন্ত্র উঠানে ঢুকিয়া প্রথমে ভূপতিত বালকটিকে ধূলিশয্যা হইতে তুলিল, তারপর বলিল, "নিত্যচরণবাবু এই বাড়িতে থাকেন?" সঙ্গে সঙ্গে বালক ও শিশুকণ্ঠে সমস্বরে চীৎকার উঠিল,

"বাবা, তোমায় একটা ভদ্দরলোক ডাকছে।"

"কে-র‍্যা" বলিয়া সাড়া দিয়া যে ভদ্রলোক ভিতরের দরজা খুলিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন তাঁহাকে দেখিলে দিনের বেলাতেও গা ছমছম করে। সাক্ষাৎ মহিষাসুর, কেবল ক্ষুর আর শিং দুইটির অভাব। ভদ্রলোক থেলো হুঁকাটি মুখ হইতে নামাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কোথা থেকে আসছেন? নিবাস?" সে কথার উত্তর না দিয়া সুমন্ত্র বলিল, "আপনি কি শনিবার চালতাবাগানে একটি পাত্রীর খোঁজে গেছলেন? এই শ্লিপ আপনার?"

ভদ্রলোক তাঁহার ভয়ঙ্কর মুখখানিতে একটু হাসি ফুটাইতে চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, অধমের নামই নিত্যচরণ সেন। ক'দিন ধ'রে কোনো খোঁজখবর না পেয়ে ভাবলুম বুঝি আপনারা ভুলেই গেলেন। আজই যেতুম খোঁজ ক'রতে।"


ভয়ঙ্কর মুখখানিতে একটু হাসি

সুমন্ত্র বলিল, "আপনার কতদিন স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে?"

ভদ্রলোক অবাক হইয়া বলিলেন, "স্ত্রী বিয়োগ? স্ত্রীবিয়োগ হ'লে বছর বছর এই শূয়োরের পাল বিয়োবে কে, মশাই? কঙ্কালসার শরীরে দশাবতারের জন্ম দিয়েও মরেননি তিনি, সহজে ম'রবেন না?"

সুমন্ত্র ততোধিক বিস্মিত হইয়া বলিল, "আপনার আস্পর্ধা তো কম নয়? এই আণ্ডাবাচ্ছার পাল নিয়ে স্ত্রী বর্তমানে আপনি বিয়ের চেষ্টায় ঘুরছেন? লজ্জা করে না আপনার?"

"লজ্জা!" নিত্যচরণবাবু খাড়া হইয়া দাঁড়াইলেন। ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আপনার মতো গোঁফ কামিয়ে মেয়েমানুষ হইনি, মশাই। পুরুষবাচ্ছা

আমি, লজ্জা কিসের? আপনারা বিজ্ঞাপনে কি লিখেছিলেন—বিবাহিত পাত্র চ'লবে না?"

"সচ্চরিত্র পাত্র চাওয়া হয়েছিল।"

নিত্যচরণবাবু বলিলেন, "হাসালেন, মশাই? পুরুষমানুষের বারটান না থাকলেই তা'কে বলে সচ্চরিত্র। ঘরে বউ না থাকলে কখনও মানুষ সচ্চরিত্র থাকতে পারে? এই তো এ-পাড়ায় পনেরো বছর বাস ক'রছি, কেউ বলুকদিকি আমার চরিত্র খারাপ?"

আর কথা বাড়াইতে প্রবৃত্তি হইল না, সুমন্ত্র ফিরিবার জন্য পা বাড়াইল। ভদ্রলোক বলিলেন "যাচ্ছেন কোথায়, মশাই, জবাব দিয়ে যান। আমাকে আপনি প্রকারান্তরে বদনাম দিয়েছেন, আমি ডিফ্যামেশন স্যুট আনতে পারি।"

"যা খুশি ক'রতে পারেন আপনি" বলিয়া সুমন্ত্র বাহির হইয়া আসিল। ভদ্রলোক পিছন পিছন দরজা পর্যন্ত আসিয়া মন্তব্য করিলেন,—"শ্ শালা!"

সেই সঙ্গে বাঁশির মতো মিষ্টকণ্ঠে টিপ্পনী ভাসিয়া আসিল, "বাবা, একেবারে বন্দুক দিয়ে গুলি ক'রে দাও।"

আরও দুইজনের কাছে গেল সুমন্ত্র, দেখা গেল দুজনেরই পাত্রীর চেয়ে তাহার সম্পত্তির উপর বেশী লোভ। সুমন্ত্র বিরক্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত স্কুল কলেজের সহপাঠীদের দ্বারস্থ হইল।

প্রথমেই গেল আই, সি, এস নীতিশ গুপ্তের বাড়ী। হিন্দু স্কুলে এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে বহুদিন একসঙ্গে পড়িয়াছে, তাহার উপর খানিকটা জোর চলে। মফঃস্বল হইতে বদলি হইয়া সম্প্রতি রাইটার্স বিল্ডিংএ বসিতেছে নীতীশ, ঠিকানা খুঁজিয়া ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িটা বাহির করিতে বেগ পাইতে হইল না। নীতিশ ছেলে ভালো, সংস্কৃত কাব্য পড়ে, বাড়িতে রাত্রে ধুতি পাঞ্জাবী পরে, বাহিরে সাহেবী চাল বজায় রাখিয়া চলিলেও মানুষটা সহৃদয় এবং বন্ধুবৎসল। সুমন্ত্র বেয়ারার মারফত সংবাদ দিবামাত্র নামিয়া আসিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল,

"আজ সূয্যি কোন্‌দিকে উঠেছে?"

"পশ্চিমেই হবে বোধ হয়।" সুমন্ত্র তাহার আলিঙ্গনপাশ মুক্ত হইয়া তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। হাঁ সুদেষ্ণার যোগ্য পাত্র বটে,—রূপে, গুণে, কুলে, শীলে—

"হাঁ করে দেখছিস কি, আমার কি লেজ বেরিয়েছে?"

সুমন্ত্র বলিল, "বেরোয়নি দেখেই একটু আশ্চর্য হচ্ছি, বিলেত ঘুরে এলে অনেকেরই বেরোয় কিনা! যাক, কেমন আছিস বল্?"

ড্রয়িংরুমে বন্ধুকে সম্মুখের গদিমোড়া চেয়ারটায় বসাইয়া নিজে একটা আরাম কেদারায় গা এলাইয়া নীতিশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এই আছি।"

"আছ তো দেখতে পাচ্ছি, বলি সুখে আছ, না, দুঃখে আছ? স্বর্গে না মর্তে? বিয়ে করবে?"

নীতিশ অবাক হইয়া বলিল, "তুমি আমার খোঁজ রাখো না বটে কিন্তু আমি তোমার খোঁজ নিয়মিত রাখি। ছাত্রনেতা, কবি, জেলের আসামী, শেষ পর্যন্ত কিনা ঘটক? এ ব্যাপারটা কদ্দিন ধরেছ ভাই?"

সুমন্ত্র বলিল, "ঠাট্টা নয়, সত্যি একটি ভালো মেয়ে আছে, আমার জানা—"

নীতিশ আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আর মাস কতক আগে আসতে যদি? বেয়ারা, মেমসাহেবকে সেলাম দাও, বলো সুমন্ত্রবাবু এসেছেন?"

যাক একটা জাঁদরেল সৎপাত্র হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। সুমন্ত্র হতাশভাবে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। নীতিশ চেয়ারটা আর একটু কাছে টানিয়া বসিল, বলিল "মেয়েটি কি আত্মীয়া?"

"তা ঠিক নয়। মা'র বন্ধুর মেয়ে।"

"কথা শোন্ সুমন্ত্র। পরের দায়ে তো চিরজীবন খাটলি, এইবার নিজের ব্যবস্থা একটা কিছু কর। পরে বয়েস চলে গেলে আফশোষ করবি। মেয়েটি যদি সত্যিই ভালো হয়"—

বন্ধুপত্নী অনসূয়া গুপ্তা আসিয়া হাসিমুখে প্রবেশ করিল, পিছন পিছন চা ও জলখাবারের ট্রে হাতে লইয়া খানসামা আসিল। কুশলপ্রশ্ন বিনিময়ের পর চা খাইতে খাইতে সুমন্ত্র বলিল, "কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে?"

অনসূয়া বলিলেন, "আমাদের বাড়ীতেই দেখে থাকবেন। আমি ক্ষিতীশের বোন,—ক্ষিতীশ মুখুজ্জেকে মনে পড়ে তো?"

"আরে তাই বলো, তুমি? কতটুকু দেখেছি তোমাকে? বেশ বেশ, বড়ো আনন্দ হ'ল। তা তোমার দাদার কি খবর? সে তো এখন মস্ত অ্যাটর্ণি? বিয়ে করেছে?"

অনসূয়া বলিলেন, "বিয়ে তো কবেই হয়ে যেত, আমার এক সহপাঠিনীকে দেখে সেই যে মাথা ঘুরে গেল, তিন বছর আর কোনোদিকে চাইলে না। সে মেয়েও আবার তেমনি ; মানে ভীষণ ভালো মেয়ে, মাতৃআজ্ঞা ছাড়া নড়ে না; সেও অঘরে বিয়ে করবে না। তারা বদ্যি, আমরা বামুন। আমার বেলায় অবশ্য কোনো বাধা হয়নি, বাবার ও সব প্রেজুডিস নেই, রেজিষ্ট্রী করে বিয়ে হয়েছে আমাদের। সুদেষ্ণার তো তা হ'বার জো নেই"—

সুমন্ত্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "কোন্ সুদেষ্ণার কথা বলছ? সুদেষ্ণা দাশগুপ্তা। ফিফ্‌থ্ ইয়ারে পড়ে ?"

অনসূয়া বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, একসঙ্গে বি, এ দিয়েছি আমরা, ফিলশফিতে অনর্স ছিল ওর। চেনেন নাকি ? ভারি সুন্দর মেয়ে কিন্তু! কি চমৎকার গলা! গান শুনেই তো দাদা মজে গেল। দাদার তো আজও কত বড়ো বড়ো সম্বন্ধ আসছে। ভালো রোজগার, ঘরে পয়সা আছে, দেখতেও নিন্দের নয়—ও ছেলে কি পড়তে পায়? নিজে গেছলুম সুদেষ্ণাদের বাড়িতে ঘটকালি করতে। তার মা শেষ পর্যন্ত বললেন, 'তোমরা তো আমাদের চেয়ে উঁচু ঘর মা, পাত্রও ভালো। দেখ, যদি মেয়ের মত হয় আমি আপত্তি করব না।' কত বোঝালুম পোড়ারমুখীকে, কিন্তু তার সেই এক কথা, রেজিস্ট্রি করে বিয়ে সে করবে না। বলে, 'মা মুখে বলছেন বটে, কিন্তু মন তাঁর সায় দিচ্ছে না! আমি ছাড়া মা'র আর কেউ নেই, মা'র মনে দুঃখ দে'ব না আমি।' শুনুন কথা! আজকালকার দিনে এরকম গোঁড়ামি কি ভালো ? এদিকে কিন্তু খুব আমুদে মেয়েটা। রোজ চীনেবাদাম খেতে খেতে কতরকম মজার গল্প যে করবে কমন রুমে। আবার পরোপকারীও খুব। একটি গরিবের মেয়ের কলেজের মাইনে দেয়, দু'টি বিধবার খরচ যোগায় জলখাবারের পয়সা আর ট্রামভাড়া বাঁচিয়ে,—একথা কিন্তু বলবেন না কাউকে, আমরা দু'জন প্রাণের বন্ধু ছাড়া আর কেউ জানে না, ওর মাও না"—

সুমন্ত্র মুগ্ধ হইয়া গেল। নীতীশ বলিল, "বৌভাতের দিনে দেখেছিলুম মনে হচ্ছে। জানো হে সুমন্ত্র, সে একেবারে ইন্দুমতী স্বয়ংবর সভার ব্যাপার! সাক্ষাৎ সঞ্চারিণী দীপশিখা, রাস্তার যেখান দিয়ে যাচ্ছে দু'পাশের বাড়ির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আর পেছনের বাড়িগুলির মুখ সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ছে বটে ?"

অনসূয়া সোৎসাহে বলিল, "মনে রাখার মতো মেয়ে যে।" জানালা দিয়া

রাস্তার অপর ফুটপাথে কিছু দূরের একটা তেতলা বড় বাড়ি দেখাইয়া বলিল, "ঐটে ওদের নিজের বাড়ি সুমন্ত্রবাবু। আজকাল ওটা ভাড়া দিয়ে কোথায় গলির মধ্যে একটা ছোটো বাড়িতে পড়ে আছে। কে বলবে যে বড়োলোক? কয়েক লাখ টাকার মালিক!"

সুমন্ত্র বলিল, "তারই সম্বন্ধ করতে এসছিলুম আজ, তা দেখছি—'নো ভেক্যান্সি'।"

অনসূয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, বলিল, "তা'হলে বড্ড হতাশ করলুম বলুন আপনাকে?"

নীতিশও লাফাইয়া উঠিল। বলিল, "বলো কি, সুমন্ত্র? তোমার হাতে এমন ফার্স্ট্‌ক্লাস বস্তির মেয়ে থাকতে আমি শেষটা অঘাটে ঘড়া ভরলুম? হ্যাঁ, দেখ অনসূয়া, হাজার হোক তুমি হ'লে ব্রাহ্মণকণ্যা, আমার নমস্যা। মুহূর্তের ভুলে যদি বিয়েই করে থাকো আমাকে, তাই বলে সেই ভুলটাকে চিরদিন আঁকড়ে থাকতে হবে এমনই কি দায়ে পড়েছ? রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করার ঐ সুবিধে, ধরতে ছাড়তে কোনো বাধা নেই। তা দেখ, আমি একটা পাষণ্ড, এতদিনে তা বুঝতে তোমার নিশ্চয়ই বাকি নেই। তোমাকে রোজ সিনেমায় নিয়ে যাই না, হীরেমুক্তোর গহনা কিনে দিই না,—তুমি আজই ডিভোর্সের জন্যে দরখাস্ত দাও নিষ্ঠুরতার অভিযোগে,—আমি অপরাধ স্বীকার করে নেব।"

অনসূয়া হাসিয়া বলিল, "তাতেও বিশেষ সুবিধে হবে না, সে বড়ো কঠিন ঠাঁই। আমি ডিভোর্স করলেও বন্ধুর স্বামীকে সুদেষ্ণা পায়ের কড়ে আঙুলে করেও স্পর্শ করবে না। তার জীবনে আদর্শ আছে। না খেয়ে থাকবে, তবু আদর্শ ছাড়বে না।"

নীতিশ হতাশভাবে আরামকেদারায় গা এলাইয়া দিয়া বলিল, "তাই তো!" পরক্ষণেই মৃদুস্বরে গাহিতে আরম্ভ করিল, "পরপুরুষের ছায়াপরশিতে সচেল সিনান করি। সখিরে—"

সুমন্ত্র বলিল, "এই নিয়ে পাঁচটি হ'ল, কোথাও জুত করতে পারছি না। মাসিমা অনেক করে বলেছেন, চেষ্টা করছি তো, দেখি। তোমাদের সন্ধানে কেউ থাকলে জানিয়ো। ঠিকানা তো জানোই পটলডাঙ্গার সেই বাড়িতেই আছি কয়েকদিন এখন।" আর দুই এক কথার পর দেয়ালে ঘড়িটার দিকে নজর পড়িতেই সুমন্ত্র দাঁড়াইয়া উঠিল; বলিল, "আজ তা'হলে উঠি এখন, অনেক সময় নষ্ট করলুম। আচ্ছা অনসূয়া—সৎপাত্র পেলে"—

নীতিশ বলিল, "সর্বনাশ, আমারও তো বেরোবার সময় হয়ে এল। বেয়ারা।—হ্যাঁ, সৎপাত্র? সত্যি কথা বলতে কি সৎপাত্র একটি আছে সন্ধানে, তবে রাজি হ'লে হয়। নিজের ভালো বোঝে না"—

সুমন্ত্র বলিল, "সত্যি মেয়েটি বড়ো ভালো। পাত্রটি তার উপযুক্ত হওয়া চাই কিন্তু।"

দুইজনে ততক্ষণে দোতলায় উঠিবার সিঁড়ির মুখে পৌছিয়াছে, পিছনে অনসূয়া। নীতিশ সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, "সে কথা বলাই বাহুল্য। ওগো, তুমি মনে রেখ কথাটা। তোমার দাদার তো কোনো আশাই নেই, দেখ যদি দাদার বন্ধুটির কোনো কাজে লাগতে পার। আচ্ছা, 'রভুয়ার, ও থুড়ি, পুনর্দর্শনায় চ।"



"ও রভুয়ার"

"পুনর্দর্শনায় চ" বলিয়া সুমন্ত্র পথে বাহির হইয়া আসিল।

অতঃপর সুমন্ত্র গেল বন্ধু ত্রিপুরারি রায়ের ডাক্তারখানায়। ত্রিপুরারি বয়সে তাহার চেয়ে বেশী বড়ো না হইলেও অকালবার্ধক্যের ছাপ পড়িয়াছে তাহার মুখাবয়বে। সেটা সে গর্বের বিষয় বলিয়াই মনে করে। সে মোটা বেতনে একটা বড়ো বিলাতী ঔষধের দোকানে বসে, তাহা ছাড়া প্রাইভেট প্র্যাকটিসেও তাহার উপার্জন মন্দ নয়। গাড়ি করিয়াছে, বাড়ি করিয়াছে, কেবল শাড়ীর অভাব। প্রশ্ন করিলে বলে, "পাড় পছন্দ হয় না।" তাহার নিজের ডাক্তারখানায় ধনী-দরিদ্রের ভিড় সমান। যে ষোলো টাকা দিবে আর যে এক-পয়সা দিবে না, দুইজনকেই সমানভাবে ধমক দিতে তাহার বাধে না। তবে মুখটা খারাপ হইলেও ত্রিপুরারির মনটা ভালো, দয়াধর্ম, দানধ্যান আছে, সুদেষ্ণাকে সুখী করিবার শক্তি আছে তাহার। বাহিরে তিনজন রোগী বসিয়া আছেন, একখানা মোটরও দাঁড়াইয়া আছে। ভিতরে একটা ছোটো ঘরে ডাক্তার একটি দরিদ্র রোগীকে পরীক্ষা করিতেছিল। সুমন্ত্রের অবাধ গতি। তাহাকে দেখিয়া স্টেথোস্কোপভূষিত মাথা নাড়াইয়া

ডাক্তার চোখের ইঙ্গিতে বসিতে বলিল, তারপর রোগীকে প্রশ্ন করিল।

"গাঁজা ছাড়তে পারবে?"

রোগী বিস্ময়সূচক মুখব্যাদান করিয়া বলিল,

"গাঁজা তো আমি কোনোদিন খাইনি, ডাক্তারবাবু?"

"তুমি না খাও তোমার বাবা খেয়েছে। রক্তে রয়েছে, নাড়ীতে পাচ্ছি।" রোগী মুখ নীচু করিল।

সুমন্ত্র অবাক হইয়া গেল। নাড়ীতে গাঁজা পায় ডাক্তার, আশ্চর্য শিক্ষা বটে! ডাক্তার প্রথমে অপরাধ সম্বন্ধে জেরা করিতে করিতে রোগীকে প্রায় ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল, তারপর আক্রমণের দিক্ বদলাইল, রোগের উপসর্গের ফিরিস্তি চাহিল। বলিল, "কান কট কট করে, আর কি হয়?"

"রোজ সন্ধ্যে হ'লেই চোখ দিয়ে জল পড়ে"—

"জল প'ডবে না তো কি সরবৎ প'ড়বে? তারপর সুমন্ত্র, কি মনে ক'রে বলো তো?"

সুমন্ত্র বলিল, "একটু কাজ ছিল। তুমি হাতের কাজ সারো, আমি না হয় একটু বসি।"

"তবেই হয়েছে। বলি কা'কে দেখতে যেতে হবে? কলেরা, না বসন্ত,—কেসটা কি? ওষুধপথ্য তুমি দেবে, না সেও আমাকে দিতে হবে?"

সুমন্ত্র হাসিয়া বলিল, "সেসব কিছু নয়, এ তোমারই সঙ্গে একটু ব্যক্তিগত কথা"—

ত্রিপুরারি ভয়ের ভান করিয়া বলিল, "কি সর্বনাশ! আমার পেছনেও টিকটিকি লেগেছে নাকি? জ্বালালে দেখছি। তুমি, বাবা, দাগী আসামী, গরিবের ঘরে তোমার শুভাগমন কেন? ক'রে খেতে দেবে না? কতদিন বাইরে আছ এবার?"

"ভয় নেই, তোমারই ভালোর জন্যে একটা খবর এনেছিলুম। আমার সঙ্গে পুলিস ঘোরে না আজকাল।"

ত্রিপুরারি বলিল, "লোকের পিতৃদায়, কন্যাদায় হয়, দু'দিনে মেটে। তোমার বন্ধুদায়তো জীবনভোর চ'লছেই। বলি আমার ভালোর জন্যে চেষ্টা না ক'রে নিজের ভালোর জন্যে একটু চেষ্টা ক'রলে যে বাঁচতুম। ওকালতিটা ক'রলি না, ছবি আঁকাটা ছেড়ে দিলি, এরপর বুড়োবয়সে খাবি কি ক'রে বল দিকি? নে ভাই নে, কাজের কথা কিছু থাকে তো সেরে

নে চটপট, আমার এই ঘরের মূর্তিমান্‌দের জবাই ক'রে এখনি বাইরে ছুটতে হবে আবার। অনেকগুলো রুগী হাতে আজ।"

সুমন্ত্র বলিল, "কথাটা একটু গোপনে হ'লে ভালো হ'ত না?"

ত্রিপুরারি বলিল, "কি, বাবা? বোমা, না, স্বদেশী ডাকাতি? ও-সবের মধ্যে আমি নেই।"

সুমন্ত্র বলিল, "তোর মাথা খারাপ। ব'লছি তো'র নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার। চল, একটু আড়ালে যাই।"

ত্রিপুরারি বলিল, "তুই হাসালি। ডাক্তারের আবার গোপন কথা? বলে বিধবার আবার বাহার?" রোগীটির দিকে চাহিয়া বলিল, "কান কট কট ক'রলে এই ওষুধ একটু ক'রে দিয়ে বোরিকতুলো গুঁজে রাখবে কানে"—বলিতে বলিতে তাহার দুইকানে বেশ করিয়া তুলা ঠাসিয়া দিয়া বলিল, "নেঃ, হ'ল গোপন? বল এবার।"



'নাড়ীতে পাচ্ছি'

অগত্যা সুমন্ত্র আসল কথা পাড়িল, "বিয়ে ক'রবে?"

"কানা, না খোঁড়া? বয়স তিরিশ পেরিয়েছে, না এক বছর বাকী আছে? আবলুস, না তাল গাছ?"

"কি ব'লছ তুমি?"

"ব'লছি পরিবারে ক'জন? সবারই ভার নিতে হবে, না কেবল পাত্রীর নিলে চ'লবে? তোমার ঘটকালি জানতে তো আমার বাকী নেই! আমার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে তুমি ফাঁকতালে পুণ্যি ক'রে নেবে, সেটি হচ্ছে না। সে বয়েস কেটে গেছে।"

"যদি বলি পাত্রীটি সুন্দরী, শিক্ষিতা, সুগায়িকা, ক'লকাতায় কয়েকখানা বাড়ির মালিক?"

"ব'লে যাও। শেষকালে বুড়ো-বয়সে গুলি খেতে আরম্ভ ক'রলে? গাঁজা তো পদে ছিল?"

"সত্যি ব'লছি, আমার পরিচিতা একটি খুব ভালো মেয়ে আছে,—হ্যাঁ ভাই, গাঁজা কি ক'রে নাড়ীতে পেলি?"

"নাড়ীতে, না ছাই।" ইংরাজীতে বলিল, "জামার গন্ধে ধরা প'ড়ল। হ্যাঁ, তারপর?"

"তারপর সবই ভালো। বাপ ছিলেন জজ, মাও একজন মহীয়সী মহিলা। তবে সেখানে বিয়ে ক'রতে হ'লে তোমার মেজাজটা একটু নরম ক'রতে হবে।"

"সে আর এ কাঠামোয় হবে না ভাই, একেবারে কাঠে-খড়ে হবে। যাক, বলি, এসব সত্যি, না ধাপ্পা দিচ্ছিস?"

সুমন্ত্র বলিল, "তোমাকে ধাপ্পা দিয়ে আমার লাভ?"

"তা' বটে? তা হ'লে বিষয়টা একটু চিন্তা ক'রে দেখতে হয়। মেয়েটি শিক্ষিতা, না? বি, এ, না এম, এ? পিঠ কুঁজো নয়? চোখে চশমা নেই? দাঁতে পায়োরিয়া নেই? হার্ট, লাংস্ সব ঠিক আছে তো? ব্লাডপ্রেসার কত? ওয়েট, হাইট জানিস?"

"সে-সব তুমি যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা কোরো। কখন যাচ্ছ বল?"

আলাপ আলোচনার পর স্থির হইল পরদিন সকালে ডাক্তার পাত্রী দেখিতে যাইবে।

সুমন্ত্র সওয়া আটটার সময় হেদুয়ার মোড়ে অপেক্ষা করিবে, ত্রিপুরারি তাহাকে নিজের মোটরে তুলিয়া লইবে চালতাবাগানে যাইবার জন্য। সুমন্ত্র উঠিতেছিল, ত্রিপুরারি হঠাৎ নিজের ডায়েরি হাতড়াইতে হাতড়াইতে মত বদলাইয়া ফেলিল, বলিল, "আরে আজই তো দু' ঘণ্টা ফ্রি আছি বিকেলে! একটা কাজ ক'রলে কি রকম হয়?"

"বল কি ক'রতে চাও?"

"যদি একা যাই? তোমার নাম ক'রব না, যেন বিজ্ঞাপন দেখেই যাচ্ছি।"

"এতদিন পরে গেলে তাঁরা ঠিকই বুঝবেন, তা'ছাড়া আমি সঙ্গে না থাকলে তাঁরা একটু বিব্রত বোধ ক'রবেন না?"

"মোটেই না। আমি খেতেও যাব না, কুটুম্বিতা ক'রতেও যাব না।

ঘড়ি ধ'রে দশ মিনিট কি পনেরো মিনিট ব'সব, কাজের কথা সেরে চলে আসব। তুমি সঙ্গে থাকলেই বরং আমি একটু বিব্রত বোধ ক'রব। তোমার ব্যাকগ্রাউণ্ডে আমার রূপগুণ কিছুই খুলবে না, এমন কি কথাও কইতে পারব না হয়তো ভাল ক'রে। কখন কলেজ থেকে ফেরে? পাঁচটায় নিশ্চয় বাড়ীতে পা'ব?"

সুমন্ত্র আপত্তি করিতে পারিল না। সেই দিন বৈকালেই ত্রিপুরারির মোটর সুদেষ্ণাদের গলিতে হাজির হইল। দশ মিনিটের বেশী সত্যই বসে নাই ত্রিপুরারি, তাহার রক্তচাপ-মাপক যন্ত্র এবং অন্যান্য আয়োজন কোনো কাজেই লাগে নাই। সন্ধ্যার কিছু পুর্বে সে যখন বাড়ি ফিরিল, তখন সুমন্ত্র তাহার ডাক্তারখানায় অপেক্ষা করিতেছিল। দেখিল ত্রিপুরারির মুখ বেশ গম্ভীর, বোঝা গেল মনটা খুবই বিচলিত হইয়াছে। সুমন্ত্র জিজ্ঞাসা করিল, "হ'ল কি?"

"সুবিধে হ'ল না ভায়া" বলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ত্রিপুরারি টুপিটা টেবিলে আছড়াইয়া ফেলিয়া ধপ করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

"অসুবিধেটা কিসের হ'ল? চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শোনাতে গেছলে, মুখের মতন জুতো হয়েছে?"

"আরে না, ভাই। তা'হ'লে তো বাঁচতুম। এযে—কথাই হ'ল না কিছু। মেয়েটা বড়ো প্যানপেনে। ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যাণ্ডের দোষ আছে।"

সুদেষ্ণা প্যানপেনে? বলে কি ডাক্তার? সুমন্ত্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "তুমি কা'কে দেখে এলে হে?"

"দেখে এলুম একটি পরমাসুন্দরী কন্যাকে। কার্ড পাঠাতে চাকর নিয়ে গিয়ে বসালে বৈঠকখানায়। মা এসে দাঁড়ালেন দরজার পাশে, মেয়ে এসে ব'সলেন চৌকিতে।" ত্রিপুরারি যেন কল্পনানেত্রে দৃশ্যটা দ্বিতীয়বার দেখিয়া লইতে লাগিল। সুমন্ত্র তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া বলিল, "তারপর?"

"তারপর? এসে ব'সলেন, মুখখানিতে মেঘ থম থম করছে যেন। নাম জিজ্ঞেস ক'রতে অস্পষ্ট স্বরে কি ব'ললেন বোঝা গেল না। এম. এ.-তে পাঠ্য বিষয় কি নিয়েছেন জিজ্ঞেস ক'রতে ব'ললেন, 'দর্শন।' তারপর স্বাস্থ্য কি-রকম জিজ্ঞেস ক'রতেই টপ টপ ক'রে দু' ফোঁটা জল বেরিয়ে এল চোখ দিয়ে, কথার জবাবটা আর বেরোল না মুখ থেকে। আমি ভাই সব সইতে পারি, ঐ মেয়েমানুষের চোখের জল সইতে পারি না

কেবল। বললুম, 'আপনার মনে কি আঘাত দিলুম?' তা'তে ঝর ঝর ক'রে আরও পাঁচ-সাত ফোঁটা অশ্রু উপহার দিলেন ভদ্রমহিলা। অগত্যা আমিই ক্ষমা চেয়ে উঠে এলুম। ওঁর মা ব'ললেন 'শরীরটা ভালো নেই।' আমি তো ডায়্যাগনসিস করেছি মনটাতেই ক্যান্সার হয়েছে ওঁর। ঐ সব বয়স্থা মেয়ে—শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়েদের বিয়ে ক'রতে যাওয়ার বিপদ আছে, ভায়া। কোথায় কোন্ স্কাউণ্ডেলকে মনটি সঁপে দিয়ে ব'সে আছেন কবে, এখন আর কাউকে ধ'রছে না চোখে। না, ভাই, যত সুন্দরীই হোন তোমার আত্মীয়া, আমার পোষাবে না। প্রাণহীন দেহের প্রতি লোভ নেই। চিরজীবন ঐ কান্না আমি সইতে পারব না।"

সুমন্ত্র সেদিন এক বিচিত্র অনুভূতি বক্ষে লইয়া ডাক্তারখানা হইতে বাহির হইল। সুদেষ্ণা কাঁদে? সে-মেয়ে ত্রিপুরারিকে চাবুক হাতে তাড়া করিয়াছে শুনিলে সে হয়তো এতটা বিস্মিত হইত না, কিন্তু কান্নার সঙ্গে কোথায় যেন তাহার বিরোধ আছে, সে কাঁদে এ যেন দেখিলেও বিশ্বাস হইবার নয়। একটা কথা মনে পড়িল। এক সময়ে একটি দরিদ্র বধূকে স্বামীর নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতে বাঁচাইবার জন্য সুমন্ত্র কোনো বোর্ডিংস্কুলে নিজ খরচে ভর্তি করিয়া দেয়। সেজন্য মামলা আদালত পর্যন্ত গড়াইয়াছিল, সে সসম্মানে মুক্তি পাইয়াছিল। কিন্তু কাগজে খবরটা বাহির হয় নাই। বাংলা দেশের কয়েকখানা শ্রেষ্ঠ দৈনিকপত্রের সম্পাদকের সঙ্গে তাহার পরিচয় আছে। শত্রুপক্ষ সেই-রূপ একখানা কাগজে তাহার বিরুদ্ধে নারীহরণের অভিযোগ ছাপাইতে গেলে শ্রদ্ধেয় সম্পাদকমহাশয় বলিয়াছিলেন, "বানরে সঙ্গীত গায়, শিলা জলে ভাসি যায়—দেখিলেও না হয় প্রত্যয়। সুমন্ত্র সেন যদি আমার চোখের সামনে আপনার বৌ চুরি ক'রত তাহ'লেও আমি বিশ্বাস করতুম না।" অনেক পরে কথাটা সে এক বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিল। তেমনি সুদেষ্ণাকে চোখের সামনে কাঁদিতে দেখিলেও বোধ হয় বিশ্বাস করিত না সুমন্ত্র। কিন্তু তবু কথাটা সত্য, ত্রিপুরারি মিথ্যা কথা বলে না; সুদেষ্ণা কাঁদিয়াছে। কিন্তু কিসের দুঃখে কাঁদিল সুদেষ্ণা? ত্রিপুরারির কথাই কি ঠিক? তাহার মন অন্য কোথাও বাঁধা পড়িয়াছে? অ্যাটর্নি ক্ষিতীশের কাছে নয় তো? কর্তব্যের অনুরোধে হয় তো বিবাহ করিতে পারিতেছে না, কিন্তু মন হয় তো মানে না। সে কি ক্ষিতীশের জন্য সুকল্যাণী দেবীকে ধরিবে? সে

চেষ্টা তো অনেক হইয়াছে, তাহার পক্ষে এ অনধিকার চর্চায় কিছুই ফল হইবে না। নাঃ, সত্যই অনধিকারচর্চা। সুদেষ্ণার বিবাহের জন্য সে কেন ভূতের ব্যাগার খাটিতেছে? তাহার কিসের গরজ? দুই সপ্তাহ আগে যাহাকে চোখে দেখে নাই, তাহার জন্য সে কেন এ-ভাবে নিজের শক্তি এবং সময়ের অপচয় করিতেছে? নাঃ, আজই সে সুকল্যাণী দেবীর কাছে গিয়া দায়িত্বের বোঝা নামাইয়া দিবে। তাঁহাদের ঘরে পয়সা আছে, মেয়ে সুন্দরী, সুপাত্রের অভাব হইবে না। তাঁহাদের নিজেদের ভাবনা তাঁহারা ভাবুন। সে দরিদ্র, ইহার মধ্যে জড়াইয়া তাহার লাভ কি? হয় সুদেষ্ণা অসুখী হইবে, না হয় পর হইয়া যাইবে, তাহাতে তাহার কি স্বার্থ? সুমন্ত্র হন হন করিয়া চালতাবাগানের দিকে চলিল, আজ একটা হেস্তনেস্ত না করিলেই নয়।

সুদেষ্ণাদের বাড়ি যতই কাছে আসিতে লাগিল, সুমন্ত্রের গতি ততই মন্থর হইতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত বাড়ির অদূরে আসিয়া সে একেবারে থামিয়া গেল। নিস্তব্ধ গলি, প্রায়ান্ধকার। সুদেষ্ণাদের ছাদের দিক হইতে ভারী মিষ্ট একটা গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল। পথে দাঁড়াইয়া গান শোনার জন্য ইতোমধ্যে দুই-চারিজন শ্রোতা জমিয়াছে, ইহাদের দল বৃদ্ধি করিতে সুমন্ত্রের প্রবৃত্তি হইল না। সে সন্তর্পণে ভদ্রেশ্বরের ভাড়া করা বাড়িটার দরজার তালা খুলিয়া দোতলায় উঠিয়া গেল। ছাদে উঠিতে সাহস হইল না, ছাদে উঠিবার সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে গান শুনিতে লাগিল। সুদেষ্ণা একখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাহিতেছিল :

'আমি সকল নিয়ে ব'সে আছি সর্বনাশের আশায়।
আমি তার তরে পথ চেয়ে আছি—যে-জন পথে ভাসায়।
যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে,—ভালোবাসে আড়াল থেকে,—
আমার মন মজেছে সেই গভীরের গোপন ভালোবাসায়!'

অপূর্ব সঙ্গীত, সেই সঙ্গে অপূর্ব সুন্দর তাহার বাহন সুদেষ্ণার মধুবর্ষী কোমল কণ্ঠস্বর। বার কয়েক করিয়া এক একটি কলি ফিরিয়া ফিরিয়া গাহিয়া গায়িকা থামিল। নীচে হইতে সুকল্যাণীর ডাক শোনা গেল, "সুদেষ্ণা, নেমে আয়, খুব মেঘ করেছে। বৃষ্টি এল ব'লে।" এতক্ষণে সুমন্ত্রের

সংজ্ঞা ফিরিল। অন্ধকারে বন্ধ বাড়ির সিঁড়িতে ভূতের মতো দাঁড়াইয়া সে একটি অল্পপরিচিতা বয়স্থা কুমারী মেয়ের গান শুনিতেছে? এ কি অবনতি হইল তাহার? সে নামিয়া আসিল, ভাড়াবাড়ির দরজা বন্ধ করিয়া সুদেষ্ণাদের বাড়ির দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। কড়া নাড়িতে যাইবে এমন সময় ভিতর হইতে সুদেষ্ণার গলা শোনা গেল, "আজ আমি আর কিছু খাব না, মা। মাথাটা ভয়ানক ধরেছে।" একতলা হইতে সুকল্যাণী বলিলেন, "কিছু খাবি না কেন, একটু সুজির পায়েস ক'রে দিক বরং। না হয় একটু দুধ দিয়ে হর্লিকস্।" "তাই দিয়ো তবে। আর তোমার সেই আদরের বোনপোটিকে আমার জন্যে ভাবতে বারণ ক'রে দিয়ো, মা। আজ বিকেলের ঐ জীবটিকে তিনিই পাঠিয়েছিলেন। এবার যে আসবে ফিরে যাবে, আমি আর কা'রও সামনে বেরোব না ব'লে দিচ্ছি।"

"বেশ, বেশ, আমারই যত দায়। বারণ ক'রেই দে-ব। বলে—'মা'ঠাকরুন বাজারে যাবেন, তোমরা একটু সরো।' তোর হয়েছে তাই। পথেঘাটে ঘুরছিস, এক-দঙ্গল ছেলের সঙ্গে প'ড়ছিস, আর একজন ভদ্দরলোক দেখতে এলেই গায়ে ফোস্কা পড়ে। আর সেটাও জুটেছে এক পাগল, নিজের ভালো বোঝে না"—

সুমন্ত্র বাঁচিয়া গেল। প্রথমতঃ ভদ্রমহিলা অসুস্থ, এ সময়ে বাহিরের লোকের তাঁহাকে বিরক্ত করিতে যাওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ তাহার প্রশ্নের উত্তর সে পাইয়া গিয়াছে,—সুদেষ্ণা চায় না যে সুমন্ত্র তাহার বিবাহের জন্য চেষ্টা করে, সুকল্যাণীও তাহাব আপত্তি মানিয়া লইয়াছেন। তবে আর কেন? বোঝা তো আপনা হইতেই নামিয়া গিয়াছে। ব্যস, এবার সে মুক্ত। কালই একবার গ্রামে যাইবে, সেখান হইতে গুছাইয়া একখানি চিঠি দিবে।

চালতাবাগানের পথে গ্যাসের আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহার একটার কাচের ঢাকনার চারিদিকে অসময়ে কয়েকটা বাদলা-পোকা ফরফর করিয়া পাখা আছড়াইতেছিল। বহ্নিমুগ্ধ পতঙ্গের দল! তাহাদের বোকামি দেখিয়া সুমন্ত্রের হাসি পাইল। হতভাগ্যেরা জানে না ঐ কাচের বাধা তাহাদের কতবড়ো বিপদ হইতে বাঁচাইতেছে। সে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের মোড়ে গিয়া যখন বাস ধরিল তখন ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে। জানালা বন্ধ করিয়া যাত্রীর ভিড়ের মধ্যে প্রায় দমবন্ধ অবস্থায় সে গুনগুন করিয়া গান ধরিল,

'আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত ক'রে বাঁচালে মোরে, এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভ'রে।'

ভদ্রেশ্বরের বাড়ির দরজায় যখন পৌছিল তখন সুমন্ত্রের জামাকাপড় ও সর্বাঙ্গ দিয়া জলের ধারা নামিতেছে। একবার বাহিরের উঠানে দাঁড়াইয়া এবং একবার দোতলার সিঁড়ির মুখে সে কাপড়ের জল নিংড়াইয়া লইল, তবু তাহার গতিপথে জলরেখা তাহাকে অনুসরণ করিতে ছাড়িল না। দোতলার বড়ো হলঘরে প্রথমেই শ্রীমতী কুণ্ডুর সঙ্গে দেখা। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "গুড হেভ্‌ন্‌স্! এ কি কাণ্ড? ভিজে যে একেবারে—"

"কাউডাং হ'য়ে গেছি, গোবর। আপনাদের কার্পেট ফার্পেট সব ভিজিয়ে দিলুম। নিরুপায়।"

সুমন্ত্র কাপড়চোপড় বদলাইয়া সভ্যভব্য হইয়া আসিয়া হলঘরে একটা কৌচে বসিতেই ঘরের কোণে ছোটো টেবিলের উপর রক্ষিত টেলিফোনটা বাজিয়া উঠিল। গৃহকর্ত্রী তাহার আহারের আয়োজন করিতে গিয়াছেন। তখন ঘরে দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ নাই। অগত্যা সুমন্ত্রই ফোন ধরিল। বলিল,

"হ্যালো!"

"হ্যালো, এটা কি ভদ্রেশ্বরবাবুর বাড়ী? সুমন্ত্রবাবু কি ওখানে আছেন?"

"আমি সুমন্ত্র কথা ব'লছি। আপনি—"

"আমি অনসূয়া। সুমন্ত্রদা, আমি একটি ভালো পাত্রের সন্ধান পেয়েছি। কাল বিকেলে তিনটের সময় পটোলডাঙ্গার বাড়িতে থাকবেন, পাঠাব তাঁকে।"

সুমন্ত্র হতবুদ্ধি হইয়া গেল। প্রথমে মনে হইল দিবে জানাইয়া, সে আর ওসবের মধ্যে নাই, যাহাদের ভাবনা তাহাদের ভাবিতে দিয়া সে সরিয়া আসিয়াছে। পরক্ষণেই মনে হইল, কাল এককথা বলিয়া আসিয়াছে, আজ সে অন্যকথা বলিলে উহারা ভাবিবে কি? দায়মুক্ত হইতে হইলেও ধীরেসুস্থে ভদ্রভাবে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, নচেৎ বন্ধুদের অপ্রস্তুতে ফেলা হইবে। কিন্তু বাড়ির চাবি তো তাহার কাছে নাই, সে কথা বলাও যায় না অনসূয়াকে।

অনসূয়া আবার বলিল "কি, চুপ ক'রে গেলেন যে? আপনি পেছিয়ে গেলে কিন্তু আমরা বিপদে প'ড়ব। আপনাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে হবে চালতা-বাগানে। তার আগে সৎপাত্র কিনা যাচাই ক'রে নেবেন।"

সুমন্ত্র বলিল "কিন্তু একটা মুস্কিল হয়েছে।"

"কী মুস্কিল ? মিটিং আছে ? অন্য এনগেজমেণ্ট ? কিচ্ছু শু'নব না। তিনটের সময় নিজের বাড়ির দরজায় হাজির থাকবেন।"

"মানে, বাড়ির চাবিটা হারিয়ে ফেলেছি, বাড়ি খুলব কি ক'রে ভাবছি।"

অনসূয়া বলিল, "হ্যারিসন রোডের মোড়ে চাবিওয়ালা পাবেন দশ-পনেরো মিনিট দাঁড়ালেই। সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে সকালেই চাবি করিয়ে রাখবেন। আচ্ছা, কাল আবার রাত্রে কথা হবে।" অনসূয়া ফোন ছাড়িয়া দিল।

সুমন্ত্র অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, 'মেয়েটার বুদ্ধি আছে।' কলিকাতা সহরে যে চাবিওয়ালা বলিয়া অভিহিত একদল আর্তত্রাতা পথে পথে চাবি ঝন ঝন করিয়া বেড়ায় সে-কথা তাহার মনেই ছিল না।

সেইদিনই ঘণ্টাতিনেক পূর্বের ঘটনা। সুদেষ্ণাদের দোতলার ঘরে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

"হ্যালো, বরাবাজার থ্রি, ও টু, ওয়ান, সিক্স? এটা কি সুদেষ্ণাদের বাড়ি?"

"আমি সুদেষ্ণা কথা বলছি। কে আপনি?"

"গলা শুনে চিনতে পারলি না? আমি অনসূয়া।"

"ম্যাজিষ্ট্রেট-ঘরণী? কী সৌভাগ্য! তারপর? খবর কি তোর? আছিস কোথায়?"

"জজনন্দিনী, চিনতে পেরেছ তা হ'লে? তবু ভালো। চাটগাঁ থেকে এসে ল্যান্সডাউন রোডে বাসা ভাড়া করেছি তোদের বাড়ির কাছেই, ১৭৮৫ নম্বর। আয় না একদিন?"

"যাব একদিন, ভাই। উপস্থিত ভয়ানক ব্যস্ত। আজ দিন দশেক হ'ল পড়াশোনা কিছু হচ্ছে না, এই সবে একটু বই নিয়ে বসেছিলুম। তা—"

"তা আমার ঘর ভাঙবার মতলব করছিস কেন বলতো? এই কি তোর ধর্ম হ'ল?"

"আমি? তোর ঘর ভাঙাব? বলছিস কি?"

"আজ তোর দূত এসেছিল আমার কর্তাটির বিয়ের ব্যবস্থা করতে তোর সঙ্গে। অবশ্য এখনও সম্বন্ধটা এগোতে পায় নি বেশীদূর। উনি তো আমাকে ডিভোর্স করতে রাজি এক্ষণি, তুই যদি রাজি হোস তো বল?"

"কি বকছিস যা তা? তোর মাথা খারাপ হয়েছে? কে গেছল আমার সম্বন্ধ করতে?"

"সুমন্ত্র সেনকে চিনিস? শিল্পী, কবি, সত্যাগ্রহী, হাতুড়ে ডাক্তার—"

"পাগল, বাউণ্ডুলে, কাণ্ডজ্ঞানহীন। তা' তিনি আমার এত উপকার করতে গেলেন কেন?"

"তা কি ক'রে জানব ভাই? তোমার মা নাকি তাঁকে ভার দিয়েছেন। তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে ঘুরছেন সৎপাত্রের সন্ধানে। বিবাহিত, অবিবাহিত, বালক, বৃদ্ধ, কানা, খোঁড়া, কাউকে বাদ দিচ্ছেন না। বালিগঞ্জে শ্যামবাজারে গৃহিণী-মহলে সামাল সামাল রব উঠে গেছে তাঁর ঘটকালির

জ্বালায়। বুড়োরা দাঁত বাঁধাচ্ছে বয়স কমাবার জন্যে,—ছেলেরা দাড়ি কামাচ্ছে বড়ো হবার জন্যে।"

সুদেষ্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমার গলায় দড়ি জোটে না, ভাই, এও শুনতে হ'ল?"

"আহা রাগ করিস কেন? আমি ঠাট্টা করছিলুম। তবে ভদ্রলোক সত্যিই খাটছেন খুব তোর জন্যে। তোর কোনো আত্মীয় হন না কি?"

"সাতপুরুষের কুটুম। মা'র কে বন্ধু ছিলেন, তাঁর ছেলে। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে, ভাই।"

"ও, তাহ'লে তোর মত নেই এ-সবে? আমার প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল। তবে তো একটা উপায় বা'র করতে হয়?"

"দেখনা ভাই, যদি কোনো বুদ্ধি দিতে পারিস।"

"সব চেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে ওকে বিয়ে ক'রে ফেলা।"

"ইয়ার্কি হচ্ছে?"

"সত্যি বলছি, ওর মতো একগুঁয়ে বোকা লোককে থামাবার আর কোনো উপায় নেই। ছোটোবেলা থেকে তো দেখছি। আমার দাদা আর স্বামী দু'জনেই ওর মহাভক্ত। কাজের ভার নিলে প্রাণ দিয়ে তা করবে, নিজের সুখ দুঃখ ভাববে না। সুদেষ্ণা"—

"কি বলছিস?"

"সেদিন ওর মুখ দেখে আমরা বুঝেছি—এ হচ্ছে কলির নলরাজার দৌত্য। তোকে সুখী ক'রবার জন্যে সুমন্ত্রদা' প্রাণ দিতে পারে, তবু মুখ ফুটে তোর কাছে হাত পাতবেনা ও কোনোদিন। অগত্যা তোকেই নামতে হবে সিংহাসন থেকে।"

"আর কত নামব, ভাই?"

"ওঃ, নেমে পড়েছিস তা' হ'লে? যাক, তবে আর কোনো ভয় নেই। লক্ষ্মীছাড়ার ওপর লক্ষ্মীর দয়া যখন হয়েছে—"

"কি বাজে বকচিস?"

"কিছু না। বলছিলুম মাসিমাকে একবার ডেকে দে? দু'টো কথা বলব।"

"মাকে আবার কেন এর মধ্যে? যা বলবার আমাকেই বল না?"

"তাঁর মত আছে তো?"

"আঠারো আনা। কি চোখেই যে দেখেছেন ভদ্রলোককে।"

"আমার পরামর্শে চলবি ? ভয় নেই, নিজের দাদার জন্যে কিছু বলব না। 'সুমন্ত্রদা' দু'এক দিনের মধ্যেই একটা না একটা সম্বন্ধ নিয়ে যাবে তোদের বাড়ি। তার আগে খবর দেবে মাসিমাকে। সেই সময়ে"—

"আজ তো খবর না দিয়েই এক ডাক্তার এসেছিলেন বিকেলে, তাঁরই কীর্তি ব'লে মনে হ'ল।"

"ও নিয়ে মন খারাপ করিস নি, তার কাজ সে করুক, তোর কাজ তুই করে যা। আচ্ছা, তোকে সত্যি চায় কিনা তার একটুও আভাস পাস নি?"

"একবার মনে হয় পেয়েছি, একবার মনে হয় পাই নি। কিছু বুঝতে পারছি না। তবে চটিয়ে দিয়েছি খুব।"

সুদেষ্ণা বন্ধুকে তাহার দিবাভিসার এবং তাহার পরবর্তী ঘটনা আনুপূর্বিক বলিল।

অনসূয়া বলিল, "এতদূর ?"

"ঠাট্টা হচ্ছে ? ঐ জন্যে তো কিছু বলতে চাই না।"

অনসূয়া বলিল, "না, না, এখন আর পেছোবার পথ নেই। সুমন্ত্রদা' কবিতা লেখে। তার খাতাটা যোগাড় করতে পারিস ? ওর বাসার চাবিটা চাই যে।"

"কবিতার খাতা কি হবে ? চাবি তো আমার কাছেই আছে। সেদিন যে চেয়ে এনেছিলুম ওঁদের ভাড়াটের কাছ থেকে।"

অনসূয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "চাবি তোর কাছে ? এর মধ্যেই ? বলিস কি ? তা হ'লে সে খায় কোথায়, শোয় কোথায় ?"

"তা তো জানি না।" সুদেষ্ণার সত্যই এ প্রশ্নটা এতদিন মাথায় আসে নাই। অনসূয়া একটু থামিয়া বলিল,

"বেচারাকে একেবারে পথে দাঁড় করালিরে ?"

অপরিসীম লজ্জায় সুদেষ্ণা চুপ করিয়া রহিল। অনসূয়া বলিল,

"আমার মনে হয় সেই ভদ্রেশ্বরবাবুদের বাড়িতেই রাত্রের আড্ডা হয়েছে। দিনে তো পথে পথে ঘোরা অভ্যেসই আছে। দাঁড়া, আমি আজই খোঁজ নিচ্ছি। তুই কিন্তু ইতিমধ্যে একবার গিয়ে ওদের ভাড়াটেকে চাবিটা দিয়ে আসবি, আর বাড়িটা দেখে আসবার নাম ক'রে কবিতার খাতাটা"—

সুদেষ্ণা বলিল, "খাতা এর মধ্যে আসছে কেন বুঝতে পারছি না।"

অনসূয়া বলিল, "এই বুদ্ধি নিয়ে তুই সংসার করবি ? ওরে মুখ্খু, ওর মনের কথা ঐ খাতাতেই পাওয়া যাবে।"

সুদেষ্ণা বলিল, "আমি আর ও বাড়িতে যেতে পারব না। বিশ্রী লাগে।"

অনসূয়া বলিল, "বেশ, খাতা চুরির ভার আমিই নিলুম। পাপের ভাগ নিবি তো?"

"আমি ওসব চুরি জোচ্চুরির মধ্যে নেই ভাই।"

"অল ইজ ফেয়ার ইন লভ অ্যাণ্ড ওয়ার।"

অনসূয়া সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় অনুবাদ করিয়া বলিল,

"প্রেমে ও আহবে, ভাই, কিছু অন্যায় নাই। মাছটি খাব, কাঁটাটি বাছব না, তা কি চলে? বেশ, পাপ পুণ্যের সব ভার আমার। তোদের মতো ছুটো বর্বরকে যদি এক জোয়ালে জুততে পারি তবে আমার সব পাপ পুণ্য হয়ে যাবে। একটু কিন্তু বেশী মেশামেশি করতে হবে সুমন্ত্রদা'র সঙ্গে। তোর আবার হিংসে হবে না তো?"

"এখনও তো হচ্ছে না, পরে কি হবে বলতে পারি না।"

"বেশ, কাল সকালেই লোক পাঠাব, চাবিটা দিবি তার হাতে।"

সুদেষ্ণা মুহূর্তকাল ভাবিল। সুমন্ত্রের খাতায় গোপন কথা যদিই কিছু থাকে, তাহা তৃতীয় ব্যক্তির সম্মুখে তাহার বিনা অনুমতিতে অনাবৃত করিয়া ধরিতে তাহার মন চাহিল না। চুরি যদি করিতে হয় সেই করিবে। বলিল,

"আমিই যাব না হয়। অন্য লোক গেলে উনি হয়তো আরও চটবেন।"

অনসূয়া নাটকীয় ভঙ্গীতে বলিল, "এই তো তোমার যোগ্য কথা। বেশ তাহ'লে কাল সন্ধ্যাবেলা এই সময়ে ফোন করব। তোর রিপোর্ট পেলেই আমি নামব কার্যক্ষেত্রে। আজ তা'হ'লে উঠি ভাই, ওঁর ফেরবার সময় হ'ল। কাল যাবি কখন?"

"ছুটো থেকে চারটে ক্লাশ নেই, সেই সময়েই যাব ভাবছি।"

অনসূয়া টেলিফোন ছাড়িয়া দিল। সুকল্যাণী ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন,

"এতক্ষণ কার সঙ্গে এত কথা হচ্ছিল?"

সুদেষ্ণা মা'র চোখে চোখ রাখিয়া বলিল,

"অনসূয়াকে মনে আছে? সেই ডাকছিল। কোর্টশিপ করিনি, মা, ভয় নেই।"

সুকল্যাণী রাগিয়া বলিলেন, "আমি যেন দিনরাত তোমায় সেইজন্যে পাহারা দিয়ে রেখেছি। করনা যা খুশি।"

৯

বেলা ঠিক সওয়া দুইটা। পটোলডাঙার গলি জনবিরল, ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ। শাস্ত্রীমহাশয়দের বাড়ির পাশে আস্তাবলে ঘোড়া দুইটা মাঝে মাঝে পা ঠুকিতেছে, দূরে কোথায় গলির বাঁকের ওধারে একজন বাসনওয়ালা ঠন্ ঠন্ করিয়া বাসন বাজাইয়া চলিয়াছে। সুদেষ্ণা সুমন্ত্রদের বাড়ির দরজায় আসিয়া দেখিল তাহার অনুমান ঠিক, অধরবাবুর ডাক্তারখানার দরজা বন্ধ। যাক, প্রথমেই কাহারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হইবে না জানিয়া তাহার বুকের কাঁপুনি একটু কমিল। পাশের রকে বই-খাতার গোছা নামাইয়া রাখিয়া সে সদর দরজার বড়ো তালাটা খুলিল। তারপর বই-খাতাগুলি তুলিয়া লইয়া সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া ভিতরে ঢুকিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিল।

সুন্দর বাড়িখানি। অনেকদিনের অব্যবহারে অযত্নে মলিন, উঠানে সিঁড়িতে সর্বত্র ধূলার স্তর পড়িয়াছে, তবু মূল্যবান পুরাতন ছবির মতো এই মালিন্যে তাহার কৌলীন্য-মর্যাদা যেন বাড়িয়াছে বই কমে নাই। সময় অল্প, সুদেষ্ণা দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিল। ডানদিকের প্রথম ঘরটা চাবি-বন্ধ, তাহার চাবি সুদেষ্ণার রিঙে নাই। তাহার পাশে ছোটো একটা ঘরে কতকগুলি বাক্স-তোরঙ্গ রাখা আছে, গুদাম-ঘর বলা চলে। বারান্দা ঘুরিয়া রাস্তার দিকের বড় ঘরটাতে চাবি খুলিয়া ঢুকিতেই চন্দনধূপের মৃদু গন্ধ আসিয়া নাকে লাগিল। ঘরটার দেয়াল বোঝাই নানা আকারের নানা রঙের হাতে আঁকা ছবি, ছবির দোকান বলিলেই হয়। তবু খারাপ লাগিল না,—এমনই সুন্দরভাবে সাজানো, এতই সুন্দর ছবিগুলি। কতকগুলি দৃশ্যচিত্র,—চন্দ্রালোকিত সমুদ্র, হিমালয়ে সূর্যাস্ত, বর্ষার পল্লীদৃশ্য প্রভৃতি; সেই সঙ্গে কতকগুলি ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক ছবি। নীচেরতলার ডাক্তারখানার দুইখানি ঘরের উপর দোতলার এই দীর্ঘ ঘরখানি। ঘরের মেঝের অধিকাংশ জুড়িয়া সতরঞ্চের উপর ধবধবে খদ্দরের ফরাস পাতা, শেষপ্রান্তে একটি প্রকাণ্ড আরশির আলমারি। আলমারির দুই পাশে একবুক উঁচু দুইটি বইয়ের তাকে চার থাক করিয়া সাজানো কিছু দেশীবিলাতী ছবির এবং কাব্য উপন্যাসের বই। একদিকের তাকের উপর একটি কাশ্মীরী কাঠের বাক্সে এবং তাহার

দুই পাশে দু'টি তিব্বতী পিতলের পাত্রে কিছু রং তুলি, অপরদিকের তাকের মাথায় একটি ফুলদানিতে কতকগুলি শুকনা ঘাসের ফুল এবং দুইপাশের দুইটি ধূপদানিতে কিছু পোড়া ধূপ। তাকের উপর দুইদিকের বাকী দেয়ালটার ঊর্ধ্বদেশ ভরিয়াছিল দুইটি বড় তৈলচিত্র। সুমন্ত্রের বাবা, মা! মুগ্ধনেত্রে মিনিটখানেক দাঁড়াইয়া রহিল সুদেষ্ণা, তারপর হাঁটু-গাড়িয়া বসিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। চোখ তুলিয়া চাহিতেই মনে হইল ঊর্ধ্বলোক হইতে পরমাত্মীয় গুরুজনদের আশীর্বাদ তাহার মাথায় ঝরিয়া পড়িতেছে। নিজেকে ধন্য মনে হইল তাহার।

কিন্তু চিন্তা করিবার সময় কোথায়? চারদিকে দ্রুত সন্ধানীদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিয়া লইল সুদেষ্ণা, বাঁধানো খাতাপত্র কেথাও কিছু চোখে পড়িল না। বইয়ের তাকে মোপাসাঁর গ্রন্থাবলীর পিছনদিকে কেবল ছেড়াখোঁড়া কিছু কাগজ যেন গোঁজা আছে মনে হইল। সুদেষ্ণা একগোছা কাগজ টানিয়া বাহির করিল, খাতাই বটে, তবে একগোছা হিসাবের খাতা। প্রথমখানির প্রথম পাতায় সঙ্কট-ত্রাণ সমিতির কোন্ এক কেন্দ্রের চাল-বিলির হিসাব, বর্ধমান জেলার কোন্ আতাপুর গ্রামে বন্যার্তদের সেবার ব্যাপার। সুদেষ্ণা পাতা উল্টাইতে লাগিল, ধাপধাড়া হইতে গোতান পর্যন্ত অনেকগুলি গ্রামের নাম ও লোকসংখ্যা পাইল, কর্মী সুমন্ত্র পাঁচশত মণ চালের মধ্যে আড়াই মণের হিসাব মিলাইতে না পারায় কিরূপ অপ্রস্তুত হইয়াছিল তাহারও পরিচয় পাইল, কেবল পাইল না তাহার মনের হিসাব। দ্বিতীয় খাতাখানায় সুমন্ত্রের ব্যক্তিগত হিসাব আছে। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে দেখা গেল তাহার মধ্যে মজার মজার স্কেচ আছে, দুই চারি ছত্র কবিতাও আছে। কালিতে আঁকা একটি ছবিতে দেখা গেল একজন শীর্ণকায় ব্যক্তি ভাত চাপাইয়া উনানে ফুঁ দিতেছে আর তাহার নীচে লেখা আছে,

'খেয়ে প'রে ভালোমন্দ, ঘরে করি দ্বারবন্ধ সুখে আছে প্রতিবেশিগণ।
হা বিধি পোড়ার মুখ, উনানে পাড়িয়া ফুঁক আমার কাটিল এ-জীবন।'

তিন বৎসর পুর্বের তারিখ। বাঁশে ঘুণ ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে তখনই! পরপৃষ্ঠার কবিতাটি আরও স্পষ্ট :

'জানালা খুলে যায় নিশীথবায়ে, চাঁদের আলো পড়ে ফুলের গায়ে।
আকুল তারস্বরে পাপিয়া ডেকে মরে, বকুল কেঁদে ঝরে বিটপি-ছায়ে।
এত যে এল গেল মাধবীরাত, কাননে এত পাখী গেল যে গাহি,—
আমি যে কারে চাই আজিও বুঝি নাই, আমারে চাহে হেন কেহতো নাহি।'

আহা রে বেচারা!

'তোমারে চায় হেন পাগলও আছে,
দিবে কি ধরা তুমি তাহার কাছে?'

একি? কবির ছোঁয়াচ লাগিয়া সেও কবি হইয়া উঠিল নাকি? তাড়াতাড়ি আর দু-একখানা পাতা সে উল্টাইয়া গেল। এক জায়গায় চোখে পড়িল একটি গান:

'একি বিত্তে, সখী, আজি চিত্ত ভরা!
অনিমিত্ত আনন্দে কি নৃত্যপরা!
বন্ধ্যা এ-জীবনের অন্ধ-অমা
উদ্ভাসি ভাতিল কি জ্যোতি পরমা!
মরুভূমি নন্দিতে কি অনুপমা
জাগিল এ জাহ্নবী সরিদ্বরা।'

নীচের তারিখ দেখিয়া সুদেষ্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, সুমন্ত্র যেদিন প্রথম ভুল করিয়া তাহাদের বাড়ি যায় সেইদিনই কবিতাটি লেখা। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সুদেষ্ণা খাতাখানি নিজের বইখাতাগুলির মধ্যে গুছাইয়া লইয়া কক্ষত্যাগ করিল। ঘরে চাবি দিল, নীচে নামিয়া খিল খুলিয়া বাহির হইতে যাইবে, দেখিল দ্বার খোলে না। রৌদ্রতাপে কাঠ বাড়িয়া আটকাইয়া গেল নাকি? সুদেষ্ণা দুইবার তিনবার দেহের সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া ঠেলা দিল, দরজা খুলিল না। নিশ্চয় কেহ বাহির হইতে তালা দিয়াছে। তবে কি অধরবাবুর কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে? চোর ঢুকিয়াছে মনে করিয়া তিনি দরজায় তালা দিয়া পুলিশে খবর দিতে যান নাই তো? সর্বনাশ। সুদেষ্ণার মাথা হইতে পা পর্যন্ত ঝিমঝিম করিতে লাগিল। কেন সে মরিতে অনসূয়ার পরামর্শে এই পোড়া বাড়িতে ঢুকিয়াছিল। যদি সত্যই তাহাকে ইহারা চোর বলিয়া পুলিসে দেয়? এখন একমাত্র গতি সুমন্ত্র,

সে কোথায় পথে পথে ঘুরিতেছে কে জানে! সে যদি কোনোরূপে আসিয়া পড়ে তবেই রক্ষা। সে নিশ্চয় তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিবে না। ওঃ, মা যখন শুনিবেন তাঁহার গুণের মেয়ে কলেজে যাইবার নাম করিয়া পরের বাড়ি চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে, তখন তাঁহার উঁচু মাথা কোথায় ধূলায় লুটাইয়া যাইবে! সুদেষ্ণার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল, সে বারবার বলিতেছিল, 'ধরণী, তুমি দ্বিধা হও, আমাকে এই লজ্জা—এই অপমান হইতে রক্ষা কর।'

কলিযুগে মা ধরিত্রীর মন ত্রেতাযুগের মতো তেমন নরম নাই বলিয়াই বোধ হয় তিনি দ্বিধা হইলেন না, কিন্তু সুদেষ্ণার ঐকান্তিক প্রার্থনা ব্যর্থ হইল না, সদরদরজার পাল্লাজোড়া সহসা নিমেষের জন্য দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল এবং সুমন্ত্র সেনকে প্রবেশ পথ দিয়াই আবার অর্গলবদ্ধ হইল। সে কুণ্ঠিত স্বরে বলিল,

"ডাক্তারবাবুর দোকান খোলবার সময় হয়েছিল, পাছে তিনি কিছু মনে করেন তাই আমি দরজাটাতে বাইরে থেকে তালা দিয়ে রেখেছিলুম। তিনি আসতে তাঁর সঙ্গে একটু কথা ক'য়েই আসছি। আজই চাবিওয়ালা ডেকে সদরের চাবিটা তৈরী করিয়েছি। কিছু অন্যায় করেছি কি?"



কয়েক মগ জল আনিয়া

সুমন্ত্রের দিকে প্রায় আধ-মিনিটকাল নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল সুদেষ্ণা। সেখানে সে কি দেখিল সেই জানে। তাহার আতঙ্কবিবর্ণ পাণ্ডুর মুখখানা ধীরে ধীরে রক্তপদ্মের মতো রাঙা হইয়া উঠিল; লজ্জা, ভয়, আনন্দ ও নৈশ্চিন্ত্যের একটা মিশ্র বিচিত্র অনুভূতিতে তাহার শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

যেন অবশ হইয়া আসিতেছিল, একটা অননুভূতপূর্ব পুলকমিশ্রিত বেদনায় সে যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেছিল। সে কাঁদিবে, না হাসিবে, সুমন্ত্রের কথার উত্তর দিবে, না দিবে না, সুমন্ত্রকে ধন্যবাদ দিবে, না, গালি দিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দিল। সুমন্ত্র কি বলিবে, কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না। একবার, দুইবার, তিনবার সে সুদেষ্ণার নাম ধরিয়া আস্তে আস্তে ডাকিল, সাড়া নাই। হাতের খাতাখানা মাটিতে রাখিয়া সে এইবার কাছে গিয়া বসিল, ধীরে ধীরে মাথায় হাত দিল, তারপর কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকানি দিল। সুদেষ্ণা দেওয়ালে পিঠ দিয়া সমস্ত দেহটাকে কাঠের পুতুলের মতো শক্ত করিয়া হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া আছে, নড়েও না, চড়েও না। অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনায় বোধ হয় অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে বেচারা। হার্টফেল করিল না তো? সুমন্ত্র হাতটা টানিয়া নাড়ি দেখিল। কি নরম হাত! স্পন্দন খুবই দ্রুত, তবে ভয়ের কারণ আছে বলিয়া মনে হইল না। একবার ভাবিল অধরবাবুকে ডাকিবে, প্রবীণ লোক বুঝিবেন ভালো। পরক্ষণেই সে-চিন্তা বর্জন করিল। তাহা হইলে লোক-জানাজানি হইবে, কেলেঙ্কারীর আর কিছু বাকি থাকিবে না। এখন মাথায় একটু জলের ছিটা দেওয়া দরকার। একটা পাখাই বা কোথায় পাওয়া যায়? বাড়ির মধ্যে কলে জল আসিয়াছিল, সুমন্ত্র কয়েক মগ জল আনিয়া সুদেষ্ণার মাথায় ঢালিল। নিজের কোঁচার খুঁট ভিজাইয়া লইয়া আসিয়া কপালের যে অংশটুকু দেখা যাইতেছিল সেখানে, কান দুটিতে এবং ঘাড়ে বেশ করিয়া জল মাখাইয়া দিল। তারপর মোরোক্কো চামড়ায় বাঁধানো খাতাখানা নাড়িয়া বায়ুতরঙ্গ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মিনিটপাঁচেক পরে আবার ডাকিল "সুদেষ্ণা দেবী, সুদেষ্ণা!" কোনো সাড়া নাই। আচ্ছা, উপরের আলমারিটায় তো স্মেলিং সল্ট আছে, সেটা এসময় কাজে লাগে না? সুমন্ত্র সুদেষ্ণার পায়ের নিকট হইতে ভূলুণ্ঠিত চাবির গোছা কুড়াইয়া লইয়া দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল।

সুদেষ্ণা এতক্ষণে মাথা তুলিল। সে কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিল? না, তাহার সিক্ত কেশে সিক্ত বস্ত্রে ভীরু-প্রণয়ীর প্রথম প্রণয়ের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর এখনও ঝরিয়া পড়িতেছে। সুদেষ্ণা দাঁড়াইয়া উঠিল, দেহটা যেন তাহার নিজের নয়। কোনোমতে কয়েক পা আগাইয়া নিঃশব্দে সদর দরজার খিল খুলিল সে, নত হইয়া বইয়ের গোছা তুলিতে গিয়া বাঁধানো খাতাখানার দিকে

নজর পড়িল। প্রথম পাতাটা উল্টাইতেই বুঝিল কবিতার খাতা—সুমন্ত্রের অন্তরের কাহিনী ইহার মধ্যেই আছে। নিমেষের জন্য দ্বিধা আসিল, পরক্ষণেই মনে হইল তাহার উদ্দেশ্যে যদি কিছু লেখা হইয়া থাকে তবে সে তো তাহারই প্রাপ্য? অনসূয়ার কথা মনে পড়িল, 'প্রেমে ও আহবে, ভাই, কিছু অন্যায় নাই।'

নিজের বই-খাতার গোছার মধ্যে সুমন্ত্রের খাতাখানিকে বেমালুমরূপে ভরিয়া লইয়া সুদেষ্ণা বাহির হইয়া গেল। কোনোমতে হ্যারিসন রোডের মোড়ে পৌঁছিয়া একটা চলতি রিক্সয় চাপিয়া বসিল। বলিল,

"চালতাবাগান চল।"

দুই মিনিট পরে স্মেলিংসল্টের শিশি, পাখা এবং গ্লাস-ভর্তি জল লইয়া আসিয়া সুমন্ত্র দেখিল রোগিনী পলাইয়াছে, অভিজ্ঞান-চিহ্নস্বরূপ রাখিয়া গিয়াছে উঠানে খানিকটা কাদা আর তাহার মধ্যে একটি মাথার কাঁটা! ছুটিয়া দরজার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল সুমন্ত্র, গলির মোড় পর্যন্ত কাহাকেও দেখা গেল না। বহু অনুসন্ধানে নিজের কবিতার খাতাখানাও খুঁজিয়া পাইল না সে। নিশ্চয় সুদেষ্ণা লইয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে বিমূঢ়ের মতো সেইখানটিতে দাঁড়াইয়া ঘটনাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহা হইলে আচ্ছা-ঠকান্‌টাই তাহাকেই ঠকাইয়া গেল তো সুদেষ্ণা? তবে কি সে মোটেই অজ্ঞান হয় নাই? অদ্ভুত মেয়ে বটে! মনে পড়িল, প্রেসিডেন্সী কলেজে নবাববংশের একটি ছেলে পড়িত তাহাদের সঙ্গে। আঠারো বৎসর বয়সেই তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। বেচারার পড়তি অবস্থা, বহুবিবাহ করিবার সখ থাকিলেও শক্তি ছিল না, তাই সে বুদ্ধি করিয়া শয়নঘরে গোটা ছয়েক বড়ো বড়ো আরসি চারিপাশে সাজাইয়া একটি সুন্দরীকেই ছয়টিতে পরিণত করিয়াছিল। 'ব্যস, বন্ গিয়া মেরা হারেম্।' সুমন্ত্রের মনে হইল, সুদেষ্ণাকে যে বিবাহ করিবে তাহারও হারেম রাখিবার প্রয়োজন হইবে না। সে একাই দশটি বিভিন্ন নারীচরিত্রের অপরূপ সমাবেশ, একাই একটি পরিপূর্ণ হারেম। তাহাকে যে লাভ করিবে জীবনে তাহার বৈচিত্র্যের অভাব হইবে না। সত্যই ঈর্ষার পাত্র লোকটা।

কিন্তু অনসূয়ার পাঠানো সে পাত্র কই? চারটা বাজিল, সাড়ে চারটা বাজিল, তাহার তো দেখা নাই! সদর দরজায় চাবি দিয়া সুমন্ত্র অনেকক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিল। অধরবাবুর বৈঠকখানাতেও অনেকক্ষণ

বসিল। শেষে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া আসিল। অধরবাবুকে ভদ্রেশ্বরের ঠিকানা দিয়া বলিয়া আসিল, কেহ তাহাকে খুঁজিতে আসিলে যেন রাত্রে ঐ ঠিকানায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

বালিগঞ্জে পৌছিয়াই স্থমন্ত্র টেলিফোনে ডাকিল অনস্থয়াকে। একটু ঝাঁঝালো স্বরেই বলিল, "কেন হায়রান করলে আমাকে? কেউ আসেনি তোমার, শুধু শুধু দু'ঘণ্টা সময় নষ্ট"—

অনস্থয়া বলিল, "শুধু শুধুই নষ্ট হ'ল দু'ঘণ্টা? যাওয়াটা সার্থক হয়নি, স্থমন্ত্রদা'? বুকে হাত দিয়ে বলুন তো!"

স্থমন্ত্র উত্তর দিতে পারিল না, টেলিফোন ছাড়িয়া দিল।

সুমন্ত্রকে ঠাট্টা করিল বটে, কিন্তু নিজের মনে বল পাইতেছিল না অনসূয়া। সুমন্ত্রের কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল সে চটিয়াছে। অনসূয়া তো চোরকে চুরি করিতে বলিয়াছে, গৃহস্থকেও সাবধান করিয়াছে। উপস্থিত তাহার প্ল্যান অনুযায়ী উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিয়া থাকিলে ফল শুভ হইবে বলিয়াই আশা করা যায়। কিন্তু যদি না হয়? সুমন্ত্র যে-রকম নীতিবাগীশ, তাহাতে হয়তো এই সামান্য ছেলেমানুষি ব্যাপার লইয়া সুদেষ্ণার সঙ্গে তাহার জন্মের মতো ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইবে, তখন সমস্ত দোষটা পড়িবে অনসূয়ার ঘাড়ে। নাঃ, কাজটা ভালো হয় নাই, খুবই অন্যায় হইয়াছে।

দোতলায় শুইবার ঘরে টেবিলের একপ্রান্তে টেলিফোনের সম্মুখে বসিয়া ভাবিতেছিল অনসূয়া। সে যে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছে তাহা জানাইবার জন্য আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঝরণা-কলমটির একপ্রান্ত কপালে ঠেকাইয়া মুখভাব যতদূর সম্ভব অপ্রসন্ন করিয়া বসিয়াছিল সে। নীতীশ ঘরে ঢুকিল, জুতা জামা বদলাইল, শব্দ করিয়া জিনিসপত্র এদিকে ওদিকে রাখিল, তারপর টেবিলের অপরপ্রান্তে পালঙ্কের উপর বসিল; অনসূয়ার সাড়া নাই। অগত্যা নীতীশ পত্নীর কাছে আসিয়া করজোড়ে প্রশ্ন করিল, "অধীনের অপরাধ?"

অনসূয়া কপাল হইতে কলম সরাইয়া বলিল, "অপরাধ আবার কিসের?"

"তা হ'লে দেবীর এ প্রলয়ঙ্করী রূপ কেন? 'আবদ্ধভীমভ্রূকুটীবিভঙ্গ, শেখীয়মানারুণরৌদ্রনেত্রঃ'—"

"যাও, যাও, রাতদুপুরে ভট্টিকাব্য আওড়াতে হবে না! আমি বলে মরছি নিজের চিন্তায়।"

"বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ। বোঝা যাচ্ছে বার্ধক্য আসছে তোমার। তা চিন্তার ভাগ আমাকে কিছুটা দেওয়া চলে না? তাতে দেবীর মস্তিষ্কের ভার লাঘব হ'তে পারে। বিশেষরূপে বহন করবার দায়িত্ব যখন নিয়েছি তখন বাস্তবদেহে এবং মানসচিন্তায়—সর্বতঃ,—অর্থাৎ মৃন্ময়ী এবং চিন্ময়ী দুই রূপেই—দেবীকে বহন করতে প্রস্তুত আছে এ অধম। মানে,—বি-পূর্বক বহ্ ধাতু ঘঞ্—"

"যত সব কাষ্ঠরসিকতা! ওসব ভালো লাগছে না এখন। কি বিপদেই পড়েছি!"

"বিবরণটা শুনলে বিপদটার জাতিকুল নির্ণয় করতে পারি।"

"তোমার বন্ধুটি গো, ঐ সুমন্ত্রদা' আমার দাদারও বন্ধু। কি আর বলব, গুরুজন হন সম্পর্কে,—কিছু বলতে নেই, তবে সত্যি কথা না ব'লেও পারি না,—বুদ্ধিশুদ্ধিতে একটি আস্ত—"

"ছাগল! শুধু ছাগল নয়, রামছাগল, যাকে শুদ্ধ ভাষায় বলে বোকা পাঁটা। ঠিকই বলেছ। তবে শাস্ত্রে অগ্নিকে ছাগবাহন বলেছে। তা তোমার বান্ধবীটিও তো বহ্নিরূপা। তাঁর বাহন হবার উপযুক্ত ক'রেই বিধাতা সৃষ্টি করেছেন হতভাগাটাকে। এখন যোগাযোগটা ঘটিয়ে দিলেই হয়।"

"যোগাযোগ তো ঠিক ক'রে এনেছিলুম, আজ বিকেলেই দু'জনের চোখোচোখি হয়ে গেছে একবার। তবে তোমার বন্ধু কি-ভাবে নিয়েছেন ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। টেলিফোনে বেশ তো খুব মেজাজ দেখাচ্ছিলেন একটু আগে। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা এখন পায়ে ঠেলছে, পরে অনুতাপ করতে হবে।"

"এই ঠিক আমার মতন।"

অনসূয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "তুমি আবার পায়ে ঠেললে কাকে! হ্যাঁ গো, কই সে গল্প তো শুনিনি। এখানে, না, বিলেতে?"

নীতীশ মুখভাব যতদূর সম্ভব ম্লান করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে করুণ-স্বরে বলিল,

"অন্য কাউকে ঠেলাঠেলি করবার সুযোগ পেলুম কোথায়? একেবারে 'ভিনি, ভিডি, ভিসি।' ঝড়ের মতো এসে একমুহূর্তে ভূমিসাৎ ক'রে দিলে যে তুমি আমাকে। চারপাশে আরও যে কে কোথায় ছিল দেখতে সময় দিলে কি? মালতীমাধবের মাধবের অবস্থা তখন আমার। 'হৃদয়ং অশরণং মে পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষৈঃ 'অপহৃতং অপবিদ্ধং পীতং উন্মূলিতঞ্চ।' আমার জলজ্যান্ত হৃদয়টাকে একটানে কচি আগাছার মতো উপড়ে নিলে। উঃ, ব্যথা, ব্যথা! কি নিষ্ঠুর তুমি?"

চাটুবাদে অনসূয়ার ছদ্মরোষের কাঠিন্য ক্রমে তরল হইয়া আসিতেছিল, অপাঙ্গে তির্যক্ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া সে মাথা নাড়িতে নাড়িতে মন্তব্য করিল,

"কত রঙ্গই জানো। তা কি করবে করোনা? বন্ধুটির মাথায় একটু মধ্যমনারায়ণ তেল মালিস ক'রে আসতে পারো? মেয়েটাকে কি পথে বসাবে না কি শেষটা? এমন গোঁয়ারও তো দেখি নি!"

"দেখ, দিল্লীর লাড্ডু খেলেও পস্তাতে হয়, না খেলেও পস্তাতে হয়। সুমন্ত্র যাকে বিয়ে করবেনা সেও যেমন পথে বসবে, তেমনি সুমন্ত্রকে যে মেয়ে বিয়ে করবে সেও পথে বসবে। দু'দিন আগে, না হয় দু'দিন পরে। তবে হ্যাঁ, তার শুভার্থী হিসেবে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কিছু একটা প্যাঁচে ফেলে তাকে তাড়াতাড়ি ঘাটে তোলা।"

"প্যাঁচে ফেলতে গিয়েই তো বিপদে পড়েছি আমি।" অনসূয়া নিজের চক্রান্তের কথা আনুপূর্বিক স্বামীর কাছে বলিল। নীতীশ হাসিয়া বলিল,

"বেশ তো চলছে, এর মধ্যে আমাকে আর কেন?"

"আর কুলকিনারা পাচ্ছিনা, তাড়াতাড়ি যাতে শেষরক্ষা হয় এমন একটা বুদ্ধি দাও।"

"সুমন্ত্রকে ভালো ক'রে একটু ঘোল খাওয়াতে হবে আপাততঃ। তক্রের অনেক গুণ, মাথা ঠাণ্ডা করে"—

"ঠাট্টা নয়, কি করতে চাও বলো। হঠাৎ যদি গ্রামে ফিরে যায় তাহ'লে অনেক দেরি পড়ে যাবে। সুদেষ্ণার লজ্জা ভেঙেছে, এখন সুমন্ত্রদা'র লজ্জাটাও ভাঙা যায় কি ক'রে? বেশ বুঝতে পারছি ওর মন"—

"অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াই আমার পেশা, তবে আপাততঃ সে কাজের জন্যে সরকার আমাকে মাইনে দিচ্ছেনা। সুতরাং তোমার পাপকার্যে 'এডিং অ্যাণ্ড অ্যাবেটিং' এর চার্জে যদি না পড়তে হয় তা'হ'লে বলতে পারি, এখন আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সুদেষ্ণার বিয়ের মিথ্যেগুজব সুমন্ত্রর কানে তোলা। যাহোক একটা হেস্তনেস্ত হ'য়ে যাবে তা'হ'লে।"

অনসূয়া বলিল, "কি ক'রে রটাবে? উনি তো পারতপক্ষে আমাদের বাড়ি আসেন না।"

"নেমন্তন্ন করব। খুব একটা বিপদে পড়েছি, তার সাহায্য না হ'লেই নয় জানিয়ে চিঠি দেব একটা তার বাড়ির ঠিকানায়। দিনের বেলা একবার-না-একবার সে বাড়ি যায় নিশ্চয়। ছোট্টু সিংকে দিয়ে কাল ভোরেই চিঠিখানা তার চিঠির বাক্সে ফেলিয়ে দেব। ডন কুইক্সট ঠিক ছুটে আসবে কালই।"

"উপস্থিত তো সে ভদ্রেশ্বরবাবুদের বাড়িতে? এখনই আর একবার টেলিফোন করলে হয় না?"

"রাত দশটা বেজে গেছে, এতরাত্রে আর ডাকাডাকি করবে? তবে হ্যাঁ, রাত্রে ডাকলে বিপদের গুরুত্বটা বেশী মনে হবে। তাই করো তাহ'লে। তবে মাঝরাত্রে না এসে হাজির হয়, বলে দিয়ো"—

"না, না, আমি নয়, এবার তুমি। কিছু যেন জানো না, এই ভাবে বলবে। তারপর, প্ল্যানটা সব শুনে নিই।"

"যথা আজ্ঞাপয়তি, দেবি। তারপর কাল সকালেই একখানা নেমন্তন্নর চিঠি ছাপাতে দেব। চেনা প্রেস আছে, খান দুইতিন কাগজ ছাপিয়ে নেওয়া যাবে দুপুরের মধ্যে। দুপুরেই সেটা পোস্টেড হবে বিডন স্ট্রীট থেকে। সুমন্ত্রকে সন্ধ্যার সময় টাইম দেব, সেই সময়েই এসে পৌঁছোবে চিঠিখানা তার সামনে, অন্য ডাকের সঙ্গে"—

"কি ক'রে আসবে এত তাড়াতাড়ি?"

"পুরোনো নিমন্ত্রপত্রের খাম নেই তোমার নাম লেখা, পোস্টঅফিসের ছাপ দেওয়া? সেখানায় নতুন ছাপা চিঠি তুমিই ভরে নিয়ে ঘরে ঢুকবে, খামটা তার হাতে দেবে কেন? আমার রোজকার বিকেলের ডাক অন্য ঘরে জমিয়ে রাখবে—সেই সঙ্গে আনবে।"

"যদি সন্দেহ করে? সোজা সুদেষ্ণার বাড়ি গিয়ে হাজির হয়?"

"সে-জন্য সুদেষ্ণার মা'র হাতের লেখা একখানা চিঠি লাগবে, যাতে সে না যায়। তাঁর হাতের লেখা কি চেনে সুমন্ত্র? জাল করতে পারবেনা তুমি?"

তিনি চিঠিপত্র বড়ো লেখেন না, আমার হাতের লেখাও সুমন্ত্রদা' চেনেন না। তবে জালিয়াতি শেষ পর্যন্ত?"

"এখন আর উপায় কি বলো? 'পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে।' না হ'লে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকো।"

"নাঃ, তা পারবনা। দেখাই যাক।"

নীতীশের ড্রয়িংরুমে গদিমোড়া সোফার একপ্রান্তে বসিতে বসিতেই সুমন্ত্র সোজাসুজি প্রশ্ন করিল,

"তারপর, হঠাৎ আমাকে স্মরণ করেছ কি জন্যে?"

নীতীশ হাসিমুখে বলিল, "একটা সুসংবাদ আছে। গৃহিণী বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছেন, তাঁর এক বান্ধবীর বিবাহ আসন্ন। একটা ফরমাসী কবিতার দরকার। তোমার এ বিষয়ে সহজ দক্ষতা আছে, তাই ভাবলুম"—

হায় ভগবান্! সুমন্ত্র ভাবিয়াছিল, দুইজনের মধ্যে কাহারও অসুখ, না-হয়. রাজনৈতিক কোনো গুপ্ত পরামর্শের জন্য এই জরুরী আহ্বান। বিরক্তি-বিরস কণ্ঠে বলিল,

"ভুল করেছ। কবিতা আজকাল আর আসে না আমার। তা'ছাড়া জানো তো, আমি ব্যস্ত মানুষ, দু'চারদিনের জন্য কলকাতায় আসি, নানা কাজের ভার নিয়ে। কবিতা লেখার সময় কোথায় আমার?"

নীতীশ বলিল, "জনশ্রুতি এই যে একজন প্রচণ্ড দেশকর্মী উপস্থিত প্রবল উৎসাহে তাঁর কোনো তথাকথিতা আত্মীয়ার বিবাহসংঘটনের জন্য ক'লকাতা শহর চষে বেড়াচ্ছেন। আমরা যে সংবাদ পেয়েছি সেটা জানলে তাঁর পরিশ্রমের কিছু লাঘব হ'তে পারে। তুমি আমাদের মানুষের মধ্যে গণ্য না করলেও আমরা তোমার শুভার্থী, তাই খবরটা তোমাকে জানানো প্রয়োজন বোধ করছিলুম। হয় তো কিছু হয়রানি বাঁচবে তোমার।"

"কী এমন খবর? চিঠিতে জানানো চলত না?"

"খবরটা এখনও বাতাসে ভাসমান অবস্থায় আছে, বিশেষ তার মধ্যে একজন ভদ্রমহিলার নাম জড়িত, তাই চিঠিতে লিখতে সাহস করিনি। শাস্ত্রে বলেছে 'শতং বদ, মা লিখ'।"

"যথেষ্ট গৌরচন্দ্রিকা হয়েছে, এইবার পালা শুরু হোক। কা'র বিয়ে?"

"সুদেষ্ণা দেবীর।"

সুমন্ত্র হাসিল, কিন্তু হাসিটা কেমন যেন জোলো মনে হইল, কেমন যেন আন্তরিকতাশূন্য। বলিল,

"সত্যিই সুসংবাদ। আমার একটা ভার নামল কাঁধ থেকে। কিন্তু খবরটা সত্যি তো? কোথায় বিয়ে শুনেছ কিছু? কা'র সঙ্গে? ক'দিন আগে গেছলুম ওঁদের বাড়ি, কিছু শুনলুম না তো?"

"শুনছি, ছেলেটি প্রফেসার। ঘরে পয়সা আছে, দেখতেও ভালো, তবে বয়সটা কিছু বেশী, চল্লিশ পেরিয়েছে। আগেই ওর মা'র সঙ্গে আলাপ ছিল নাকি। তাদের খুব আগ্রহ এই তেসরা ফাল্গুনেই বিয়েটা হয়। ওরা রাজি হয়েছে শুনছি।"

"সুদেষ্ণা দেবী আপত্তি করেন নি?"

"বোধ হয় না। আর করলেই বা তার আপত্তি শুনছে কে? তার মা'কে তো চেন না। অনেকদিন ধ'রে অপেক্ষা করেছেন,—এবার ধৈর্যের শেষসীমায় পৌঁছে নিজের হাতে লাগাম নিয়েছেন। ফাল্গুন মাসে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ছাড়বেন।"

"সুদেষ্ণার এম-এ পরীক্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হ'ত না? প্রফেসারই বা কি রকম লোক? এটুকু বোঝে না?"

"মেয়ের শুভাশুভ মেয়ের মা বুঝবেন, আমরা কি ব'লব বল? আর প্রফেসর ভদ্রলোকেরও তেমন দোষ নেই। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা যেচে এলে কে ছেড়ে দেয়? গর্দভেও নিজের ভালো বোঝে, এতো পণ্ডিত।"

সুমন্ত্র উঠিতেছিল। নীতীশ বলিল, "যাচ্ছ কোথায়?"

"অভিনন্দন জানিয়ে আসি। কালই গ্রামে ফিরতে হবে, আর বোধ হয় সময় হবে না।"

নীতীশ সুমন্ত্রের হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইল। বলিল,

"ভারবি বলেছেন, 'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্'। হঠাৎ কিছু কোরো না। আর দু'দিন সবুর করো, খবরটা আগে পাকা হোক। এই যে, আজকের ডাক বুঝি? আবার হলদে খাম কেন রে, বাবা! নেমন্তন্নপত্তর? জানো, সুমন্ত্র, এই নেমন্তন্নপত্তর দেখলেই ভয় করে আজকাল। কিছু খসাবে এখনই। কা'র বিয়ে গো?"

অনসূয়া চিঠির গোছা নীতীশের সামনে টেবিলে রাখিতে রাখিতে বলিল, "দেখছি।" নিমন্ত্রণের চিঠিখানা পড়িয়া খোলা অবস্থাতেই নীতীশের হাতে দিল। বলিল, "বলেছিলুম তোমাকে।" তারপর সুমন্ত্রের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে বলিল, "সুদেষ্ণার বিয়ের চিঠি। আপনার জন্যেও একখানা চিঠি দিয়েছেন মাসিমা, আমার চিঠির মধ্যে। আমার নামে একটা কবিতা লিখে দিতে হবে কিন্তু, সুমন্ত্রদা'।"

তুলট কাগজে সুরুচিসম্মতভাবে ছাপানো দুইখানি নিমন্ত্রণ পত্র, সেই সঙ্গে সাদা কাগজে লেখা একটি চিঠি। চিঠিগুলি পড়িয়া নীতীশ সুমন্ত্রের হাতে দিল। চিঠির মর্মার্থ, 'সুকল্যাণী দেবী সবিনয়ে নিবেদন করিতেছেন, তাঁহার কন্যা কল্যাণীয়া সুদেষ্ণার সঙ্গে পাটনাপ্রবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামমোহন সেনের পুত্র শ্রীমান্ আনন্দমোহনের বিবাহ আগামী তেইশে ফাল্গুন'—।

চিঠিখানা শেষ পর্যন্ত না পড়িয়া সুমন্ত্র অপর চিঠিখানা নীতীশকে ফেরত দিতে দিতে বলিল, "এটা আমাকে দিচ্ছ কেন?"

"তোমার কথা আছে। প'ড়ে দেখ।"

সুমন্ত্র পড়িল :

কল্যাণীয়াসু

মা অনসূয়া, হঠাৎ সুপাত্র পেয়ে সুদেষ্ণার বিয়ের ঠিক ক'রে ফেললুম। আমার লোকবল নেই, তোমরাই ভরসা। কেনাকাটা, নিমন্ত্রিতদের দেখাশোনা, বিয়ের ব্যবস্থা, তত্ত্বর ব্যবস্থা,—যা কিছু সমস্ত তোমাদের করতে হবে। আর এক কথা। তোমরা সুমন্ত্রকে চেনো নিশ্চয়, তোমার দাদার বন্ধু, আমাদের জামাই-এরও বন্ধু শুনেছি সে। তাকে এই সঙ্গের চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়ো। তবে এই বিয়ের পূর্বে আমাদের বাড়ি আসতে বারণ করলে ভালো হয় তাকে। আমার সন্দেহ হয়, তার সম্বন্ধে সুদেষ্ণার মনে দুর্বলতা আছে। সে যখন বিয়ে করবেই না, তখন আমি আর অপেক্ষা করতে পারলুম না। এ-সময়ে তার সাহায্য আমার খুব কাজে লাগত, কিন্তু মেয়ের মন অকারণ চঞ্চল ক'রে লাভ নেই। তাকে বুঝিয়ে বোলো, কিছু যেন মনে না করে। সে বুদ্ধিমান ছেলে, ঠিক বুঝবে। তোমরা দু'জনে আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো।

—শুভার্থিনী
মাসিমা
(সুকল্যাণী দেবী)

পড়িতে পড়িতে সুমন্ত্রের মুখ কেমন যেন রক্তহীন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, চিঠিখানা নীতীশকে ফেরত দিতে দিতে বলিল,

"বেশ। আমি আদার ব্যাপারী আমার জাহাজের খোঁজে দরকার কি, ভাই? যাক, বাঁচা গেল।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারো?"

নীতীশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এতক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়াছিল। বলিল,

"জলের চেয়ে এক বাটি গরম দুধ দিতে বলি? তোমাকে কেমন যেন অসুস্থ দেখাচ্ছে।"

"না, না, আমি ঠিক আছি। জলই দাও। জলের তেষ্টা কি দুধে মেটে?"

"ঠিক বলেছ। জলের তেষ্টা দুধে মেটে না। তবে সেটা বড় বিলম্বে বুঝলে, ভায়া, 'চৌরে গতে' এখন বুদ্ধি খুলছে বোধ করি। স্বাধীনতা দেবী ঘনামৃত দুগ্ধ, তাঁকে শ্রদ্ধা করতে হয়, করো, কিন্তু সুদেষ্ণা দেবী তৃষ্ণার্তের পক্ষে প্রয়োজনীয় জল, তাঁকে অবিলম্বে কণ্ঠে স্থান না দিলে জ্বালা জুড়োবে না তোমার।"

"তুমি কি ব'কছ মাথামুণ্ডু?"

"কিছু না। ওগো, সুমন্ত্রকে এক গ্লাস জল খাওয়াও না।" অনসূয়া উঠিয়া গেল। নীতীশ বলিল,

"শীঘ্রং ন যাত যদি তন্মুষিতাঃ স্থ মূঢ়া, যাতা সুদূরমধুনাগজগামিনী সা।" শ্রীহর্ষদেব বলছেন, 'রে মূঢ়, তাড়াতাড়ি না গেলে বঞ্চিত হবে, গজগামিনী হ'লেও সে এতক্ষণ অনেক দূর চলে গেছে।' আমি বলি, সুদেষ্ণা দেবী ঠিক রত্নাবলীর মতো গজগামিনী নয়, দৌড়ঝাঁপে অভ্যস্থা কলেজে-পড়া মেয়ে। তাঁকে ধরতে হ'লে মোটর নিয়ে বেরোতে হবে এখনি। বলো তো আমি সঙ্গী হ'তে রাজি আছি।"

সুমন্ত্র বলিল, "থাক, তোমার অত দয়া না করলেও চলবে। আচ্ছা ভাই, আমি আজ আসি তা হ'লে। লক্ষ্মীটি অনসূয়া, তোমার ফরমাসী কবিতা লিখতে পারলুম না ব'লে কিছু মনে কোরো না, সত্যিই আমার কিছু মাথায় আসছে না এখন।"

অনসূয়ার হাত হইতে জলের গ্লাসটা লইয়া এক নিঃশ্বাসে নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিল সুমন্ত্র, তারপর অকম্পিত হস্তে দরজার পরদা সরাইয়া ধীরপদে বাহির হইয়া গেল। স্বামীস্ত্রী মুখ চাওয়া-চাউয়ি করিয়া হাসিল। অনসূয়া বলিল,

"বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেল কিন্তু। মাসিমা জানতে পারলে কি ভাববেন বলতো? তা তোমার বুদ্ধিতে চ'লে শেষ পর্যন্ত উল্টো উৎপত্তি না হয় কিছু।"

"দেখ, এভাবে ঝুলে থাকা কিছু নয়। যাহোক একটা এস্পার ওস্পার হ'য়ে যাওয়া ভালো। হয় সুড় সুড় করে এসে পিঁড়েয় বসবে, না হয় দুড়দাড় ক'রে ছুটে গ্রামে পালাবে। তবে প্রথমটারই সম্ভাবনা বেশী। লেট আস্ টেক দি চান্স।"

সেদিন সারা সন্ধ্যাটা ছটফট করিয়া কাটাইল সুমন্ত্র। গোলদীঘির চারপাশে বারকয়েক পাক খাইল, শেষে নূরমহম্মদ লেনের আখড়ায় কিছুক্ষণ হাজিরা দিল। সেখানে তখন বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা লইয়া আলোচনা চলিতেছে। ক্ষণমাত্র সজ্জন-সঙ্গই যে ভবার্ণবতরণের নৌকা-স্বরূপ—শঙ্করাচার্যের সেই কথারই পুনরুক্তি শুনিল, 'সংসারঘোরমকরাকর-সেতুভূতঃ, সৎসঙ্গ এব শুভসর্গনিসর্গহেতুঃ।' শুনিল 'স্ত্রীভির্বিমোহিত-মতের্গৃহরাক্ষসীভিঃ বিত্তপ্রবৃত্তমনসঃ সুখবাঞ্ছয়ৈব ক্লেশাঃ পতন্তি পরুষাঃ পুরুষস্য দেহে'—গৃহরাক্ষসীদের মোহে পড়িয়া কিরূপে পুরুষ সুখকামনায় ধনার্জনে প্রবৃত্ত হইয়া কষ্টে পড়ে। শুনিল অনেক কিছুই, কিন্তু কিছুই যেন তাহার চিত্ত স্পর্শ করিল না। তবে কি অসৎসঙ্গের জন্যই তাহার অধোগতি হইতেছে? ধনীর ঐশ্বর্য দেখিয়া মাথা খারাপ হইতেছে তাহার? নারীর কুহকে পড়িয়া আর পাঁচজনের মতো এরপর অহোরাত্র অর্থ চিন্তায় বিব্রত হইতে হইবে তাহাকেও? বাড়ি ফিরিয়া ঝুলির মধ্যে গীতাখানা ভরিয়া লইল সুমন্ত্র, ভদ্রেশ্বরের বাড়ি গিয়া সেই রাত্রেই বিদায় লইবার সঙ্কল্প জানাইল সে। তাহাকে এইবার গ্রামে ফিরিতে হইবে, আর দেরী করা চলে না। শ্রীমতী কুণ্ডু আঁচলে চোখ মুছিলেন, কাছে বসিয়া খাওয়াইলেন। অনেক করিয়া সে রাত্রিটা থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। শেষ পর্যন্ত রাজি হইল সুমন্ত্র, বাছিয়া বাছিয়া ভালো জিনিষগুলি ফেলিয়া রাখিয়া শাকচচ্চড়ি এবং আলুভাতে দিয়াই প্রায় আহার শেষ করিল। প্রশ্ন করাতে বলিল,

"গ্রামে তো এর বেশি কিছু জুটবে না, এখন থেকেই মোহড়া দিচ্ছি।"

রাত্রি দুইটা পর্যন্ত বিজলী বাতি জ্বালাইয়া গীতা পড়িল সুমন্ত্র। স্থিতধী তাহাকে হইতেই হইবে, এত অস্থির হইলে চলিবে না তাহার। বার বার করিয়া পড়িল :

'দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।'

বার বার করিয়া আবৃত্তি করিল :

'বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিং অধিগচ্ছতি।'

আলো নিভাইয়াও ঘণ্টা-দুই সে ঘুমাইতে পারিল না। বার বার মনকে বুঝাইল, বেশ হইয়াছে, সে এবার নিশ্চিন্ত। শেষ রাত্রে ঘণ্টাখানেক কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ভোরের আলো ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া তল্পিতল্পা একটা ঝোলায় পুরিয়া রওনা দিল। চিঠি রাখিয়া গেল,

'আবার দেখা হবে। কৃতজ্ঞ।'

নিজের বাড়িতে পৌছিয়া মনটা আরও যেন দমিয়া গেল সুমন্ত্রের। কি করিয়া থাকিবে সে এ-বাড়িতে এখন! দরজার সামনের উঠানে ঐখানটায় তো বসিয়াছিল সুদেষ্ণা? এই সিঁড়ি দিয়াই তো উপরে উঠিয়াছিল? ঘরের কত জিনিসে হাত দিয়াছে না জানি! সেই ঘর, সেই বাড়ি, কিন্তু কোথায় কি যেন পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কে যেন পৃথিবীর পরিপূর্ণ রঙ্গশালায় স্বপ্নমদির সবুজ আলোটা নিভাইয়া দিয়াছে। কাল যে কলিকাতা তাহার কাছে,—'বস্তুভারশূন্য উজ্জয়িনী' হইয়া উঠিয়াছিল, যেখানে সমস্ত অসম্ভব সম্ভব হইতে পারিত, আজ সে শুধুই কলিকাতা। ট্রাম-বাসের ঘর্ঘরে কোনো মাধুর্য নাই, ইটকাঠের স্তূপে কোনো মমতা নাই। নাঃ, আর সে এখানে আসিবে না, গ্রামেই ফিরিয়া যাইবে। সেখানে দারিদ্র্যের মধ্যেও আন্তরিকতা আছে, মাথায় লাঠি মারিলেও শহরের মতো পিঠে ছুরি মারে না কেহ। কাল যে মেয়ে বাড়িতে আসিয়া ধরা দেয়, আজ সে হাসিমুখে অন্যকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয় না। সুদেষ্ণার মা বোধহয় কিছুই জানেন না, তাঁহাকে জানাইবে নাকি কথাটা? না, না, এ সব কি দুর্বুদ্ধি তাহার মাথায় আসিতেছে। সে জানিয়া শুনিয়া আগুনে হাত দিয়াছিল, হাত পুড়িয়াছে। আগুনের কি দোষ? প্রথম দিনের এক মুহূর্তের ভুল,—এক মুহূর্তের মোহের জের,—তাহাকে এখন চিরজীবন টানিয়া চলিতে হইবে। সুদেষ্ণার কি অপরাধ? আহা, সুখী হউক সে, স্বামীর প্রেমে, ঐশ্বর্যের স্বাচ্ছন্দ্যে, দর্শনচর্চা সাহিত্যচর্চার আনন্দে সার্থক হউক তাহার জীবন।

কিন্তু সে কি সত্যই সুখী হইবে? অবাধ্য মন প্রশ্ন করে, তুমি তাঁহার সুখশান্তি হয় তো জন্মের মতো হরণ করিয়াছ, এখন দূরে বসিয়া গুরুঠাকুরের

মতো আশীর্বচন আওড়াইবার কি অধিকার আছে তোমার? সে মনে মনে ক্ষমা চাহিল সুদেষ্ণার কাছে। বলিল, 'আমার কাছে আসিয়া তো সে সুখী হইত না, তাহাকে ভালোবাসি বলিয়াই—হাঁ, নিজের কাছে সে আর কোনো কথা গোপন করিবে না—তাহাকে ভালোবাসি বলিয়াই তাহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি'।

সারা সকালটা শুইয়া বসিয়া কাটাইল সুমন্ত্র। দুপুরে পাইস-হোটেলে খাইতে গিয়া ভীষণ রাগ হইল ভদ্রেশ্বরের উপর। কুক্ষণে তাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল এখানে। তাহার জন্য গৃহ সন্ধান করিতে গিয়াই তো জড়াইয়া পড়িল এভাবে! কিন্তু সুদেষ্ণার সঙ্গে পরিচয় কি তাহার জীবনের একটা মস্ত বড়ো লাভ নয়? তাহাব মানসপ্রতিমা মূর্তি ধরিয়া মর্তে আসিয়াছে, তাহাকে সে চোখে দেখিয়াছে, হাতে স্পর্শ করিয়াছে, একি কম সৌভাগ্য!—নাঃ, এসব চিন্তাও পাপ। সে এখন পরস্ত্রী হইতে চলিয়াছে। সুমন্ত্র আজই গ্রামে ফিরিবে। সব ভুলিতে চেষ্টা করিবে। ভদ্রেশ্বরের দরুণ যে টাকাটা পকেটে আছে তাহাতে এখন মাস দুই নিশ্চিন্ত চিত্তে গ্রামে বসিয়া স্কুল চালানো যাইবে। খুব খাটিবে এইবার সে, দিনরাত খাটিবে। কাজের চাপে প্রেমের নেশা বাপ বাপ করিয়া পলাইতে পথ পাইবে না।

কিন্তু কেন জানি না গ্রামে ফিরিবার কথা মনে করিতেই মনটা তাহার কেমন বিস্বাদ হইয়া গেল। যে অর্থহীন শূন্যতাবোধ কিছুদিন হইতে তাহার অবচেতন মনকে পীড়া দিতেছিল আজ তাহা তাহার জাগ্রতচেতনায় প্রত্যক্ষ হইয়া তাহাকে ভয় দেখাইতে উদ্যত হইল। সুমন্ত্র যত নিজেকে বোঝায়, যাহা হইয়াছে ভালোই হইয়াছে, ততই তাহার বিদ্রোহী মন প্রশ্ন করে, 'তারপর?' সুমন্ত্র যত বলে আমার দেশ আছে, আমার হতভাগ্য দেশবাসীর সেবা আছে, আমার কর্তব্য আছে—ততই প্রশ্ন আসে, 'তারপর?' সুমন্ত্র দেশজননীর উদ্দেশ্যে নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করে:

"দেখিলাম, আগে চলিয়াছে ধরণী, নিশার আকাশ কাঁপিছে জয়োল্লাসে,
কাঁটায় কাঁকরে কীর্ণ সে সরণী, দেবতা কেবল দাঁড়ায়ে আমার আশে।
ছোটোদান নিয়ে মেটে না তাহার আশা,
ভাগ করে তারে যায় না কো ভালোবাসা
আর কারো সাথে, অভিমানিনীর মান রাখিবারে তাই পণ করিলাম প্রাণ।"

সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিপক্ষ মনটা প্রশ্ন করে, কাল পণের সঙ্গে তোমার যে

প্রাণটা যুক্ত ছিল, আজ সেটা সেখানে আছে তো? তাহার নিজের ভাষাতেই বলে,

"আর যা করিবে করিয়ো কেবল মনেরে আপন ঠেরো না আঁখি।
কি করিতে চাও, কিযে করিতেছ—আজিও, বন্ধু, বুঝিলে না কি?"

খাওয়া দাওয়া সারিয়া বেলা দুইটার মোটর লঞ্চে সে রওনা হইবে স্থির করিয়াছিল, কিন্তু দুইটা পর্যন্ত ঘরে শুইয়াই কাটিয়া গেল। তারপর রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী খুলিয়া বসিল সুমন্ত্র। পুরাতন আমলের টালি সংস্করণের বই, মা'র নাম লেখা। প্রথম যে পাতাখানা সে খুলিল, তাহাতে কচ দেবযানীর কাছে বিদায় লইতেছেন। বলিতেছেন:

'ভালোবাসি কিনা আজ
সে তর্কে কি ফল? আমার যে আছে কাজ
সে আমি সাধিব। স্বর্গ আর স্বর্গ ব'লে
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ মৃগসম,
চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধপ্রাণে মম
সর্বকার্য মাঝে—তবু চ'লে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে'—

বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িল সুমন্ত্র। নাঃ, ঠিক তুলনা চলে না। কচের না-হয় উপায় ছিল না, কিন্তু তাহার তো উপায় ছিল। তাহার সমস্ত শূন্যতা পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিত যে আনন্দপ্রতিমা, তাহাকে সে স্বেচ্ছায় অথবা লোকলজ্জায় নিজ হস্তে বিসর্জন দিয়াছে। কিন্তু বিবাহ কি তাহার পক্ষে উচিত হইত? দেশের কাজের কথা, নিজের সঙ্কল্পের কথা না-হয় ছাড়িয়া দেওয়া গেল, যাহাকে সে জীবনসঙ্গিনী করিতে চায় তাহাকে কি সে সুখী করিতে পারিত? তাহার কুণ্ঠিত মন স্বীকার করিল, না, কখনোই না, 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।'

নিজের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল সুমন্ত্র। বাড়িতে তালা দিয়া সোজা কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে গিয়া উপস্থিত হইল সে, ট্রাম ধরিবার জন্য। কিন্তু শ্যামবাজারের ট্রাম আর আসে না। কোথাও বোধ হয় লাইনে কিছু গোলমাল হইয়াছে। অধীর ভাবে খানিকটা পায়চারি করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিল সুমন্ত্র, কিন্তু শ্যামবাজারের দিকে নয়, সোজা দক্ষিণে।

আসিবার সময় গ্রামের বন্ধু নিতাই অনেক করিয়া বলিয়া দিয়াছিল, একখানা সবুজ রঙের পাঁচ হাতি গামছা কিনিয়া লইয়া যাইতে, খুব মনে পড়িয়া গিয়াছে। গোলদীঘির রেলিংএর ধারে মীর্জাপুর ষ্ট্রিটের মোড়ে সস্তায় গামছা বিক্রয় হয় না? সুমন্ত্র সেখানে যখন পৌছিল তখন চারটা বাজিয়া গিয়াছে। রাস্তার অপরদিকের ফুটপাতে আশুতোষ বিল্ডিং হইতে বাহির হইয়া কতকগুলি ছেলেমেয়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, কেহ কেহ বা এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। দুই তিনজন ছাত্র কলরব করিতে করিতে রাস্তা পার হইয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন বলিল "মেয়েটার ইডিপাস কম্‌প্লেক্স' আছে। আমাদের কাউকে চোখে ধরে না, যত ভাব প্রফেসারদের সঙ্গে।" আর একজন বলিল "ঘাগী মেয়ে, বাবা, নম্বর তুলতে জানে। এবার দেখবি এম, এ-তে ফার্স্ট হবে।" আর একজন বলিল, "তা কেন বলছ, যদি হয় তো নিজের যোগ্যতাতেই হবে। কেষ্টবাবু তো দারুণ প্রশংসা করেন ওর। আর মনটাও বড়ো ভালো, কখনো কোনো ভালো কাজে পেছিয়ে থাকতে দেখিনি। পাঁচ টাকার কম চাঁদা দেয়না কখনো। কত তো মোটরে-চড়া মেয়ে দেখি—"

"এই রে, মরেছে। কোনো লাভ নেই, বাবা, ও বড়ো শক্ত ঠাঁই।" আর একজন মন্তব্য করিল, "ওর দোষ কি? সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। ঋষিবাক্য, দাদা, খাস বঙ্কিমচন্দ্রের কথা। তা তুই যে নোট চাইতে গেছলি, দিলে?"

একজন পূর্ববঙ্গের ভাষায় বলিল, "আরে ত্যাখ কিয়া, Z। ভালো মাল তা বি. এ. পরীক্ষার পুর্বেই পার হইয়া গেসে। Z। পইরা আসে তা গর্দা মাল। মাকাল ফল।"

সুমন্ত্র এতক্ষণ পিছন ফিরিয়া গামছার দর করিতে ব্যস্ত ছিল, কথাগুলা কানে আসিলেও কাহাকে উদ্দেশ করিয়া সেগুলি উচ্চারিত হইতেছিল তাহা লক্ষ্য করে নাই। গামছা কেনা শেষ করিয়া পিছন ফিরিবামাত্র চোখে পড়িল রাস্তার ওপারে অপর দিকের ফুটপাতে দাঁড়াইয়া সুদেষ্ণা এবং সেবা একজন মধ্যবয়সী হৃষ্টপুষ্টদেহ অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ করিতেছে। অধ্যাপক চলিয়া গেলেন, এক মুহূর্তের জন্য চোখোচোখি হইল দু'জনের। সুমন্ত্র রাজপথ-ভরা জনপ্রবাহ ভুলিয়া গেল, কর্তব্য অকর্তব্য ভুলিয়া গেল। মনে হইল এইতো শেষ দেখা, একবার একটা বিদায়

বাণী বলিয়া আসিতে দোষ কি? সুদেষ্ণা সুখী হইবে জানিতে পারিলে নিজের সব দুঃখ ভুলিতে পারিবে সে।

ওদিকের ফুটপাথে সেবাও ততক্ষণে তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছে, সে হাসিয়া উঠিল, সঙ্গিনীকে কি যেন বলিল, তারপর চীৎকার করিয়া ডাকিল "সুমন্ত্রদা'।" সুমন্ত্র লক্ষ্য করিল সুদেষ্ণার হাসিমুখ সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। সুমন্ত্র হাত নাড়িল সেবার উদ্দেশ্যে, পরক্ষণেই এস্প্ল্যানেডের ট্রাম আসিয়া দুই ফুটপাথের মধ্যে অন্তরাল রচনা করিয়া দাঁড়াইল। ছেলের দল হৈ হৈ করিতে করিতে উঠিয়া পড়িল, সুমন্ত্রও নিমেষমাত্র চিন্তা করিয়া দক্ষিণের ট্রামেই উঠিয়া বসিল।

তাহা হইলে এই অবস্থা? সুমন্ত্রকে দেখিলে এখন বিরক্ত হয় সুদেষ্ণা? না হইবেই বা কেন? সে তো তাহার মান্য রাখে নাই, তাহার মূল্য বুঝে নাই। তা' ছাড়া, হাতের পাঁচ বাহির হইয়া গিয়াছে, আর এখন চিন্তা করিয়া লাভ কি? এখন সে চাহিলেও সুদেষ্ণার মা রাজি হইবেন না। নিমন্ত্রণ পত্র ছাপা হইয়া গিয়াছে, হয়তো পাকা-দেখাও হইয়া গিয়াছে। ভদ্রলোকের কাছে কথা দিলে কি আর ভাঙা চলে? মানীর মান যায় যে তাহা হইলে, তাহার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয় যে। কিন্তু সুদেষ্ণা কি বলিয়া রাজি হইল? একজনকে ভালোবাসিয়া আর একজনকে বিবাহ করিতে বাধিতেছে না তাহার? পরক্ষণেই তাহার সপক্ষে যুক্তি আসিয়া পৌছিল, সে তো আধুনিক মেয়েদের মতো নয়। এখনই তো নিজের কানে শুনিয়াছে সে, সুদেষ্ণা সহপাঠীদের চেয়ে অধ্যাপকদের সহিত আলাপ করিতেই বেশি ভালোবাসে। সে তো মা'র কথায় কথা বলিবে না! খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিবার মতো অপমানকর অনুষ্ঠানে সে যখন রাজি হইয়াছিল তখন—

নাঃ, এসব কি আবোলতাবোল ভাবিতেছে? ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল সুমন্ত্র। ধর্মতলার ট্রামে চড়িয়া সার্কুলার রোড দিয়া শ্যামবাজারের দিকে যাইতে যাইতে হঠাৎ আবার কি মনে হইল, বদ্রীদাস টেম্পল্ রোডের মোড়ে নামিয়া পড়িল সে। এখানে তাহার এক আত্মীয় থাকেন, তাহার এক পিসতুতো দাদা। ভাই বটে, বন্ধুও বটে, বয়সে মাত্র কয়েক মাসের বড়ো। সুমন্ত্র যখন দেশ স্বাধীন করিতে গিয়াছিল, তিনি তাহার পূর্বেই নিজের আর্থিক উন্নতির চেষ্টায় লাগিয়াছিলেন। এখন অবস্থা ভালোই। মোটর কিনিয়াছেন, টালিগঞ্জে বাড়ি করিতেছেন। যাতায়াত

কমিলেও উভয়পক্ষের মধ্যে আন্তরিক স্নেহটা বজায় আছে, বিশেষ করিয়া টুলুদা'র এবং তাঁহার পত্নীর বৈষয়িক বুদ্ধির উপর শ্রদ্ধা আছে সুমন্ত্রের; চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের পরামর্শ লওয়াই কর্তব্য বিবেচনা করিল সে।

টুলুদা' সবে অফিস হইতে ফিরিয়া দোতলার ঘরে মেহগ্নির খাটে ধবধবে বিছানায় হাত পা মেলিয়া শুইয়াছেন, বৌদিদি তাহার মাথার কাছে বসিয়া বাতাস করিতেছেন। সুমন্ত্র ঢুকিতেই বলিলেন, "মণ্টুবাবু হঠাৎ কি মনে ক'রে? বৌদি'টিকে উদ্ধার করবার মতলব নেই তো?"

সেই যে কবে একটি নির্যাতিতা বধূকে স্বামীর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া নারীহরণের দায়ে জেলে যাইতে যাইতে বাঁচিয়া যায় সুমন্ত্র, টুলুদা' সেই প্রসঙ্গটা লইয়া এখনও মাঝে মাঝে রসিকতা করিতে ছাড়েন না।

সুমন্ত্র বলিল, "উপস্থিত তো নেই, তবে যে রকম স্বামীগিরি ফলাচ্ছ তাতে ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না!"

"হিংসে হচ্ছে বুঝি? ছ্যাখ, হতভাগা ছ্যাখ, বিয়ে করার সুখটা। এই ছ্যাখ টেবিলের ওপর চায়ের কাপ, গরম লুচি, আলুর দম। বাজারের নয়, সব ঘরের তৈরি। ওগো, পাটা কেমন কন কন করছে, একটু টিপে দেবে?"

"আমার সামনে না দিলেও চলবে। তোমার মতো বর্বরের বিয়ে করা উচিত হয়নি, একটা ঝি রাখলেই পারতে। তারপর বৌদি', বাড়ীর খবর সব ভালো? ছেলেমেয়েরা খেলতে বেরিয়েছে বুঝি? ঝি চাকর আছে তো বাড়িতে?"

"কারেণ্ট অ্যাকাউণ্ট ভাই, আসছে, যাচ্ছে। শেষবারের ঝিটি আমার পাউডারের কৌটো আর সেণ্টের শিশি শেষ করছিল ব'লে বকেছিলুম, তাই একদিনের নোটিসে ছেড়ে গেল। অনেকটা শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ ক'রে তুলেছিলুম, আবার একটা ভূত জুটেছে। তোমায় বলব কি ঠাকুরপো, শাশুড়ীকে এত ভয় করিনি, ঝিকে যত ভয় ক'রে চলতে হয়।"

টুলুদা' বলিলেন, "খাতা পেন্সিল আছে পকেটে? নোট নে: বিবাহে সুখী হইতে হইলে প্রথম প্রয়োজন বাড়িতে ভালো ঝি। ভালো ঝিকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন পাউডার এবং এসেন্স কিনিয়া গৃহকর্তার ও কর্ত্রীর করজোড়ে অবস্থান।"

সুমন্ত্র ফস করিয়া প্রশ্ন করিয়া বসিল,—"আচ্ছা বৌদি', আপনার কি মনে হয় বলুন তো, আমি যদি বিয়ে করি তাহ'লে কি স্ত্রীকে সুখী করতে পারব ?"

টুলুদা উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "পথে এস, বাবা, পথে এস। রং ধরেছে তাহলে ? বেশ, বেশ, কুষ্ঠী মিলেছে ? শানাইএর বায়না দেব ? আমি বলি শোনো, সুখ অসুখ উইল ডিপেণ্ড অপন ইয়োর ব্যাঙ্ক ব্যাল্যান্স ! ব্যাঙ্কে কত আছে ব'লে দাও, আমি উত্তর দিচ্ছি।"

"এক কানা কড়িও নেই।"

"তাহ'লে যেখানে সম্বন্ধ হচ্ছে সেখানে কি রকম আশা করছ ? দশ হাজার ?"

"এক কানা কড়িও না।" টুলুদা' হতাশ হইয়া শুইয়া পড়িলেন। তারপর আবার উঠিয়া বসিয়া লুচির প্লেট টানিয়া লইয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন।

বৌদিদি প্রশ্ন করিলেন, "তোমার নাক ডাকে ?"



তোমার নাক ডাকে ?

"নিজে তো শুনতে পাই না, তবে সে-নিয়ে কা'রো কোনো অভিযোগ কানে আসেনি এ পর্যন্ত। কিন্তু বিয়ের সঙ্গে নাক-ডাকার কি সম্পর্ক ?"

"আছে, ভাই, আছে। রজনীকান্তের গান শোনোনি—

'স্বামী নয়, ঘুমের শনি,
প্রাণ কাঁপে তার নাকের ডাকে।
বাপ মা যখন পাত্র দেখেন,
দেখেন নি ঘুম পাড়িয়ে তাকে।'

আমি মাসের পর মাস অর্ধেক-রাত্তির জেগে কাটাই, ভাই। বাইরের লোকে গহনা কাপড় দে'খে মনে করে আমি কত সুখী।"

টুলুদা' অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন, "নোট নে হতভাগা, নাকে সাইলেন্সার ফিট করিতে হইবে।"

না, ইহারা কেবলই ঠাট্টা করে, কেহই সুমন্ত্রের কথাটার—তাহার প্রয়োজনের—গুরুত্ব বুঝিতেছে না। সুমন্ত্র উঠিয়া পড়িল। বৌদিদি বলিলেন, "চ'লে যেয়ো না ঠাকুরপো, গরম লুচি ভাজছি, দু'খানা খেয়ে যাও।"

বৌদিদির পিছন পিছন রান্নাঘরে ঢুকিয়া মাটিতে পিঁড়া পাতিয়া বসিল সুমন্ত্র। বৌদিদি বলিলেন, "সত্যি বিয়ে করবে? আমার জানা ভালো মেয়ে আছে। কথায় বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন। তেমন মেয়ে ঘরে এলে চাই কি তোমারও ভাগ্য ফিরে যেতে পারে।"

"মেয়ে ঠিক আছে, বৌদি', আমিই সাহস পাচ্ছি না! আমার মতো চালচুলোহীন হতভাগার পক্ষে বিয়ে করা কি"—

"ও, লভ ম্যারেজ? মেয়ে তা'হলে পছন্দ করেছে তোমাকে? তোমারও পছন্দ হয়েছে তাকে? চমৎকার! দেখ, মেয়েটি সত্যি যদি ভালো হয় আর সত্যি যদি ভালোবেসে থাকে তোমাকে—তাহ'লে আর ভেবো না। দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়ো। ওঁব কথাটার মূল্য আছে খানিকটা, বেশী দারিদ্র্যে অনেক সময় স্নেহ প্রেম জ্বলে যায় এও সত্যি, তবে দু'জনেরই যদি মনটা একটু—কি ব'লে বোঝাব,"—

সুমন্ত্র বলিল, "একটু উঁচু সুরে বাঁধা থাকে"—

"ঠিক বলেছ, একটু উঁচু সুরে বাঁধা থাকে তাহ'লে কিছুতে আটকায় না।"

"কিন্তু একটা মুস্কিল হয়েছে বৌদি', আমি ভাবতে ভাবতে সময় কাটাচ্ছিলুম, ইতিমধ্যে তার মা অন্য জায়গায় বিয়ের ঠিক ক'রে ফেলেছেন। নেমন্তন্নর চিঠি পেলুম এইমাত্র। এই দেখ।"

বৌদিদি দেখিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "এই কথা? মিয়া বিবি রাজি, তো কি করবে কাজি? বিয়ের পিঁড়ি থেকে কত বর উঠে যায়, এতো সবেমাত্র নেমন্তন্নপত্তর। কি খাওয়াবে বলো, আমি ভাংচি দিচ্ছি। মেয়ের মাকে লিখে দেব সে ছেলের স্বভাবচরিত্র ভালো নয়, না-হয় ছেলের বাবাকে লিখব মেয়ের"—

"ছিঃ, বৌদি'!"

"সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না, এ তো বড় বিপদে ফেললে। মেয়ের মাকে তুমি নিজে গিয়ে ধরো না হয়। বলো তো অবস্থাটা বুঝিয়ে আমিই একখানা চিঠি দিই, দু'টো জীবন নষ্ট হ'তে বসেছে জানিয়ে।"

"সেও আর হয় না। তাঁরা অনেকদিন সুযোগ দিয়েছেন আমায়, আমি নিইনি।"

বৌদিদি রাগ করিয়া বলিলেন, "তবে আর বিয়ে ক'রে কাজ নেই তোমার। গেরুয়া নিয়ে কাশী যাও।"

"নিজের জন্যে ভাবছি না, বৌদি, তার ওপর অন্যায় করলুম মনে হচ্ছে।"

"যখন অন্যায়ের প্রতিকার কিছু করবে না, তখন ও নাকে-কাঁদার মানে হয় না। মেয়েটির কোনো বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ আছে তোমার? বেশ, তার শরণ নাও, সে ঠিক বুদ্ধি দেবে। তোমার মাথায় আর কিছু নেই, খেটে খেটে সব শুকিয়ে ঘুঁটে হ'য়ে গেছে।"

সুমন্ত্র সেখান হইতে বাহির হইয়া শ্যামবাজারের প্রেসবাড়ীতে সম্পাদক বন্ধুর শরণাপন্ন হইল। তিনি সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "তোমার মধ্যে যে একটা গোলমাল চলছে তা আমি কিছুদিন থেকেই আন্দাজ করছিলুম, তবে এতটা এগিয়েছ তা জানতুম না। যাই হোক, অন্য পাত্রী দেখ, সুমন্ত্র, ও মেয়ের আশা ত্যাগ করো। ওর অনেকদিন থেকে একটি প্রফেসারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা চ'লছে খবর পেয়েছি।"

"সে কিন্তু সে-রকম মেয়ে নয়।"

"না, খড়দার মা গোঁসাই। দেখ সুমন্ত্র, 'পুষ্পং অনাঘ্রাতং কিশলয়ং অলূনং' ও সব কাব্যেই ভালো, বিংশ শতাব্দীর ক'লকাতা শহরে কলেজে-পড়া সুন্দরী মেয়ের কাছে বেশী আশা কোরো না।" শ্মশ্রুহীন চিবুকে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "এই ক'রে দাড়ি পাকালুম, হে, আমার উপদেশ শোনো। বিশেষ রকম খবর না জেনে বলছি না আমি, মেয়েটির অন্য লাভার আছে। যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে সে সেইব্যক্তি কিনা তা নাই শুনলে? কেন দুঃখ পাবে, ভাই, এখনও সাবধান হও, কথা শোনো।"

পরদিন সকালবেলা পটুয়াটোলা লেন হইতে গভীরতর-গৃহারণ্যে-প্রবিষ্ট একটি অন্ধগলির মধ্যে একখানি দোতলা বাড়ির নীচের তলার প্রায়ান্ধকার ঘরে একটি কেরোসিন কাঠের টেবিলের দুই পাশে দুইখানি সস্তার চেয়ার পাতিয়া বসিয়াছিল সুমন্ত্র এবং সেবা। একপাশে একখানি আমকাঠের তক্তপোষের উপর মাদুর বিছানো, আর একপাশে দেয়ালের গায়ে সারি সারি তাক-ভর্তি বই। কোণে খবরের-কাগজে-মোড়া প্যাকিং-

কেসের উপরেও দুই থাকে সাজানো কিছু বই-খাতা, দোয়াত-কলম এবং একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন। গৃহসজ্জার মধ্যে একদিকে যেমন দারিদ্র্যকে গোপন করিবার কোনো প্রয়াস ছিল না, অন্যদিকে তেমনি অপরিচ্ছন্নতা কোথাও কিছু ছিল না, সৌন্দর্য না থাকুক, শ্রী ছিল। সেবাই প্রথম কথা বলিল,

"আপনি আসবেন আমি জানতুম সুমন্ত্রদা'।"

সুমন্ত্র বলিল, "তুমি ভুল বুঝেছ, আমার বই ঠিক আছে কিনা দেখতে আসিনি।"

সেবা বলিল, "তাও জানি, বউ ঠিক আছে কিনা জানতে এসেছেন। সুদেষ্ণার সঙ্গে আলাপ হবার পর আমাকে যখন স্মরণ করেছেন, তখনই অনুমান করেছি ব্যাপারটা। পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।"

সুমন্ত্র বলিল, "তুমিও আমাকে ঠাট্টা আরম্ভ ক'রলে? বয়স আটাশ হ'ল, মেয়েদের পেছনে ঘোরবার বয়স আছে কি আর?"

"যৌবনের কি বয়স দিয়ে হিসেব হয়, সুমন্ত্রদা'? তা বেশ, আপনি যখন দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করতেই এসেছেন তখন বের্গ্‌স' নিয়েই আরম্ভ করা যাক।"

"তার চেয়ে ইকনমিক হিষ্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে আমার জ্ঞানটা একটু স্পষ্টতর। দাভিঞ্চির 'দেলানাতমিয়া' অথবা মণ্ডনের 'বাস্তুশাস্ত্র' নিয়েও আরম্ভ করা যেতে পারে।"

"ওসব আমি পড়িনি। আচ্ছা, আপনি দর্শন পড়েন নি একেবারেই?"

"পড়েছি কিছু, তবে শ্রবণ করেছি বন্ধুদের মুখে তার চেয়ে বেশী। 'নারদ পঞ্চরাত্র', মায়াবাদ বা সুখাবতী ব্যূহ নিয়ে উড়োতর্ক করলে তোমাকেও হারাতে পারি হয়তো, তবে সেটা আমার নিজের কথা হবে না। তোমরা যা জানো আমরা তা জানি না, আমরা যা জানি তোমরা তা জানো না,—এটা মেনে নিয়ে সন্ধি হতে পারে না? অপরকে ছোটো ভেবে লাভ কি?"

"আমি আপনাকে ছোটো ভাবি না সুমন্ত্রদা', আমার বন্ধুও ভাবে না। আচ্ছা, সত্যি বলুন তো, সুদেষ্ণার মতো বউ পাওয়া ভাগ্যের কথা নয়? পুরুষ মানুষ হ'লে আমি আপনাকে হিংসে করতুম। কবির ভাষায় সুদেষ্ণার মতো রমণীর মন—

'সহস্র বর্ষেরি, সখা সাধনার ধন।'

তা আপনি এত সহজেই পেয়ে গেলেন? বিনা সাধনায়!"

হরিষে বিষাদে রাজা দুর্যোধনের মৃত্যু হইয়াছিল, সুমন্ত্র মরিল না। একটা ঢোঁক গিলিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল,

"দেখ, তাঁর কথা নিয়ে আলোচনা করাটা ঠিক হচ্ছে না বোধ হয়। তিনি এখন পরস্ত্রী হ'তে চলেছেন।"

"এই ছিলেন ভাই, এর মধ্যে পর হয়ে গেলেন? ঘটকালি ফাঁকি দেবার মতলব?"

"কি যা-তা বলছ? তেইশে ফাল্গুন তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, জানো না?"

সেবা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "এ কথাটাতো জানতুম না। কনগ্র্যাচুলেশনস্! সুদেষ্ণার মনের অবস্থা জেনে পর্যন্ত আমি একটা বিয়ের কবিতা লিখব ঠিক ক'রে রেখেছি। আপনার মতো হুড় হুড় ক'রে তো আসবে না। তাই ধীরে ধীরে এগোচ্ছি রোজ দু'চার লাইন ক'রে। আচ্ছা, এটা কেমন হবে বলুন তো:

'দূর মহাকাশচারী ক্লান্তপক্ষ বিহঙ্গম আজি লভিল কুলায়।
তোমার ধ্যানের ধন ধরা দিল বধূ বেশে সাজি ধরার ধূলায়।
হে বন্ধু, বন্ধুর পথে মিলিয়াছে যাত্রাসহচরী,—নারী মনস্বিনী'—

সুমন্ত্র বলিল, "কবিতা সুন্দর হচ্ছে, কিন্তু পণ্ডশ্রম হচ্ছে তোমার। অধ্যাপক আনন্দমোহন বাবুর সঙ্গে সুদেষ্ণার বিয়ে। এই দেখ তার নেমন্তন্নর চিঠি।"

সেবা বিস্মিত হইয়া সুমন্ত্রর হাত হইতে চিঠিখানা লইল। পরক্ষণেই মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, এ হ'তে পারে না। এ চিঠি জাল, এ কা'রো চক্রান্ত। আমি সুদেষ্ণাকে চিনি। এ অসম্ভব?"

"চক্রান্ত? কা'র বিরুদ্ধে? অসম্ভবই বা কিসে? তাঁর মা যদি জোর ক'রে বিয়ে দেন,—আমি শুনেছি তিনি জোর ক'রেই দিচ্ছেন"—

"কোথায় শুনেছেন? কা'র কাছে শুনেছেন?"

সুমন্ত্র নামটা বলিতে গিয়াও বলিতে পারিল না, বলিল,

"আমার এক বন্ধুর কাছে। তাঁর স্ত্রী সুদেষ্ণা দেবীর সহপাঠিনী ছিলেন, তিনি ওঁর সব খবর জানেন।"

"সুদেষ্ণার মনের খবর তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু দু'একজন ছাড়া কেউ জানে না, রাস্তার লোককে ব'লে বেড়ায় না সে। তাহ'লে সেই বন্ধুর বাড়িতেই

খবরটা পেয়েছেন? আমি বলছি আপনাকে, আপনি যা জেনেছেন, যা দেখেছেন সব ভুল। সেই বন্ধুটিরই চক্রান্ত বোধ হয়। আপনার সৌভাগ্যে হিংসে হয়েছে তাঁর।"

সুমন্ত্রের বুকের বোঝাটা যেন হাল্কা হইয়া গেল, অসতর্ক মুহূর্তে বলিয়া ফেলিল, "এ তুমি অন্যায় কথা ব'লছ, সেবা। আমার সামনে ডাকের চিঠি এল, খাম খুলে স্বামীকে দেখালে অন"—

সুমন্ত্র থামিয়া গেল। সেবা হাসিয়া বলিল,

"তারপর কি করলেন নীতীশবাবু? খামখানা রেখে চিঠিখানা আপনাকে দিলেন? আপনি সুদেষ্ণাকে অভিনন্দন জানিয়ে আসতে যেতেন যদি তখনই, তাহ'লেই সত্য মিথ্যা ধরা পড়ত।"

"যাবার আমার উপায় ছিল না। তাঁর মা আমাকে বিয়ের পূর্বে যেতে বারণ করেছিলেন তাঁদের বাড়িতে?"

"ও, তাহ'লে সবদিকে আট ঘাট বেঁধে কাজ হয়েছে? আপনার না খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি? আমার হাত দেখে চুড়ি বাঁধা দেওয়ার খবর জেনেছিলেন, নিজের বেলা সে দৃষ্টিটা কোথায় ছিল, সুমন্ত্রদা'? মাসিমার চিঠিখানা দেখতে পারি একটু?"

সুমন্ত্র চিঠি দিল, সেবা এইবার উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। বলিল,

"এ তো চেনা লেখা, অনসূয়ার হাতের লেখা আমি চিনি না? খুব বোকা বানিয়েছে আপনাকে যা হোক!"

তারপর স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তবে একটা কথা ঠিক, এর মধ্যে দুষ্টুমি থাকলেও বিদ্বেষ নেই, অনসূয়া সত্যিই ভালোবাসে সুদেষ্ণাকে।"

এখন পর্যন্ত যেন সেবার কথাটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল না সুমন্ত্রের। সে বলিল, "তুমি সত্যি বলছ, এসব মিথ্যে? অনসূয়ার কিন্তু কি স্বার্থ এতে?"

"একটু কার্যকরী রসিকতা, সহজ ভাষায় প্র্যাক্টিক্যাল জোক। তা শালীশালাজরা অমন একটু ঠাট্টা ক'রে থাকে। ওতে কিছু মনে করতে নেই।"

সুমন্ত্র হাসিয়া বলিল, "শালীই বটে। দাঁড়াও না, ঠাট্টা বার করছি।"

সেবা হাসিয়া বলিল, "বুঝতে পারছি ঠাট্টাটা একটু মারাত্মক রকম হয়েছে আপনার পক্ষে, দু'দিনে মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখ ব'সে গেছে। তবে দোহাই আপনার, মারধোর করবেন না গিয়ে।"

"না, আমি উপস্থিত অহিংসাব্রত নিয়েছি, অহিংসভাবেই কিছু শিক্ষা দেব। আচ্ছা, উঠি তা হ'লে?"

"সেকি? সুসংবাদ দিলুম, আমাকে তো কিছু খাওয়ালেন না, আমার কাছেই না হয় কিছু মিষ্টিমুখ ক'রে যান।"

"আজ না, সেবা, তোমার খাওয়া, আমার খাওয়া সব পাওনা রইল।"

সেবা বলিল, "আমায় কথা তো শেষ হ'লনা সুমন্ত্রদা'। সুদেষ্ণাও ভেবে কূল পাচ্ছে না, আপনিও বোধ হয় ভেবে কূল পাচ্ছেন না,—ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে।"

"সত্যিই কূল পাচ্ছি না, সেবা। বুদ্ধি দিতে পারো?"

"বুদ্ধিতো আপনি দিলেন একটু আগে। দু'জনে দুজনের বড়ো দিকটাকে মেনে নিয়ে ছোটো দিকটাকে অগ্রাহ্য করলেই সন্ধি হ'তে পারে। আপনিও তাকে গ্রামে গিয়ে ঘুঁটে দিতে, গরুর জাবনা দিতে, জেল খাটতে বলবেন না, সেও আপনাকে শহরে চাকরি করতে, সিনেমা দেখাতে, গহনা গড়িয়ে দিতে বলবে না, মিটে গেল ঝগড়া। আপনিও তাকে অন্তঃপুরিকা ক'রে রাখবেন না, সেও আপনাকে ঘরজামাই ক'রে রাখতে চাইবে না। মাঝে মাঝে দেখা হবে, আপনি এসে কবিতা শোনাবেন, সে গিয়ে গান শোনাবে, আপনি তার শহুরের বস্তিতে সেবার কাজে লাগবেন, মাঝে মাঝে সে আপনার গাঁয়ের পাঠশালায় গিয়ে পড়াবে। আপনি তাকে ইতিহাস পড়াবেন আর ছবি আঁকা শেখাবেন, সে আপনাকে দর্শন শেখাবে। দু'জনে দু'জনের কাছে প্রেমপত্র লিখবেন, সেগুলো হবে সাহিত্যের সম্পদ। দু'জনে দু'জনকে আনন্দ দেবেন, প্রেরণা দেবেন। বেশ হবে, না, সুমন্ত্রদা'?"

"আপাততঃ তো তাই মনে হচ্ছে, কার্যক্ষেত্রে কি রকম দাঁড়াবে জানি না। তা, এসব প্ল্যান কবে ঠিক হ'ল?"

"আপনাকে দেখবার আগে থেকেই। ফ্রেম তৈরি ছিল, আপনি শুধু ফিট ক'রে গেছেন ছবি-হিসেবে।"

"জ্যান্তমানুষ সব সময়ে বাঁধা মাপে তৈরী ছবির মতো ফিট করে না তো, সেবা, সেইখানেই ভয়।"

"জ্যান্ত ফ্রেম ও যে, সুমন্ত্রদা'। ছবির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে কমতে বাধা নেই তো তার। ভয় কি?"

সুমন্ত্রের হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, সুদেষ্ণা কি এখনও

সন্দেহ করে তাহাকে? বলিল, "আচ্ছা সেবা, তুমি বলতে পারো, সুদেষ্ণা কি আমাকে অন্য কোনো স্ত্রীলোক সম্বন্ধে—"

সেবা বলিল, "আপনিও যেমন পাগল। প্রথম একদিন আপনার কোন্ এক বন্ধুর স্ত্রীকে দেখে ওর ভালো লাগেনি, তারপর আপনার ভাড়াটে সেই বুড়ো ডাক্তারবাবুর কাছে আপনার প্রশংসা শুনে—"

"কিন্তু তারপরেও তিনি আমাকে ঐ নিয়ে সমালোচনা করেছেন। আমার সামনে বেরোতে আপত্তি জানিয়েছেন।"

"গিরিশবাবুর ভাষায় 'ব্যঙ্গ তুমি বোঝো না সাত্যকি?' সুদেষ্ণাকে বিয়ে করতে হলে একটু সমঝদার এবং ঠাট্টা-প্রুফ হ'তে হবে আপনাকে সুমন্ত্রদা'। আমি শুনেছি সব, শুধু শুধু ক'দিন ধরে নিজেও কষ্ট পেয়েছেন, তাকেও কষ্ট দিয়েছেন। তার জন্য পাত্র খুঁজতে যাওয়াটা তাকে অপমান করা নয়?"

সুমন্ত্র খুবই অপ্রস্তুত বোধ করিতেছিল, ও বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করিল না। মিনিটখানেক নীরব থাকিয়া অন্য কথা পাড়িল। বলিল,

"আচ্ছা সেবা, কাল আমাকে দেখে তাঁর মুখখানা অমন গম্ভীর হ'য়ে গেল কেন?"

"লজ্জায়, ভয়ে।"

"আমাকে ভয়? কি জন্যে?"

"সামান্য একটা অপরাধে। সে নাকি আপনার বাড়িতে একখানা কবিতার খাতা চুরি করতে ঢুকে ধরা পড়েছিল? আপনি নাকি তাকে জেলে না দিয়ে মাথায় ঘোল ঢেলে বিদায় দিয়েছেন।"

"না, না, ঘোল নয়, চৌবাচ্ছার জল।"

"ও একই কথা। সাতমাস সে জল ছাড়া হয় নি তো? সে এখন ঘোলই হয়ে আছে। ও কথা যাক। তার ভয় হয়েছে, আপনি বোধ হয় খুব একটা খারাপ ধারণা করেছেন তার সম্বন্ধে, তাকে আর ক্ষমা করতে পারবেন না। সেই থেকে তার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই।"

সুমন্ত্র হাসিয়া বলিল, "দেখ দিকি কাণ্ড! আমি কখনও তাঁর সম্বন্ধে"—কথাটা শেষ করিলনা সুমন্ত্র। সেবা বলিল,

"কাল পথে দেখা হতে সে আশা করেছিল, আপনি এসে কিছু সান্ত্বনার কথা বলবেন তাকে। আপনি আমায় দেখে হাসলেন, হাত নাড়লেন, তারপর খ্রস করে ট্রামে উঠে চলে গেলেন, তার অস্তিত্বটাকেই যেন অস্বীকার করলেন

প্রকারান্তরে। তাইতে তার আরও মন খারাপ হয়ে গেছে। কেঁদে ফেলত বোধ হয় আর একটু হ'লে। নেহাৎ রাস্তার মধ্যে ব'লেই সামলে নিলে।”

“দেখ দিকিনি! আমি তখন জানি তাঁর অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে। তাই কি করা উচিত ভেবে না পেয়ে”—

“রণে ভঙ্গ দিয়েছিলেন? আমি বুঝেছিলুম খানিকটা আপনার অবস্থাটা, তাকেও বোঝাতে চেষ্টা করেছিলুম। আপনার সেই কবিতাটা শুনিয়েছিলুম;

'শ্রাবণে তব শুনেছি ভেরী, ফাল্গুনে কিঙ্কিনী,
তোমারে আমি চিনি।'

বলেছিলুম কবির ভেরীরব শুনে ভয় পেয়োনা, কবিপ্রিয়া, তার কিঙ্কিনীর শিঞ্জন না শুনলে তাকে সত্যিকারের চেনা হয় না। ভুল বলেছি?”

“না ঠিকই বলেছ। ও সব ছেলেমানুষী কাণ্ড নিয়ে কি রাগ করতে পারে মানুষে?”

“বিশেষ ক'রে যদি ছেলেমানুষটির, মানে বুড়োখুকীটির মুখখানি সুন্দর হয়। বেশ, আমি তা হ'লে নিশ্চিন্ত চিত্তে অগ্রসর হতে পারি? অক্ষর গ'ণে গ'ণে আপনাকে উদ্দেশ ক'রে বিয়ের কবিতাটা শেষ করতে পারি তা হ'লে, সুমন্ত্রদা'?”

সুমন্ত্র বলিল, “তা পারো, তবে এখন কারো কাছে প্রকাশ কোরোনা, দোহাই তোমার। গরিবের ভাগ্য যে-রকম তা'তে না আঁচালে বিশ্বাস নেই।”

সেবা বলিল, “কবিতা শেষ করার জন্য আমার আর কিছু তথ্য চাই আপনার সম্বন্ধে। আপনি ছবি আঁকতে জানেন, কবিতা লিখতে জানেন, জেল খাটতে জানেন; আর কি জানেন, সুমন্ত্রদা'?”

“বাসন মাজতে জানি, কাপড় কাচতে জানি, রাঁধতে জানি, সেবা করতে জানি—”

“বেশ, বেশ, দ্বৈতজীবনে কাজে লাগবে ওগুলো আপনার সঙ্গিনীর। তারপর—আর কি?”

“গান গেয়ে ভিক্ষে করতে জানি, দল বেঁধে পিকেটিং করতে জানি, দাঁড়িয়ে মার খেতে জানি,—”

"ওগুলো খুব উঁচুদরের ব্যাপার, তবে প্রাত্যহিক জীবনে বেশি কাজে লাগবে না। হাসিমুখে বকুনি খেতে পারলেই চলবে আপাততঃ। তারপর?"

"লাঙ্গল দিতে জানি, ধান রুইতে জানি, পটোল তুলতে জানি।"

"পটোল তুলতে আবার জানতে হয় নাকি? সে তো আমিও জানি।"

"কখন তুলতে হয় বল দিকি?"

"কেন, দিন ফুরোলে। যার যখন জীবনের মেয়াদ শেষ হয়, তখনই।"

"উঁহু, হ'লনা। সূর্যোদয়ের আগে। তখন পলতাগাছের পাতাগুলির ফাঁকে পটোলগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। সূর্য উঠলেই ক্রমে পাতারা আড়াল ক'রে দাঁড়ায় পটোলকে, তখন খুঁজে পাওয়া ভারি শক্ত হয়।"

"যাক, একটা নতুন কথা শেখা গেল। সুদেষ্ণাকে শিখিয়ে দেব। তার ভাগ্যে গ্রামে গিয়ে পটোলতোলা আছে শেষ পর্যন্ত। তা উপস্থিত আপনার গন্তব্যস্থল?"

"আপাততঃ অনসূয়াদের বাড়ি, তারপর সুদেষ্ণাদের বাড়ি যাবারও ইচ্ছে আছে।"

"আজ নয়, মাথা ঠাণ্ডা ক'রে কাল বা পরশু যাবেন। যা ঝোড়ো-কাকের মতো চেহারা করেছেন! স্নানাহার ক'রে একটু সামলে নিন, না হ'লে কনে ভড়কে যাবে আপনার। আর এক কথা, বিয়ের চিঠির ব্যাপার নিয়ে কিন্তু অনসূয়াদের সঙ্গে কোনো গোলমাল নয়। সুদেষ্ণারও কানে তুলে কাজ নেই এ-কথা এখন, সে দারুণ লজ্জা পাবে। কথা দিন।"

সুমন্ত্র চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়াছিল। বলিল,

"কথা দিচ্ছি। তুমিও কিন্তু আমি দেখা করার পূর্বে সুদেষ্ণার সঙ্গে আমার সম্বন্ধে আর কোনো আলোচনা করবে না। না ভালো, না মন্দ।"

ভিতরের দরজা খুলিয়া একটি ফুটফুটে পাঁচ ছয় বছরের বালক চোখ মুছিতে মুছিতে ঘরে ঢুকিল। সেবা বলিল,

"নান্তুবাবুর ঘুম ভাঙল এতক্ষণে? এটি আমার ছোটো ভাই, সুমন্ত্রদা'। নান্তু, ইনি আমাদের দাদা হন, প্রণাম করো।"

প্রণাম করিয়া নান্তু প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা দিদি, ঘুমটা কি কোনো ধাতু?"

"না ভাই, ও একটা ক্রিয়া।"

"তাই তো বলছি। মেজদা কাল গচ্ছতি গচ্ছত কি সব মুখস্থ করছিল। আমি বললুম, 'ও সব কি রকম কথা? মানে নেই কেন?' তা'তে বললে,

'এসব ধাতুরূপ, এগুলো শিখলে ক্রিয়ার সব নিয়মকানুন শেখা যায়। তা'হ'লে ক্রিয়াই তো ধাতু ?"

সেবা বলিল, 'ক্রিয়া যে ধাতু, আর খনি থেকে বেরোয় যে ধাতু, সে এক নয়। ওসব পরে একসময় বোঝাব। এই সুমন্ত্রদা' খুব পণ্ডিত লোক, আবার এদিকে ছবি আঁকেন খুব ভালো। বড়ো হ'য়ে তোমাকে আর্টিস্ট হ'তে হবে, নান্তুবাবু।" সুমন্ত্রকে বলিল, "নান্তু খুব সুন্দর মূর্তি গড়তে পারে, সুমন্ত্রদা'। ছবিও আঁকে। আপনার শিষ্য হবে ভবিষ্যতে।"

নান্তু বলিল, "ভগবানের মতন এখনো পারিনা। আচ্ছা ভগবান্ তো মানুষ গড়েন মাটি দিয়ে, হাড়, মাংস চামড়া হয় কি ক'রে ?"

"সুমন্ত্র বলিল, "কঠিন প্রশ্ন। ভেবে ব'লব।"

"ভগবান্‌কে কে গড়েছেন ? ভগবান্ কী দিয়ে গড়া ?"

সুমন্ত্র প্রতি-প্রশ্ন করিল, "তোমার কি মনে হয় ?"

নান্তু গম্ভীর হইয়া বলিল, "ঠিক জানিনা, বোধ হয় পাপ দিয়ে।"

সুমন্ত্র হাসিয়া বলিল, "কি ক'রে বুঝলে ?"

নান্তু বলিল, "না হ'লে মানুষকে এত পাপ দেন কি ক'রে ? কোথায় পান ? যা কিছু করতে যাই—দিদি, মা, বাবা সবাই খালি বলেন, 'কোরো না, কোরো না, পাপ হবে। ভগবান্ পাপ দেবেন'।"

ভগবান্-সৃষ্টির সম্বন্ধে নূতনতম 'থিওরি'টা শুনিয়া সুমন্ত্র কৌতুক বোধ করিল। সেবাকে বলিল,

"ওকে এখন থেকে ভগবান্ সম্বন্ধে ভয় পাইয়ে দিয়ো না তোমরা, সেবা। ওর মধ্যে শক্তি আছে, বিপথে না যায় সেটা।" নান্তুকে বলিল, "তোমার এই থিসিসটার জন্যে ডক্টরেট দেওয়া উচিত তোমাকে। আচ্ছা, আর একদিন তৈরি হ'য়ে আসব তোমার সব মতামত শোনবার জন্যে। তুমি পণ্ডিত এবং আর্টিস্ট—দু'ই হবে।" মৃদুস্বরে স্বগতোক্তি করিল, "আমার মতো পল্লবগ্রাহী বাউণ্ডুলে হওয়াও আশ্চর্য নয়।"

পটুয়াটোলা হইতে পটোলডাঙ্গা পাঁচমিনিটের পথ। সুমন্ত্র সেদিন বাড়ি ফিরিয়া ভালো করিয়া স্নানাহার করিল, তারপর খাতা এবং কিছু কাব্যগ্রন্থ লইয়া বসিল, সারাদিন আর বাড়ি হইতে বাহির হইল না। অনেক পড়িল, অনেক ভাবিল, অনেকগুলি কবিতা লিখিল। রাত্রে খাইতে গেল না, অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না। মাঝে মাঝে ছাদে পায়চারি করে, মাঝে

মাঝে নীচে নামিয়া আসিয়া কবিতা লেখে। পরদিন সকালেই একখানা পোস্টকার্ড লিখিল তাহার গ্রামের বন্ধু নিতাইচন্দ্র বাইনকে।

কল্যাণীয়েষু

নিতাই, তোমাদের ইচ্ছেই পূর্ণ হল। আমি বোধ হয় শীঘ্রই বিয়ে করছি। তোমার সাধ ছিল একটি পোদের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে আমার, আমি রাজি হইনি। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের মেয়ের আর যাই গুণ থাক—বামুন-বদ্যি-কায়েতের মেয়েদের মতো রাঁধতে জানে না, ডালে মরিচ বাটা দেয় বড়ো বেশি, গাই-দোয়ায় (দুধে) জল না দিয়ে খায় না। উপস্থিত যিনি তোমার বৌদিদি হতে যাচ্ছেন তিনি ভালো রাঁধতে জানেন, ভালো গান গাইতেও জানেন, আবার সেবা করতেও পারেন। স্বঘরের মেয়ে। তিনি তাঁর মায়ের এক মেয়ে, তোমাদের ওখানে হয়তো বেশি থাকতে পারবেন না এখন, তার জন্য কিছু মনে কোরোনা। তুমি বলেছিলে, আমি বিয়ে করলে তুমি তোমার বৌদিদির ওজনের বাতাসা কিনে হরির-লুট দেবে। ওজনটা জেনে পরে তোমাকে জানাব। গুরুজনের জন্যে খরচটা গুরুতরই হবে বোধ হয়, তৈরি থেকো। যা ভাবছ তা নয়, জেল-খাটা ভলান্টিয়ার মেয়ে নয়, হাতের জলশুদ্ধ হয়নি এখনও। তবু মেয়ে ভালোই, তোমাদের অশ্রদ্ধা করবে না। তোমার গামছা কিনেছি, গেলে পাবে। সেদিন ইস্কুলের জন্যে কিছু জিনিস তোমাদের হৃদয়-মামার হাতে দিয়েছি, পেয়েছ এবং কাজে লাগাচ্ছ তো? আমার ফিরতে দু'চারদিন দেরি হতে পারে, তোমরা কাজ চালিয়ে যেয়ো। আশ্রমের সকলকে স্নেহাশীর্বাদ দিয়ো ও তুমি জেনো।

শুভার্থী
সুমন্ত্রদা'

চিঠিখানা লেটার-বক্সে ফেলিয়া ফিরিবার সময় বাড়ির দরজাতেই ভদ্রেশ্বরের শোফারের সহিত সাক্ষাৎ। সে মোটর লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, সাহেব এবং মেমসাহেবের কড়া হুকুম, সুমন্ত্রবাবু বাড়ি থাকিলে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে হইবে। একটা দামী চিঠির কাগজে ভদ্রেশ্বরের শ্রীহস্তের নিমন্ত্রণপত্র—সংস্কৃত মালিনীছন্দে:

থাকো যদি ঘরে—আসবে পত্রপাঠ আজ, সুমন্ত্র।
মন যেন মোর বলছে, হওনি নিশ্চয় পগারপার॥
নিজে হাতে আজি রাঁধবেন গিন্নী মোর অন্নপূর্ণা।
এলে করা যাবে চুটিয়ে একটা দিন কাব্যচর্চা॥
হে আমার নব মেঘদূত, দুর্দিনের সত্য-বন্ধু।
হোয়ো না হোয়ো না নির্দয়, আসবে, আসবেই অবশ্যই॥

দুই রাত্রির জাগরণের পর শরীরটা খুব ক্লান্ত লাগিতেছিল সুমন্ত্রের, তবে মনটা হাল্কা হইয়া গিয়াছিল। ভদ্রেশ্বরকে ইহার মধ্যেই সে ক্ষমা করিয়াছে, শুধু ক্ষমা নয়, মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছে। উপস্থিত তাহার সহিত কাব্যচর্চা করিবার মতো মনের অবস্থা না হইলেও সুমন্ত্র তাহাকে নিরাশ করিতে চাহিল না, কাপড় জামা গুছাইয়া লইয়া মোটরে উঠিয়া বসিল। একটা দিন একটু যত্ন, খানিকটা বিশ্রাম পাইলে শরীরটা সুস্থ হইবে। মন্দ কি?

এই ঘটনার পরদিন সন্ধ্যার কিছু পরে চালতাবাগানের বাড়ির ছাদে বসিয়া সুদেষ্ণা একটা গানে সুর দিবার চেষ্টা করিতেছিল। গানটা বে-আইনি-ভাবে-সংগৃহীত,—মেঘালোকে প্রেমাগ্নিসন্তপ্ত কোনো প্রণয়ীপুরুষের প্রলাপোক্তি, তবু কিছুটা ব্যক্তিগত আবেদন থাকায় সুদেষ্ণার সেটিকে একেবারে অপাঠ্য বলিয়া মনে হইতেছিল না। যে খাতাটিতে গানটা পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে গানের তলায় লেখা তারিখ দেখিয়া বোঝা যায়, কয়েকরাত্রি পূর্বের অকাল-বর্ষণের ঘনঘটার মধ্যে সেটি জন্ম লইয়াছে। আজিকার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশের দিকে চাহিয়া সেই বর্ষার গানটা গাওয়ার মধ্যে যে কোনো নৈতিক অসঙ্গতি আছে তাহাও সুদেষ্ণার মনে হয় নাই, কারণ তাহার নিজের মনের মধ্যেও তখন নিরাশার নিবিড় অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া আছে। মাঝে মাঝে কাহার দুইটি ক্ষমাসুন্দর চক্ষের প্রসন্ন দৃষ্টি সেই অন্ধকারে বিদ্যুৎদীপ্তি বিকীর্ণ করিতেছে বটে, তবু তাহার উপর সে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিতেছে না। যতই সময় যাইতেছে ততই আর একটা দৃশ্য,—একজোড়া অভিযোগে-ভরা করুণ চক্ষুর,—একটি সহসা-অন্তর্হিত প্রিয়রূপের স্মৃতি,—পীড়া দিতেছে তাহাকে, ততই নিজের কৃত অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছে সে। একে তো অনসূয়ার উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া নিজের বিবেককে শান্ত করিতে পারিতেছে না। তাহার চেয়ে বিপদ হইয়াছে,—অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা চাহিয়া চোরাই মালটি মালিককে ফেরত দিতে যাইবার মতো নৈতিক মনোবলও সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না সুদেষ্ণা। তাহার সহপাঠিজন-বিশ্রুত সেই অদম্য নৈতিক সাহস,—'মিলিটারী পিসিমার' সাহস,—কোথায় গেল আজ ? সুদেষ্ণা ভাবিয়া দেখিয়াছে, গলদ যে আরও গভীরে ; চৌর্যলব্ধ খাতাটি ফেরত দিবার ইচ্ছাই যে হইতেছে না তাহার ! মনের মধ্যে নবীন সেন মোহনলালের ভঙ্গীতে বলিতেছেন, 'মূর্খ তুমি, মাটি কাটি লভি কোহিনূর ফেলিয়া সে রত্ন, হায়, কে ঘরে ফিরিয়া যায় বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর ?' কাদা তো অনেক মাখিয়াছ, খাতাটা আর ফেরত দেওয়া কেন ?' পরক্ষণেই বিদ্যাসাগর মহাশয় আপত্তি তুলিতেছেন, 'পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ।' এই

অবস্থায় অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সে গানটিকে লইয়া পড়িয়াছে। কোলের উপর খাতাটি খোলা আছে, কিন্তু চাঁদের আলো হাতের লেখা পড়িবার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। ইতোমধ্যে যেটুকু কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল, সেইটুকুই সে গুনগুন করিয়া গাহিতেছে :

'ঝরিছে জল গগনতল ভরিয়া,
আজি, নিঠুরে, থেকোনা দূরে সরিয়া।
ঢাকিল দিশি কাজল মেঘকলাপে,
দিবসে নিশি নামিল কলপ্রলাপে,
তপন শশী আঁধারে মিশি গিয়াছে!
এমন দিনে অদেয় কা'রে কি আছে?
আমারে তুমি পারো না দিতে ভরিয়া?
কাননবীথি আনন করি আনত
কি কানাকানি করিছে, রাণী, জানো তো?
বাদলবায়ে তরুণ তৃণ শিহরে,
মনের বনে যে বিরহিণী বিহরে
তাহারে আমি কি বলি, দিব ভরসা?
গগন ছেয়ে এসেছে ঘন বরষা!'

"লাউডার প্লীজ।"

সুদেষ্ণা চমকাইয়া লাফাইয়া উঠিল। অনসূয়া যে কখন নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়াছে, চুপি চুপি একেবারে তাহার পিছনে দাঁড়াইয়াছে,—সে তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই। অপ্রস্তুত হইয়া বলিল,

"তুই?"

অনসূয়া তাহার পাশে বেতের মোড়াটা টানিয়া লইয়া বসিল। বলিল, "হ্যাঁ, নিতান্তই আমি।



ছাদে

আর কেউ হ'লে নিশ্চয় তুই বেশি খুশি হতিস, না? সত্যি বল?"

"ধ্যেৎ!"

"গানটা দেখছি আধুনিক কোনো থার্ডক্লাস লেখকের লেখা। যেটুকু কানে গেল—কেবল নাকে-কাঁদুনি আর বিরহিণী। পেলি কোথায়?"

সুদেষ্ণা বলিল, "কিছু জানিস না, নেকী? তোর জন্যে মুখটা পুড়ে গেছে আমার।"

অনসূয়া তাড়াতাড়ি তাহার চিবুকে হাত দিয়া মুখখানা তুলিয়া ধরিল, বলিল, "কই, কিছু বোঝা যাচ্ছে নাতো? একটু ঝলসেছে বোধ হয়, চাঁদের আলোতেও কেমন যেন একটু লালচে দেখাচ্ছে, তবে ভয়ের কারণ নেই। এখনও অনেকের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে।"

সুদেষ্ণা মুখ সরাইয়া বলিল,

"ফাজলামি ভালো লাগছে না, ভাই। কাজটা খুব অন্যায় হয়ে গেছে, যাই বল। সেদিন হাতে হাতে ধরা প'ড়ে গেছি। কি ভাবলেন না-জানি ভদ্রলোক! খুব হীন ধারণা হয়ে গেছে নিশ্চয় আমার সম্বন্ধে। তোর জন্যে আমার ইহকাল পরকাল সব গেল।"

অনসূয়া বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল,

"আমার জন্যে? আমি চুরি করতেই না হয় বলেছিলুম, ধরা পড়তে তো আর বলিনি? কথায় বলে 'চুরি বিদ্যে বড়ো বিদ্যে যদি না পড় ধরা'। তা আমার পরামর্শ নিলি না তো এই ক'দিনে? আমি রোজই ভাবছি তুই ফোন করবি। বাড়িতেই ছিলি, না থানায় চালান দিয়েছিল?"

সুদেষ্ণা উত্তর দিল না।

"যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে, গতস্য শোচনা নাস্তি। শুধু শুধু মন খারাপ না ক'রে গান কর। কি রকম সুর দিলি শুনি।"

সুদেষ্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গানটি দ্বিতীয়বার গাহিল, এবার ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে। গান থামিলে অনসূয়া বলিল,

"মন্দ লেখেনাতো লোকটা? খাতাখানা দেখি।"

সুদেষ্ণা খাতাখানা আঁচল চাপা দিল। বলিল,

"আমি, ভাই, পাপপুণ্যের ভাগ কাউকে দিই না। কাঁটা যখন বেছেছি তখন মাছটা আমাকেই খেতে দে।"

অনসূয়া নিজের গালে হাত দিয়া বলিল, "একেবারে মরেছিস? আমাকেও অবিশ্বাস?"

সুদেষ্ণা তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "না ভাই, সত্যি বলছি, অবিশ্বাস নয়। তবে তাঁর মত না নিয়ে আর কাউকে,—তোর মতো প্রাণের বন্ধুকেও দেখাতে খারাপ লাগছে। হাজার হোক একটা মানুষের দুর্বলতার মুহূর্তের সুযোগ নিতে নেই, তার মর্মবেদনার গভীরতম আত্মপ্রকাশ নিয়ে তামাসা ক'রতে যাওয়া অপরাধ। তুই রাগ করিস নি, ভাই, লক্ষীটি। তাঁর মত নিয়ে একদিন তোকে সব শোনাব।"

অনসূয়া বলিল, "তুই শুধু আমাকে তামাসা করতেই দেখলি? এতদিন পরে এই চিনলি তুই আমাকে? তুই আমার দাদার যে দুর্দশা করেছিস, তাতে অন্য কেউ হ'লে তোর মুখ দেখত না, পোড়ারমুখী। আমার লজ্জা নেই তাই আসি তোর কাছে।" অনসূয়া গুম হইয়া রহিল।

সুদেষ্ণা কাতরকণ্ঠে বলিল, "রাগ করিসনি ভাই। কি উচিত, কি অনুচিত,—কিছু বুঝতে পারছি না। এসময়ে তুই শুদ্ধ ত্যাগ করিসনি আমাকে।"

অনসূয়া বলিল, "বেশ, চাই না আমি তোর ঐ পুরোনো বস্তা-পচা মাল। তুই আমাকে যা শোনাতে পারতিস না, তাই আমি শোনাব তোকে আজ, সুমন্ত্রদা'র টাটকা কবিতা। ঐ যা! সুমন্ত্রদা'কে যে দোতলায় বসিয়ে এসেছি, একেবারেই ভুলে গেছি কথাটা। তোর গান শুনলে আর কিছু মনে থাকে না।" পরক্ষণেই উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "সুমন্ত্রদা', ও সুমন্ত্রদা', একবার ওপরে আসুন তো!"

সুদেষ্ণা বলিল, "সুমন্ত্রবাবু যে এসেছেন তাতো বলিস নি আমাকে! এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছিস ভদ্রলোককে? ছি ছি, কি করলি বল দিকি।"

"না, না, মাসিমা কথা কইছিলেন দেখে এসেছি। তিনি আর তোর বিয়ের ঘটকালি করতে পারবেন না, মাসিমাকে খোলাখুলি জবাব দিলেন আজ। অনেকদিন আগেই দেওয়া উচিত ছিল।"

সেদিন সকালে সুমন্ত্রকে টেলিফোনে ডাকিয়াছিল নীতীশ। জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,

"আছিস কেমন ?"

"তোমাদের অত্যাচারের পর যতদূর ভালো থাকা সম্ভব। জোচ্চোর !"

সেবার কাছে কথা দিয়াছিল রাগ করিবেনা, তাই অনুতপ্ত স্বরেই বন্ধুকে গালি দিল সুমন্ত্র, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করিয়াই।

"ধরে ফেলেছিস তা হ'লে ! ভণ্ড ! নিজেকে চিনতে পেরেছিস !"

"পেরেছি অনেকটা মনে হচ্ছে। দর্পহারী মধুসূদন।"

"বেশ, ভারী খুশি হলুম। তাহলে আইবুড়ো-ভাতটা আমাদের বাড়িতেই হ'য়ে যাক আজ। রাগ নেই তো ?"

"হয়েছিল দারুণ, একজনের কথায় ক্রোধ সংবরণ করেছি।"

"তিনি হন কিনি ?"

"তিনি সেবা দেবী, সুদেষ্ণা দেবীর আর একজন বান্ধবী। তিনিই রহস্য ভেদ ক'রে দিলেন তোমাদের।"

"ও, ত্রয়ীর অন্যতমা ? তাঁর সঙ্গেও পরিচয় আছে তা'হ'লে ? একেবারে নারীসঙ্গবর্জিত নিরানন্দ পুরুষ ভাবতুম তোমাকে, তা নও দেখছি ! তা অনসূয়া, প্রিয়ংবদার খবর তো পেলুম। শকুন্তলার সম্বন্ধে কি স্থির হ'ল ? এদিকে আমার গৃহিণী যে ব্যস্থির হয়ে উঠেছেন। আজ বিকেলে সেইজন্যেই জলযোগের নেমন্তন্ন করতে বলেছেন তোমাকে।"

"সেই সময়েই সাক্ষাতে আলোচনা হবে তা'হ'লে।"

নীতীশের বাড়ি বৈকালিক জলযোগ সারিয়া সুমন্ত্র নীতীশের গাড়িতেই চালতাবাগানে আসিয়াছে। নীতীশ গলিতে প্রবেশ করে নাই, তাহাদের মোড়ে নামাইয়া দিয়া গিয়াছে, রামতনু বোস লেনে এক অ্যাটর্নি বন্ধুর বাড়িতে ব্রিজ খেলার আড্ডা সারিয়া ফিরিবার পথে সে তাহাদের উঠাইয়া লইয়া যাইবে। কথা আছে, সেই গাড়িতেই সুমন্ত্রকে ভদ্রেশ্বরের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবে।

ভাগ্যক্রমে বাহিরের দরজা খোলাই ছিল। বাড়িতে ঢুকিয়া সুমন্ত্র একতলায় সুকল্যাণী দেবীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে দোতলার ঘরে আসিয়াছিল, অনসূয়া তেতলার ছাদে উঠিয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে সুকল্যাণী দেবী রান্নাঘরের তদারক করিতে নীচে নামিয়া গেলেন, রাত্রে তাহাকে না খাওয়াইয়া তিনি কিছুতেই

ছাড়িবেন না। সুমন্ত্র ইতোমধ্যে জানাইয়াছে, তাহার মনে হয়, সুদেষ্ণার এখন বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই, তাহার ডাক্তার-বন্ধুর কাছে অন্ততঃ সে এইরূপ আভাস পাইয়াছে। এ-ক্ষেত্রে তাঁহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিলেই ভালো হয়। সুকল্যাণী অগত্যা দায়মুক্ত করিয়াছেন তাহাকে, তবে মাঝে মাঝে দেখা করিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। সেটা তো অনুকূল গলহস্ত, সুমন্ত্রের তাহাতে আপত্তির কারণ ঘটে নাই। তিনি নামিয়া যাইবার পর সুমন্ত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘরখানির চারিদিক দেখিতেছিল, সেই সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রতি মুহূর্তেই সে আশা করিতেছিল সুদেষ্ণা এইবার নামিয়া আসিবে; কিন্তু সে তো আসিল না! তাহার কি সুমন্ত্রের সামনে আসিতে লজ্জা করিতেছে? করাই তো স্বাভাবিক। এখন সুমন্ত্রেরই উচিত নিজে গিয়া তাহাকে লজ্জা হইতে মুক্তি দেওয়া। কিন্তু সে যে নিজ মুখে শেষ বিদায় লইয়া আসিয়াছে, যাইবার পথ কোথায়? ভাবিতে ভাবিতে সে বারান্দা ধরিয়া তেতলার সিঁড়ির কাছাকাছি পৌঁছিয়াছিল, সহসা কানে আসিল সুদেষ্ণা গান গাহিতেছে। সুমন্ত্র উৎকর্ণ হইয়া সিঁড়ির দুই তিন ধাপ উঠিয়া দাঁড়াইল, নিজের রচিত গান সুকণ্ঠী বাঞ্ছিতা নারীর কণ্ঠে কি অপরূপ মিষ্ট শোনায় সে সম্বন্ধে তাহার কোনো ধারণা ছিল না। মিনিট পাঁচেক ধরিয়া তাহার কর্ণে মধুবর্ষণ করিয়া গান থামিল, তাহার পর আরম্ভ হইল দুই সখীর আলোচনা এবং বিবাদ। চারিদিক নিস্তব্ধ, অনেক কথাই কানে আসিতেছিল তাহার, বিশেষ করিয়া শেষ দিকে উভয়েই যখন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল তখন তাহাদের উচ্চারিত প্রত্যেকটি শব্দই স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিল সে। সুদেষ্ণা যখন প্রিয়বান্ধবীকেও তাহার খাতা দেখিতে দিল না তখন তাহার অন্তর কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়া পড়িল। ইচ্ছা হইতেছিল এই মুহূর্তে ছুটিয়া গিয়া তাহার কাছে,—তাহার কাছে কী নিবেদন করিতে চায় সুমন্ত্র? শ্রদ্ধা,—না, প্রেম?

তেতলার সিঁড়িতে সুমন্ত্র যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে, সেই-সময়ে সহসা ছাদ হইতে অনসূয়ার ডাক আসিল, "সুমন্ত্রদা', একবার ওপরে আসুন তো!"

সুমন্ত্র তিনধাপ নামিল, দশ পা পিছাইল, তাহার পর ধীরে সুস্থে ভদ্রভাবে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ছাদের কেন্দ্রস্থলের দিকে অগ্রসর হইল। ফুটফুটে

জ্যোৎস্নায় দুইটি বেতের মোড়ায় দুই বান্ধবী বসিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া দুইজনেই দাঁড়াইয়া উঠিল। সুমন্ত্র কি বলিয়া সুদেষ্ণাকে সম্ভাষণ করিবে সেই চিন্তায় বিব্রত ছিল, কিন্তু গুছাইয়া মিষ্ট সম্ভাষণ করিবার সুযোগ দিল না তাহাকে অনসূয়া। ফস করিয়া চকচকে কি একটা অস্ত্র তাহার বুকের সম্মুখে ধরিয়া বলিল,

"হ্যাণ্ড্‌স্ আপ্। হাত তুলুন।"

সুমন্ত্র অতর্কিত আক্রমণে হতভম্ব হইয়াই হউক অথবা মজা দেখিবার জন্যই হউক দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে তড়িদ্বেগে নিপুণ হস্তে অনসূয়া তাহার পাঞ্জাবীর পাশের দিকের পকেট হইতে একখানা ভাঁজ করা এক্সারসাইজ বুক বাহির করিয়া লইল। তারপর আদেশ দিল,

"এইবার আপনি হাত নামিয়ে ঐ মোড়াটায় ব'সতে পারেন।"

সুমন্ত্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "এটা কি রকম রসিকতা হ'ল?"

অনসূয়া ততক্ষণে অন্য মোড়াটায় বসিয়া খাতাখানি দেখিতেছিল, সুদেষ্ণা তাহার গা ঘেঁসিয়া তাহার পাশেই দাঁড়াইয়াছিল।

অনসূয়ার হাতের সেই চকচকে জিনিসটা একটা ইলেকট্রিক টর্চ মাত্র। তাহারই আলোতে সে একটা কবিতা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, মুখ তুলিয়া বলিল, "আমি রসিকতা করি নি। আপনি অপরাধী, অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ করেছি মাত্র।"

সুমন্ত্র বলিল, "যে আমার খাতা চুরি ক'রলে সে হ'ল সাধু, আর আমি হলুম অপরাধী? বেশ বিচার তো তোমার?"

অনসূয়া বলিল, "একজন চোর, আর একজন ভণ্ড। 'এক ভস্ম, আর ছার, দোষ গুণ দে'ব কা'র?' তবু চুরিডাকাতির মধ্যে একটু সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়, দিনদুপুরে ক'লকাতা শহরে পরের বাড়ি চড়াও হ'য়ে মালিকের চোখের ওপর থেকে কোনো জিনিস চুরি ক'রে আনতে বুকের পাটা লাগে, কিন্তু এ কি? এ তো ভণ্ডামি, কাপুরুষের কাজ। খাতার পাতায় মনের যত পাপ বস্তাবন্দী ক'রে রেখে সাধু সেজে পাত্র দেখে বেড়াতে লজ্জা করে না? মেসের যে ছেলেগুলো সুদেষ্ণার নামে কবিতা লিখে ঢিল বেঁধে ছাদে ছুড়ে ফেলত, তাদের যেটুকু সাহস ছিল, সেটুকু সাহসও নেই আপনার? কিরে, সুদেষ্ণা, সেই গোঁফও'লা ছেলেটা কি লিখেছিল যেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে :

নিত্য আমি তাকিয়ে থাকি জানলা ধ'রে,
রাত্রে আমার ঘুম আসে না তোমার তরে।
সকাল সাঁঝে যাই যে কাজে, যেথায় থাকি—
চক্ষে আমার সদাই জাগে হরিণ-আঁখি।"

সুদেষ্ণা লজ্জায় আরক্ত হইয়া তাহার মুখে হাত চাপা দিল। মৃদুস্বরে বলিল,

"তুই ভারী অসভ্য হচ্ছিস দিন দিন।"

অনসূয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া মোড়াটায় বসাইল। বলিল,

"সুমন্ত্রদা'র শিভ্যালরিতে বাধছে, উনি ব'সবেন না তুই দাঁড়িয়ে থাকতে। ওঁর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা অভ্যেস আছে। তুই বোস, বোকামি করিস নি। নে, এবার খুব সভ্যভাবে একটা কবিতা পড়ছি শোন। জল একই, পাত্র ব'দলেছে শুধু। আপনি একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ান তো সুমন্ত্রদা'।

আমারে করেছ বন্দী কোন্ মন্ত্রে, অয়ি কুহকিনী,
বুঝিয়া বুঝিতে নারি! কোন্ মূল্যে নিলে মোরে কিনি'
জানিয়াও নাহি জানি। স্বেচ্ছাচারী নির্ভীক নির্মম
স্বাধীন দুর্গমচরে নতজানু ক্রীতদাস-সম
তব পাদপীঠতলে দেখিতেছি, জাগিছে বিস্ময়,
মৃত্যুরে যে ডরে নাই, নারীরে সে কেন করে ভয়?
এ কি মোহ? এ কি মুক্তি?—"

সুদেষ্ণা ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "থাক ভাই, আমি শুনতে চাই না।"

অনসূয়া ভ্রূকুঞ্চন করিয়া বলিল, "নাঃ, নিতান্ত প্রেমে না পডলে এত দীর্ঘ কবিতা হজম করা শক্ত। আচ্ছা, তবে এই উপসংহারটা শোন শুধু,—ও বাবা, এ উপসংহারও যে দেখছি এক পৃষ্ঠা—

রিক্ত করি, নিঃস্ব করি, বন্দী করি আনিয়াছ মোরে;
বল এবে কি আদেশ? অপরাধ এ জীবন ভ'রে
কোন্ প্রায়শ্চিত্তে হবে ক্ষয়? কোন্ শাস্তি দিতে সাধ
দেহ মোরে নিজ হাতে। কোন্ অপমান অপবাদ

দিবে দেহ, হে নিদয়ে! শুধু মোর এই নিবেদন,
আমারে জানিতে দিয়ো, মোরে তুমি দাও যে বেদন,
বাজে কি না বাজে ফিরে শতাংশের একাংশ তাহার
তোমার আপন বক্ষে? চূর্ণ করি মোর অহঙ্কার—
তব অহঙ্কার, দেবী, চাহে কিনা সমবেদনায়
অশ্রু-ছলছল চোখে একবারো? যে সন্ধ্যা ঘনায়
বিষাদের অন্ধকারে আমার জীবন পূর্ণ করি—
তার ম্লান রক্তরাগ তোমার অন্তরে, হে সুন্দরী,
ফেলে কিনা ফেলে নিজ ছায়া? সর্ব রোষ, সর্ব ঘৃণা,
সর্ব অশ্রদ্ধার মাঝে আজো সেথা বেঁচে আছে কি না
মোর লাগি একটু মমতা—খুঁজে দেখো। যদি থাকে,
পূর্ণ হ'লে শাস্তিদান তাই দিয়ো দক্ষিণা আমাকে।"

সুদেষ্ণা বলিল, "আমি নীচে যাচ্ছি, অনসূয়া। মা অনেকক্ষণ একা রয়েছে।"

অনসূয়া বলিল, "এইটে একটু শুনে যা, দু'মিনিট। কবিতাটার নাম হচ্ছে 'ভুল'। শোন:

'হয়তো করেছি ভুল। দগ্ধ তপ্ত আমি মরুভূমি
জ্বলিতেছি রাত্রিদিন, তার মাঝে কেন এলে তুমি
বসন্তের আনন্দমঞ্জরী—অনিন্দিত স্মিতাননা—
অকুণ্ঠ নির্ভর ল'য়ে? হায় নারী, তুমি তো জান না
প্রেমে মোর আছে অভিশাপ! বহ্নি আছে স্পর্শে মম।
সে আগুনে জ্ব'লে গেছে যে যেথায় ছিল প্রিয়তম,
যে যেথা বাসিত ভালো। তুমিও জ্বলিয়া যাবে, বালা,
যদি মোরে দয়া করো। সর্বভুক্ এই বহ্নিজ্বালা
হয়তো বা নিভে যেত আহুতি অভাবে অবশেষে
নিঃশেষে দহিয়া মোরে; মাঝ হ'তে তুমি কেন এসে
অমৃতান্ন ল'য়ে করে উপবাসী চক্ষে দিলে দেখা?
আমি দোষী, আমি মহাপাপী। কিন্তু নহি দোষী একা,
তোমারো অদৃষ্ট দোষী; শ্মশানেতে ফুল্ল ফুলহার
যাহার বিধানে লুটে—কিছু দোষ সেই বিধাতার,

এই বুঝে ক্ষমা কোরো মোরে। অন্ধকারে জ্বেলে আলো
যে মোরে দেখা'ল পথ,—যে আমার নয়ন জুড়াল,—
প্রতিদানে তাহারে পুড়াব,—এসেছি এ ভাগ্য ক'রে।
আমি চেয়েছিনু জানি, তুমি কেন সে চাওয়ার পরে
হানিলে না নিষ্ঠুর আঘাত? রাজলক্ষ্মী স্বয়ংবরা
ভাগ্যহীন ভিক্ষুকের প্রার্থনায় কেন দিলে ধরা?
আমি তব যোগ্য নহি, মুক্তকণ্ঠে করি তা স্বীকার।
যে ক্ষতি করেছি তব—জানি তার নাই প্রতিকার,
যে পাপ করেছি তার ক্ষমা নাই। যেদিন দুরাশা
এ বক্ষে জাগিয়াছিল, সেদিন বুঝিনি ভালোবাসা
কা'রে বলে। বুঝি নাই এ সংসারে পাওয়া সব নহে,
সে পাওয়া অযোগ্যজনে দেহে মনে অগ্নিসহ দহে
নিত্য অনুতাপানলে। নাহি জানি কত সাধ আশা
ফাল্গুনপূর্ণিমারাত্রে গ্রাসিল রাহুর ভালোবাসা!'

সুদেষ্ণার চোখে জল আসিয়াছিল, সে চলিয়া যাইতেছিল, অনসূয়া হাত ধরিল। বলিল, "শেষটুকু শুনে যা, আফশোষ করবি না হ'লে। আধকপালে ধ'রে ঘুম হবেনা রাত্রে। অনেকটা বাদ দিয়ে পড়ছি।

'আপন অন্তরে অবগাহি'
যদি দেখ দয়া ছাড়া সেথা আর কোনো কিছু নাহি
অক্ষম আমার তরে, তবে আজো মুক্ত আছে দ্বার;
ফিরে যাও, সুখী হও। আর যদি দেখ সঙ্গে তার
বিন্দুমাত্র জেগে আছে ভালোবাসা,—আলোর আত্মীয়,—
আঁধারে যে দীপ্তি দেয়,—কুরূপে যে করে রমণীয়,—
যদি তার লেশমাত্র মনে হয় আছে মোর তরে
তবে তারে ভাষা দাও। হাসিমুখে প্রসন্ন অন্তরে
এস তবে গৃহে মোর। সরল সবল অনুরাগে
ক্ষমা করি সর্বত্রুটি, বল তুমি, বল "ভালো লাগে"
বল, "ভালোবাসি। জানি তুমি নিঃস্ব, তুমি দীন,
বিগতযৌবন জানি,—তবু আমি তব স্নেহাধীন

তোমারে বরিনু আজি।" ত্রৈলোক্যের রাজসিংহাসনে
কর মোরে অভিষিক্ত, রাজেন্দ্রাণী! পুণ্য-পরশনে,
আমারে পবিত্র কর। সর্ব অকল্যাণ করি দূর
তোমার কঙ্কণশঙ্খ এ কুটিরে বাজুক মধুর,
জ্বলুক তোমার দীপ এ অঙ্গনে। অয়ি সাহসিকা,
ব্যর্থতার ম্লানভালে দাও তুমি দীপ্ত জয়টিকা।
তব মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমে মন্দ-ভাগ্য দগ্ধ হ'য়ে যাক।
অতীত দুঃস্বপ্ন যত অন্ধকার অতীতে মিলাক।"

টর্চ নিভিয়া গেল। অনসূয়া অনুভব করিল তাহার হাতের মধ্যে সুদেষ্ণার হাতটা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। সে কাগজপত্র এবং টর্চ মাটিতে রাখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, সুদেষ্ণার দুই কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, "সুদেষ্ণা!" সুদেষ্ণা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকে মুখ, লুকাইল। মিনিট পাঁচেক নিঃশব্দে কাটিল। তারপর অনসূয়া চুপি চুপি বলিল, "কি রকম করছে বুকের মধ্যে, না?" যে অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দবেদনায় সুদেষ্ণার দেহের প্রতিটি স্নায়ু-শিরা তখন বিকল হইয়া আসিতেছে—তাহার স্বরূপবর্ণনা করিবার শক্তি ছিলনা তাহার। সে শুধু নীরবে মাথা নাড়িল।

অনসূয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ঐ রকমই হয়। চল নীচে যাই। আমার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে পারবি তো?"

সুদেষ্ণা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, পারিবে। দুইজনে চলিয়া যায় দেখিয়া সুমন্ত্রের মুখে কথা ফুটিল। বলিল,

"আমার সম্বন্ধে কি শাস্তির ব্যবস্থাটা হ'ল তা'তো জানতে পারলুম না?"

অনসূয়া বলিল, "প্রথম-অপরাধ বলে আসামীকে এ-যাত্রা সাবধান ক'রে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। সে যেন ভবিষ্যতে আর ভণ্ডামি না করে। 'পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ' বেশীদিন চাপা থাকে না। এই কথাটা যেন মনে রাখে।"

সুমন্ত্র অপ্রস্তুতভাবে নীরবে দণ্ডাদেশটা পরিপাক করিল। পরক্ষণেই আবার প্রশ্ন করিল,

"আমার খাতা-চুরির মামলাটার মীমাংসা হবে না কিছু?"

অনসূয়া বলিল, "অভিযুক্ত আসামীকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে—অতঃপর সে যেন বিদ্যাসাগর মশায়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ পড়বার মতো বিদ্যা অর্জন ক'রে সেখানা মন দিয়ে পড়ে, তা'হ'লে জানতে পারবে 'পরের দ্রব্য না বলিয়া গ্রহণ করিলে চুরি করা হয়।' তার পরবর্তী কর্তব্য হবে—খাতার মালিকের সঙ্গে এমন ব্যবস্থা করা—যাতে তাঁর কোনো দ্রব্যই তার পক্ষে পরের দ্রব্য ব'লে বিবেচিত না হয়। অর্থাৎ ভবিষ্যতে আর যাতে খাতা চুরির দায়ে অভিযুক্ত হতে না হয় সেজন্য তাকে অবিলম্বে খাতার মালিককে আত্মবৎ বিবেচনা করতে, অর্থাৎ আত্মসাৎ করতে, অর্থাৎ সোজা বাংলায় চুরি করতে,—নির্দেশ দেওয়া হ'ল।"

সুদেষ্ণা এতক্ষণে খানিকটা সামলাইয়া উঠিয়াছিল, অনসূয়ার কাঁধে ভর না দিয়াই দাঁড়াইয়াছিল। সে প্রিয়সখীর কোমরে একটি প্রচণ্ড রামচিমটি কাটিল। "উঃ" বলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল অনসূয়া, পরক্ষণেই এক ধাক্কা দিল তাহাকে। সুদেষ্ণা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একতলা হইতে সুকল্যাণী দেবীর ডাক শোনা গেল, "ওরে, তোরা কি আজ আর ছাদ থেকে নামবি না? জামাই এসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, অনসূয়াকে পাঠিয়ে দে।" সকলেই একসঙ্গে নামিয়া আসিল। দোতলার বারান্দায় পৌঁছিয়া ষাট-শক্তির বৈদ্যুতিক আলোটা সুইচ টিপিয়া জ্বালিয়া দিল সুদেষ্ণা। অনসূয়া কোমরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "এখনও জ্বালা করছে। ভালো করলুম কিনা, তার এই পুরস্কার!" সুদেষ্ণা বলিল, "কে তোর পায়ে পড়ে সেধেছিল ভালো করতে?"

অনসূয়া বলিল, "পেটে রাখলেই গুণ, আর মুখে বললেই খুন। তোমরা ডুবে ডুবে জল খেলে দোষ নেই, আমার ঘটি এগিয়ে দেওয়াটাই হয়েছে অপরাধ?"

সুদেষ্ণা হাসিয়া বলিল, "হয়েছেই তো! অসভ্য!" টানা বারান্দায় তিনজনেই পাশাপাশি দাঁড়াইয়া গিয়াছে তখন। সুমন্ত্র মুগ্ধনেত্রে সুদেষ্ণার মুখের হাসি এবং চোখের বিলোল কটাক্ষ একবার দেখিয়া লইল, পরক্ষণেই উহাদের ছাড়াইয়া একতলার সিঁড়ির দিকে আগাইয়া গেল। পিছনে অনসূয়াকে ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিতে শুনিল, "তোর 'ভ্রূবিলাস'টা মাঠে মারা গেল, ভাই। ভুলে যাস কেন—আমি মেয়েমানুষ? তা' যা করেছিস,—

করেছিস, দোহাই বাপু, তোর ঐ কটাক্ষের সঙ্গে 'মিলিয়ন-ডলার স্মাইল'টি আমার কর্তার ওপর প্রয়োগ করিস নি। কেন পথে বসাবি আমাকে ?"

সুদেষ্ণা হাসিয়া বলিল, "পথেঘাটে 'মিলিয়ন ডলার' খরচ করার মতো বড়োলোক আমি নই।"

সুমন্ত্র চকিতে একবার ফিরিয়া দেখিল। আবার সেই দুষ্টামি-মেশানো অপরূপ হাসি। হঁা, 'মিলিয়ন-ডলার স্মাইল'ই বটে। ইম্পিয়োর করিয়া রাখিবার মতো হাসি। তবে টাকা দিয়া দর কষিতে গেলে ইহাকে ছোটো করা হয়, চিত্রতারকাদের সহিত তুলনা আসিয়া পড়ে। প্রণয়ীর মুগ্ধ মন বলিল, "সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।"

সুমন্ত্রের ইচ্ছা ছিল একপলকের জন্য চক্ষু দুইটিকে সার্থক করিয়া ফিরাইয়া লইবে, কিন্তু অবাধ্য চক্ষু দুইটি তাহার ফিরিতে একটু বিলম্ব করিয়া ফেলায় দুই বান্ধবীর সঙ্গে চোখোচোখি হইয়া গেল। অনসূয়া বলিল,

"বেশ তো নেমে যাচ্ছিলেন, দাঁড়ালেন কেন আবার ?"

সুমন্ত্রের চট করিয়া কৈফিয়ত যোগাইয়া গেল, চারিদিকে চাহিয়া বলিল,

"সিঁড়ির আলোর সুইচটা খুঁজে পাচ্ছি না।"

অনসূয়া বলিল, "সুইচ খুঁজে পাচ্ছেন না, না, আর কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না সুমন্ত্রদা' ?"

সুমন্ত্র উত্তর দিল না, অন্ধকারেই সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। শেষধাপে পৌছিবার পুর্বেই আলো জ্বলিল বটে, কিন্তু সে আর ফিরিয়া চাহিল না। সোজা বৈঠকখানায় নীতীশের কাছে গিয়া হাজির হইল।

নীতীশ একখানা পুরাতন মাসিকপত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, বলিল, "এখনই এই, বিয়ে হ'লে তো আর অন্দর থেকে বেরোবি না বল ? ঝাড়া সতেরো মিনিট ব'সে আছি হুজুরের দর্শনপ্রত্যাশায়।"

"হুজুরের দর্শন, না আরো কিছু। হুজুরাণীর"—

সুকল্যাণী দেবী শ্বেত-পাথরের থালায় জলখাবার সাজাইয়া লইয়া প্রবেশ করিলেন। নীতীশও খাইবে না, তিনিও ছাড়িবেন না, শেষ পর্যন্ত একটি রসগোল্লায় রফা হইল। সুকল্যাণী হঠাৎ বলিলেন,

"ঐ যাঃ, জল আনতে ভুলে গেছি। অ উদাসী,"—

সুমন্ত্র বলিল, "আমি এনে দিচ্ছি, মাসিমা।" সে দ্রুতপদে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

নীতীশ বলিল, "বড়ো ভালো ছেলে, মাসিমা। ক্লাসে ফার্স্ট সেকেণ্ড হ'ত আগাগোড়া; কিছু চেষ্টা করলে না—তাই এই অবস্থা। আমাদের মতো স্বার্থপর হ'লে ও কোথায় উঠে যেত এতদিন। চিরদিন পরের কথাই ভাবলে শুধু।"

সুকল্যাণী বলিলেন, "সংসারী হ'তে হ'লে নিজের উন্নতির চেষ্টা করাও তো একটু দরকার, বাবা।"

নীতীশ বলিল, "তা সত্যি। তবে ও যাকে ভালোবাসবে তার জন্যে সব স্বীকার ক'রে নেবে মনে হয়। কিন্তু এ-কথাও বলব, মাসিমা, আপনাদেরও উচিত হবে না ওকে রোজগার করতে চাপ দেওয়া। ওকে ওর পথে চলতে দেন যদি—তা'হ'লে কোন ক্ষতি হবে না আপনাদের। শুধু পয়সাতে সুখ নেই, মাসিমা। আপনার মেয়ে সুখী হবে এ আমি জোর ক'রে ব'লতে পারি।"

সুকল্যাণী বলিলেন, "তাই বলো, বাবা, তাই বলো। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। এদিকে এক পাগলী, ওদিকে এক পাগল! যতক্ষণ না চার হাত এক হচ্ছে ততক্ষণ যেন ভরসা পাচ্ছি না।"

সুমন্ত্র শ্বেত-পাথরের গ্লাসে জল লইয়া আসিল। নীতীশের পীতাবশিষ্ট জল এবং জলখাবারের থালা তুলিয়া লইয়া সুকল্যাণী দেবী চলিয়া গেলে সুমন্ত্র একটা চেয়ার টানিয়া বন্ধুর পাশে বসিল।

নীতীশ বলিল, "কতদূর এগোল?"

সুমন্ত্র বলিল, "যত এগোচ্ছে, ততই দ'মে যাচ্ছি, ভাই। শেষটা কি বড়োলোকের ঘরজামাই হ'য়ে কাটবে বাকি জীবনটা? অথচ সুদেষ্ণাকে না পেলেও যে চলবে না—তোমাদের কল্যাণে সেটুকু বেশ বুঝতে পেরেছি। কি করি?"

নীতীশ বলিল, "মধ্যপথ, মধ্যপথ, ইংরিজি-বাংলায় যাকে বলে 'সোনার মধ্যপথ'। কবিগুরু এ-বিষয়ে কি-একটা উপদেশ দিয়েছিলেন না তোদের একদিন?"

"বলেছিলেন, গ্রামকে নগরকে মেলাতে হবে। থাকবে গ্রামে কিন্তু শহরের ভালো যা কিছু পাবে সংগ্রহ ক'রে আনবে, গ্রামের ভালো যা কিছু পাবে তার সঙ্গে"—

"দি আইডিয়া! মহাজনবাক্য মেনে চল, সুমন্ত্র। শহরের যে ভালো জিনিসটি পাচ্ছিস আপাততঃ নিয়ে নে। গ্রামেই থাকিস, এঁরা আপত্তি

করবেন না। তবে এঁদের মেয়েকে উপস্থিত বেশি গ্রামে টানিসনি। তারপর শাশুড়ী চোখ বুজলে, যা প্রাণ চায় করিস। ইস্কুল, হাসপাতাল, যা খুশি। সুদেষ্ণা দেবীর প্ল্যান যতদূর শুনেছি তা'তে তোদের গ্রামের হাসপাতালে নার্সের খরচ লাগবে না।"

"সে কথা শুনেছি আমিও সেবার কাছে। মন তৈরি আছে জানি, কিন্তু দেহে কি সহ্য হবে? কুঁড়ে ঘরের ফুটো চালে যখন জল পড়বে, সারারাত ইঁদুরে মাথার ওপর বাঁশ কাটবে ক'ট ক'ট ক'রে বা সাপ লাফিয়ে পড়বে বিছানায়, জলের কলসীতে ব্যাং ডুবে থাকবে, পথ চলতে কাদায় পা পুঁতে যাবে, পুকুরে স্নান করতে হ'বে সহস্র চক্ষের সামনে, —তখন?

"শহরের স্বাচ্ছন্দ্য গ্রামে যদি না নিয়ে যেতে পারলি তবে কী দেশের কাজ করলি এতদিন? গরিবের দুঃখের ভাগ নেওয়ায় ভাবালুতার পরিচয় থাকতে পারে, গরিবকে মানুষের মতো বাঁচতে শেখানোতে, তার জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে সাচ্ছল্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সুখ আনতে,— পৌরুষের পরিচয় দিতে হয়। তোর কাছে অন্ততঃ"—

"চেষ্টা তো করছি, পারছি কই? একহাত এগোই তো, দশ হাত পেছোই। তার ওপরে পেছনে লেগে আছে তোদের বিদেশী সরকার।"

নীতীশ বুদ্ধিমান্ লোক, সুমন্ত্রকে আর ওদিকে অগ্রসর হইতে দিল না, বলিল, "ক'লকাতার বস্তির যে সব ঘরে সুদেষ্ণাদেবীর যাতায়াত আছে, সুমন্ত্র, সে তোদের গ্রামের গরিবের কুঁড়েঘরের তুলনায় নরককুণ্ড। গ্রামে পাঁক থাকতে পারে, কিন্তু তার পঙ্কিলতা বস্তির মতো এমন বিষাক্ত নয়।"

"সে কথা ঠিক, পাশেই সাততলা বাড়ি নেই তার।"

নীতীশ বলিল, "গ্রামে গিয়ে আজই গোবর লেপতে ব'ললে অত্যাচার হবে বেচারীর ওপর। হয়তো 'না' বলবে না তোর মুখ চেয়ে, তবু তোর উচিত হবে এখন কিছুদিন একটু বিবেচনা ক'রে চলা। শনৈঃ পর্বত-লঙ্ঘনং। একটানে গন্ধমাদন ওপড়ানোর মধ্যে বীরত্ব থাকতে পারে, মনুষ্যোচিত বুদ্ধির পরিচয় নেই। ছাখ, তুই যা পাচ্ছিস, এ অনেক তপস্যা ক'রে পায় না লোকে। কী নয় উনি? শিল্পীর আদর্শ, কবির মানসসুন্দরী, প্রেমময়ী কর্তব্যপরায়ণা গৃহলক্ষ্মী।"

"তাঁর দিক থেকে কিছু ব'লবার নেই। তিনি ধনী, আমি দরিদ্র, আমার জীবনের আদর্শ, তাঁর জীবনের আদর্শ এক নয়।"

"সামঞ্জস্য ক'রে নিতে হবে। সত্যিই যদি তোরা দু'জনে দু'জনকে ভালোবেসে থাকিস, তা'হ'লে সেই ভালোবাসাই তোদের পথ দেখিয়ে দেবে। তবে এটা জানিস, পারলে বড়োলোকের মেয়েই তোর আদর্শের মর্যাদা রাখতে পারবে, গরিবের মেয়ে না-ও পারতে পারে। সীতাদেবী রাজার মেয়ে ছিলেন ব'লেই অত সহজে বনে যেতে পেরেছিলেন স্বামীর সঙ্গে, ঘুঁটেকুড়ুনি হঠাৎ রাণী হ'লে পারত না বোধ হয়। দয়া ক'রে কোনো গরীবের মেয়েকে বিয়ে করলে তোর আদর্শ থাকবে না, সুমন্ত্র। তার তাড়ায় তুই নিজে মোটর করতে না পারিস—সে বৌ তোর বড়োলোক বন্ধুর মোটরে চেপে ব'সলে আর নামতে চাইবে না সহজে।"

অনসূয়া জলযোগ সারিয়া আসিয়া পৌঁছিল। বলিল,

"চল, সুমন্ত্রদা'র আজ আর আশা নেই, ও এখানেই থাকবে দেখছি।" নীতীশ বিস্মিত হইয়া বলিল,

"সে কিরে? অবাক করলি যে? আজ থেকেই রাত্রিবাস?"

অনসূয়া বলিল, "চোরের রাত্রিবাসই লাভ।"

নীতীশ বলিল, "তোমার বান্ধবী তো ওর খাতা চুরি করেছিলেন, ও আবার কি চুরি করলে?"

"তার চেয়ে বড়ো জিনিস, একটি রমনীর মন। হ্যাঁ, সুমন্ত্রদা', আপনি নাকি গৃহসন্ধানে বেরিয়ে ভুল ক'রে এবাড়িতে ঢুকে পড়েছিলেন? সুদেষ্ণার কাছে শুনলুম গল্পটা। এমন ভুলও করে মানুষ?"

অনসূয়া সংক্ষেপে স্বামীকে বলিল ঘটনাটা। নীতীশ বলিল,

"যাক, তোর গৃহসন্ধান সার্থক হয়েছে, সুমন্ত্র। আর গৃহহীনের মতো বেড়াসনি।"

দুইজনে হাসিতে হাসিতে গিয়া মোটরে উঠিল।

নীতীশদের বিদায় দিয়া সুমন্ত্র ভিতরে আসিয়া দেখিল সুকল্যাণী দেবী রান্নাঘরে কুটনা কুটিতেছেন, সুদেষ্ণা উনানে কড়া চড়াইয়া কি একটা তরকারী রাঁধিতেছে, আর বলভদ্র বারান্দায় ময়দা মাখিতেছে। সমারোহ ব্যাপার! সুমন্ত্র দরজার কাছে দাঁড়াইতেই সুদেষ্ণা বলিল,

"ডালনাটা হয়ে গেছে, মা। এবার আমি যাই ? সন্ধ্যে থেকে বই ছোঁয়া হয়নি একবারও।"

সুমন্ত্রের পাশ দিয়া সে বাহির হইয়া গেল, সুমন্ত্র সরিয়া দাঁড়াইয়া পথ দিল তাহাকে। সুকল্যাণী বলিলেন,

"তুমি ততক্ষণ বাইরের ঘরে একটু বোসো গে না, বাবা ? বেশি দেরি হবে না।"

সুমন্ত্র বলিল, "এখানে বসলে কি আপনি রাগ করবেন ?"

"কথা শোনো ছেলের ! মেয়েটা গেল পড়তে, ভাবছিলুম আমার সঙ্গে কি গল্পই বা তুমি করবে ? তাই বাইরে বসতে বলছিলুম। বেশ তো, ঐখানেই বোসো না। ঠাকুর, দাদাবাবুকে একটা পিঁড়ে দাওতো।"

সুমন্ত্র নিজেই পিঁড়া পাতিয়া বসিল। কুটনা সারিয়া রান্না চড়াইলেন সুকল্যাণী, সঙ্গে সঙ্গে অতীতের কথা, সুমন্ত্রের মা'র কথা, নিজের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বলিতে লাগিলেন। সুদেষ্ণার এমন জায়গায় বিবাহ দিবেন যেখান হইতে সে স্বাধীনভাবে তাঁহার কাছে আসা যাওয়া করিতে পারিবে, তিনি নিজেও অসঙ্কোচে যখন খুশি তাহাকে দেখিয়া আসিতে পারিবেন। রান্নার শেষে সুমন্ত্রকে খাইতে বসাইয়াও তিনি সেই সব কথাই একতরফা বলিয়া চলিলেন। ভক্ত শ্রোতাটি সব কথাতেই সায় দিয়া গেল ; কিছু বা শুনিল, কিছু বা শুনিল না। সুকল্যাণী হঠাৎ বলিলেন,

"আচ্ছা, সুমন্ত্র, তোমাদের ক'লকাতার বাড়িটাতে মাঝে মাঝে ঝাঁটপাট পড়ে তো ?"

"তা পড়ে মাসি মা, যখনই আসি তখনই একবার ঝাঁট পড়ে।"

"আমরা একবার গিয়ে বাড়িটা গুছিয়ে দিয়ে আসলে আপত্তি আছে তোমার ?"

"সে সৌভাগ্য কি আমার হ'বে, মাসিমা ? কবে যাবেন বলুন ? গাড়ি নিয়ে আসব।"

"আর তোমার গ্রামের আস্তানাটাও একবার দেখে আসতে ইচ্ছে করে। সে তো দুর্গম পথ ?"

"হাঁ, মাসিমা, সে মোটর লঞ্চে যেতে আপনার কষ্ট হবে। তবে একটানা নৌকোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে—যেতে চান তো। রাত্রে উঠলে ভোরে পৌছে যাবেন।"

"সাহস হচ্ছে না, বাবা। এখন থাক।"

সুমন্ত্র খাওয়া সারিয়া উঠিতেই দোতলার বড়ো ঘড়িটাতে ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিল। সুকল্যাণী দেবী বলিলেন,

"এতরাত্রে আর তোমার বালিগঞ্জে গিয়ে কাজ নেই, বাবা। ওবাড়িতে তো বিছানা করাই আছে, আমি উদাসীকে দিয়ে একটা মশারি খাটিয়ে দেওয়াচ্ছি। হ'য়ে গেলেই তোমাকে খবর দেব। তুমি ততক্ষণ ওপরের ঘরে পাখাটা খুলে একটু বিশ্রাম করোগে।"

সুমন্ত্র চলিয়া আসিতেছিল, সুকল্যাণী হঠাৎ বলিলেন,

"হ্যাঁ বাবা, সুদেষ্ণা যে গানটা গাইছিল সন্ধ্যাবেলা,—সেটা নাকি তোমার লেখা? বেশ হাত তো তোমার!"

কি সর্বনাশ! ইঁহার কানেও গিয়াছে গান? সুমন্ত্র প্রশ্নটা এড়াইবার চেষ্টায় বলিল, "কে বললে আপনাকে?"

"কেন, ঐ অনসূয়া। ও খেতে খেতে বলছিল, তুমি নাকি নাম-করা কবি? আমিও তোমার লেখা পড়েছি মনে হচ্ছে মাঝে মাঝে। অনসূয়া বলছিল, তুমি আজ ওদের অনেক কবিতা শুনিয়েছ ভালো ভালো। আমাকে দু' একটা শোনাবে না, বাবা? মুখ্যু মানুষ ব'লে কি একটুও বুঝতে পারব না? বাংলা তো?"

নাঃ, যত গণ্ডগোল বাধাইতে পারে ঐ মেয়েটা! সুমন্ত্র ক্রোধ এবং বিরক্তি গোপন করিয়া হাসিয়া বলিল, "ওসব ছেলেমানুষী ব্যাপার, আপনি কি শুনবেন? আচ্ছা আপনি খেয়ে আসুন, আমি দেখে রাখছি ততক্ষণ।"

সুমন্ত্র দোতালায় উঠিতেই সুদেষ্ণা বই রাখিয়া উঠিল। সুমন্ত্র হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "আর রাগ নেই?" সুদেষ্ণাও হাসিল, বলিল, "রাজর্ষিতে রবীন্দ্রনাথ একজায়গায় লিখেছেন, 'দোষ করিয়া শাস্তি গ্রহণ করা সহজ, মার্জনাভার বহন করা কঠিন'।"

সুমন্ত্র বলিল, "কে কা'কে মার্জনা করে, সুদেষ্ণা? স্বর্গ পৃথিবীকে মার্জনা করতে পারে উর্ধ্বে ব'সে, পৃথিবীর অধিকার কি স্বর্গকে বিচার করবার? তবে একটা কথা মনে পড়েছে। ছেলেবেলায় তোমাদের বাড়িতে পেয়ারা চুরি ক'রতে গিয়ে একবার আমি ধরা পড়েছিলুম। তখন অবশ্য তুমি জন্মাওনি। সেই অপরাধটার প্রতিবিধান হয়নি সেদিন। তুমি খাতা

চুরি ক'রে আমাকে মুক্তি দিয়েছ সেই অপরাধ থেকে। শোধবোধ হ'য়ে গেল, কেমন ?"

"বেশ" বলিয়া সুদেষ্ণা চলিয়া যাইতেছিল, সুমন্ত্র বলিল, "তোমার বোধ হয় এখনও ভাত বাড়া হয়নি। একটু ব'সবে না ?"

সুদেষ্ণা বসিল। সুমন্ত্রও কাছেই একটা চেয়ার টানিয়া বসিল। বলিল, "ব'লবার কথা অনেক ছিল, কোথা থেকে আরম্ভ ক'রব ভেবে পাচ্ছি না।"

সুমন্ত্র যে এবার কী বলিবে সুদেষ্ণার তাহা অজ্ঞাত ছিল না। যুগপৎ লোভ এবং লজ্জা, আনন্দ এবং ভয়ের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল তাহার অন্তরে, সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "গ্রামের কথা দিয়েই আরম্ভ করুন। আমরা শহরের গলির এই অন্ধকূপের মধ্যে বাস করি, যারা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দিগন্ত দেখতে পায়—মনে হয় তারা কি সৌভাগ্যবান্। দূরের দৃষ্টি আমাদের রুদ্ধ—মানুষের হাতে-গড়া ইঁটপাথরের স্তূপে। আকাশ দেখি না, পৃথিবী দেখিনি।"

সুমন্ত্র বলিল, "মানুষের সৃষ্টি বিধাতার সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করেছে, তাকে সহজে পাচ্ছ ব'লে অবজ্ঞা কোরো না, সুদেষ্ণা। তুমি যাদের সৌভাগ্যকে ঈর্ষা ক'রছ, তাদের দিগন্ত একটাই। হয় তিনক্রোশ দূরের ধানক্ষেতে, নয় পাঁচ ক্রোশ দূরের পাহাড়ে বা নদীতে তার শেষ। সে ভোরের আলোর সঙ্গে ফুটে ওঠে, সন্ধ্যার বর্ণবৈচিত্র্যের মধ্যে মিলিয়ে যায়, একটু এদিক ওদিক হ'লেও নিত্য একই রূপ, একই রস তার। কিন্তু তোমার দিগন্ত তো একটা নয়, সুদেষ্ণা, তোমার দৃষ্টি তো পাঁচ দশ ক্রোশে বাধা পাবার নয়! বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, কালিদাস থেকে আরম্ভ ক'রে শেক্‌সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত দেশ-বিদেশের মহাকবিরা পৃথিবীর দেশে দেশে তোমার জন্যে অতীত বর্তমানের নব নব দিগন্ত খুলে দিয়েছেন, নিত্য নব রসের ভোজে,—মুক্তির আনন্দে ডাক দিয়ে গেছেন। এই ঘরে ব'সে তুমি এই মুহূর্তে উজ্জয়িনীর মহাকাল-মন্দিরের পূজারতি দেখতে পারো, ট্রয়ের পাঁচিলের ধারে ক্রেসিডার সঙ্গিনী হ'তে পারো। যারা তা পারে না, তাদের দূর থেকে ঈর্ষা কোরো না, সুদেষ্ণা, তোমার আনন্দের ক্ষেত্রে তাদের ডেকে নাও। পূর্বসূরিগণ প্রকৃতির রূপের যে মণিরত্নকে যুগে যুগে বজ্রসমুৎকীর্ণ ক'রে গেছেন, তার অপরূপ ঔজ্জ্বল্যের মর্মের মধ্যে আমরা সূতোর মতোই সহজে প্রবেশ করি ব'লে বুঝতে পারি না তার মূল্য। নিজের কথা ব'লতে পারি, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতিবর্ণনা

না পড়লে চোখে দেখেও তার মাধুর্য বুঝতুম না সবটা। 'বিদ্যুৎবিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চ'লে যায় উৎকণ্ঠিত পাখী' কিংবা 'অন্ধকার হ'তে অন্ধকারে চলি গেল দিন', আমি যে চোখে দেখি—আমার পাশে ব'সে আমার গ্রামের বন্ধুরা সে চোখে দেখে না। 'রজনীর তারা উঠেছে আকাশ ছেয়ে' আমার মনে যে ভাব জাগায়, 'নক্ষত্রখচিত দীপ্ত নীলকান্ত সুপ্তিসিংহাসনে' যে রাত্রিকে আমি দেখি"—

সুদেষ্ণা বলিল, "আপনি তা'হ'লে মানুষের সৃষ্টিকেই বেশি দাম দিতে চান ঈশ্বরের সৃষ্টির চেয়ে?"

সুমন্ত্র বলিল, "না। আমি বলি ঈশ্বরের সৃষ্টিকে তার পরিপূর্ণ মূল্য দিতে হ'লে মানুষের সৃষ্টির সাহায্য প্রয়োজন হয়। দেখতেও হবে, পড়তেও হবে। কবিগুরুর ভাষায়, 'গ্রামে থাকবে, কিন্তু গ্রাম্য হবে না'। কবি নিজে এ সত্য মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন, তাই তাঁর শান্তিনিকেতন গ্রামও নয়, নগরও নয়। সেখানে প্রকৃতির ঔদার্যের সঙ্গে মানুষের মনের মাধুর্য মিশেছে, অতীতের ঐশ্বর্যের সঙ্গে বর্তমানের উপার্জনের যোগসাধন হয়েছে। ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে যেদিন এই আদর্শ স্থাপন করবার চেষ্টা সফল হবে, সেদিন সার্থক হবে তাঁর স্বপ্ন।"

সুদেষ্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "সে কি সম্ভব?"

"অসম্ভব ব'লে কিছু নেই জগতে। কাল যা অসম্ভব মনে হ'ত আজ তার অনেক কিছুই সম্ভব হয়েছে। এর জন্য চেষ্টা চ'লছে দেশে দেশে, অনেক দেশ অনেক এগিয়ে গেছে, 'ইংরেজের বাণিজ্য-তরণীর পিছনে বাঁধা' না থাকলে আমাদের দেশও হয়তো এতদিনে যেত। তবে এ একার কাজ নয়, এক দিনের কাজ নয়। ধৈর্য নিয়ে, মোহমুক্ত মন নিয়ে কাজ করতে হবে—অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভরসায়। ঘরে বাইরে শত্রু তৈরি করতে হবে। রামায়ণ গান শুনে যে তোমাকে ভক্তি করবে, দশ বছরের মেয়ের বিয়েতে বাধা দিতে গেলে, ঠাকুরপুকুরের পঙ্কোদ্ধার করতে অথবা তার জলে ক্লোরিন ঢালতে গেলে সেই তোমায় নাস্তিক ব'লে বর্জন করবে। আঘাত পেয়ে, অপমান পেয়ে ভালোবাসতে হবে।"

গম্ভীর মুখে কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ সুমন্ত্র হাসিয়া ফেলিল, বলিল,

"আমি অবশ্য পারছি না আপাততঃ। রক্তের জোর যত কমছে, মনের দৃঢ়তাও সেই সঙ্গে কমে আসছে। রঙ্গালয়ে হাততালি থেমে গেছে,

পাদপ্রদীপের আলো নিভে গেছে, প্রেক্ষাগৃহ খালি হয়ে গেছে। এখন অন্ধকারে সঙ্গীর প্রয়োজন বড়ো বেশি ক'রে অনুভব করছি। ক'দিন ধরে ভাবছি এই নিয়ে।"

সুদেষ্ণার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা সহসা যেন উদ্দাম হইয়া উঠিল, তথাপি যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া সে সুমন্ত্রের দিকে একবার চাহিল। তারপর নিজের হাতের চুড়ির গোছাটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে যেন অনাসক্তভাবে নতমুখে প্রশ্ন করিল,

"কি ভাবছেন ?"

"ভাবছি বিয়ে ক'রব।"

সুদেষ্ণা চোখ তুলিল। বলিল, "হঠাৎ এ দুর্বুদ্ধি মাথায় এল কবে থেকে ? শুনেছিলুম দরিদ্রের পক্ষে বিয়ে করা অপরাধ। তা আপনার পাপপুণ্য আপনি বুঝবেন, শুভদিনে নেমন্তন্ন করতে ভুলবেন না কিন্তু।"

কণ্ঠস্বরে আবদারের মধু ঝরিয়া পড়িল তাহার।

সুমন্ত্র কুণ্ঠিতস্বরে বলিল, "নিমন্ত্রণ জানাতেই এসেছি আজ, সুদেষ্ণা। বাইরে মিষ্টান্নের ভোজে নয়, অন্তরের অমৃতান্নের ভোজে। গ্রহণ করবে তো ?"

সুদেষ্ণা উত্তর দিল না, নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। সুমন্ত্র অনেকক্ষণ অপলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার লজ্জারুণ মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "নিজের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছি, পারলুম না। আমার মন বড়ো দুর্বল। অঙ্গার শতধৌত হ'লেও তার মলিনত্ব যায় না। সেই সত্যকে স্বীকার করতে তৈরি হ'য়ে এসেছি আজ।"

সুদেষ্ণা মুখ তুলিল। বলিল, "কবীর বলেছেন অন্তরে আগুন প্রবেশ করলে কয়লার ময়লা যায়।"

সুমন্ত্র বলিল, "সেটা তার ক্ষণিকের ঐশ্বর্য। সে হোমাগ্নির স্পর্শ আমারও জীবনে এসেছিল একদিন, কয়লার সে অবস্থাটার সঙ্গে পরিচয় আছে আমার। সত্যিই তার ময়লা যায় সে সময়ে, যত অল্পক্ষণের জন্যেই হোক—হীরেকে ছাড়িয়ে যায় তার দ্যুতি। নিজে জ্ব'লতে, অন্যকে জ্বালাতে দ্বিধা থাকেনা তার। মুহূর্তের মহিমায় সে তখন রাজরাজেশ্বর। তারপর একদিন সব ফুরিয়ে যায়, বাকি থাকে কেবল ছাই। বহ্নিবাহন হবার পূর্বে কয়লার যেটুকু মূল্য ছিল—সেটুকুও আর থাকে না তখন। আমার আজ সেই অবস্থা।"

সুদেষ্ণা চোখ নামাইল, বাঁ-হাতের আঙুলে শাড়ীর আঁচলের খুঁটটা দুইবার জড়াইল, দুইবার খুলিল। তারপর নতমুখেই বলিল,

"আপনার কি বিশ্বাস, সেই ছাই উপহার পেলে কেউ খুশি হবে? আপনি হতেন?"

সুমন্ত্র বলিল, "হয়তো হতুম, হয়তো হতুমনা। তবে এইটুকু বিশ্বাস রাখি, যাকে দিতে চাই, ছাইকে কাজে লাগাবার উপায় সে জানে। সে দেবী না হ'তে পারে, সামান্যা মানবীও নয় সে। যে দেবতা অন্যকে বাঁচাবার জন্য সৃষ্টিসিন্ধুমন্থনের বিষ কণ্ঠে ধারণ করেন, শ্মশানভস্ম যাঁর অঙ্গের ভূষণ— সে-মেয়েটি বাইরে ঢাকাই শাড়ী প'রে বেড়ালেও অন্তরে তাঁরই অনুচরী। তাই আমার এই দুঃসাহস।"

সুদেষ্ণা আরক্তমুখে নতনেত্রে বসিয়া রহিল, সুমন্ত্রও নীরবে চাহিয়া রহিল, আর কিছু বলিল না। নীচে হইতে সুকল্যাণী দেবীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল,

"ভাত যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল, সুদেষ্ণা, আর কত দেরি করবি?"

"আমি যাই, মা ডাকছেন" বলিয়া সুদেষ্ণা চলিয়া যাইতেছিল, সুমন্ত্র বলিল, "খাতাটা কিন্তু একবার দিয়ে যেতে হবে।"

সুদেষ্ণা ফিরিয়া আসিয়া ড্রয়ার খুলিয়া দুইখানি খাতাই বাহির করিয়া দিল। সুমন্ত্র কৈফিয়তের সুরে বলিল, "মাসিমা কবিতা শুনতে চেয়েছেন। অনসূয়া তাঁকে ব'লে গেছে, আমি নাকি তোমাদের আজ অনেক কবিতা শুনিয়েছি"—

সুদেষ্ণা গালে হাত দিয়া বলিল, "আচ্ছা মেয়ে বাবা! কি করবেন এখন?"

"খুব নির্দোষগোছের একটা কিছু শোনাতে হবে। আচ্ছা, এইখানটা যদি একটু পড়ি?—

অকুণ্ঠ কোমল কণ্ঠে সহসা শুনিনু কা'র ভাষা,
'সংসারে মানুষ আছে, মানুষের আছে ভালোবাসা।
দুর্গমের সঙ্গী আছে, দুর্গতের আছে বরাভয়।'
আমারে বাঁচায়ে দিলে, হে কল্যাণী, জয়, তব জয়।"

সুদেষ্ণা সভয়ে বলিল, "না, না, আপনি ব'লছেন কি! কি ভাববে মা?"

"তবে এইখানটা?

তুমি যদি বাসো ভালো, তুমি যদি পাশে মোর থাক,
জ্যোতির্ময়ী আনন্দপ্রতিমা,—যৌবনের খেয়াঘাটে
যদি দাও জয়মাল্য নৈষ্ফল্যের মলিন ললাটে,—
তবে আমি মৃত্যুরে ডরি না,—ডরি না এ জীবনেরে।
শুনেছি করেছ দয়া ভক্ত তব এ দীনজনেরে।
সাবিত্রী মরেনি আজো, দময়ন্তী আজো ফিরে আসে,
দেবতারে তুচ্ছ করি মানুষী মানুষে ভালোবাসে
পেয়েছি প্রমাণ তার"—

সুদেষ্ণা অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "আপনি পাগল হয়েছেন? মা তা'হ'লে আমাকে ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করবে।"

"মাসিমাকে ঐ রূপে ঠিক কল্পনা ক'রতে পারছি না আপাততঃ। আচ্ছা, তুমি এস, আমি দেখছি কতদূর কি করতে পারি।"

সুদেষ্ণা নামিয়া গেল। সুমন্ত্র তাহারই টেবিলে বসিয়া তাহার এক্সার-সাইজ বুকের একখানা পাতা ছিঁড়িয়া লিখিল :

শ্রীমতী সুকল্যাণী দেবী—

পুজনীয়াসু।

'মা-হারা ছেলের মা হ'ল যাহারা পথের ধারে,—
স্নেহ দিল যারা,—গেহ দিল যারা,—গৃহহারারে,—
শোকে দুখে যারা বুকে নিল টানি,—লাঞ্ছিতে দিল সান্ত্বনাবাণী,—
আঘাতে ব্যথায় সকরুণ পাণি বুলা'ল যারা,—
তারা দয়াময়ী, তারা কল্যাণী,—জননী তারা।
প্রাসাদে কুটিরে আজি তাহাদের সবারে স্মরি,—
অয়ি মহীয়সী, তোমারে অর্ঘ্য প্রদান করি।'

সুদেষ্ণা একটু পরে খাইয়া আসিতেই সুমন্ত্র তাহার হাতে কবিতাটি দিল। বলিল, "তুমিই শুনিয়ে দিয়ো এটা মাসিমাকে। পছন্দ হবে তো?"

সুদেষ্ণা কবিতাটার উপর দ্রুত চোখ বুলাইয়া গেল। কিছু বলিল না, দুইটি বড়ো বড়ো চোখের সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিই সুমন্ত্রের প্রশ্নের উত্তর দিল।

সুমন্ত্র বলিল, "আমার মতো ভবঘুরের জন্যে ঈশ্বর মায়ের যত্ন পথে ঘাটে ছড়িয়ে রেখেছেন। কতজনের কাছেই যে পাওনা ছিল! মাকে হারিয়ে নিজের মাসিমাদের পেয়েছিলুম, তাঁদের স্নেহে মা'র অভাব ভুলেছিলুম অনেকটা! তারপর পেলুম

অনাত্মীয়া মায়েদের। বন্যার সেবা ক'রে ফিরেছি জ্বর গায়ে, যন্ত্রণায় মাথা ফেটে যাচ্ছে, ক'লকাতার পথ থেকে ধরে নিয়ে গেলেন এক গুরুপত্নী। দেশ-বিখ্যাত শিল্পাচার্যের স্ত্রী তিনি, নিজে হাতে আমার মাথা ধুইয়ে দিয়েছেন দিনের পর দিন, আমার ফাটা পায়ের এবং ভগ্নস্বাস্থ্যের তদারক করেছেন। একেবারে সুস্থ ক'রে বিদায় দিয়েছেন। আবার অজ-পাড়াগাঁয়ে অখ্যাত চাষার বৌ মোড়লকাকী এসে আমাদের উনুন গ'ড়ে ঘর লেপে দিয়ে গেছে— পুলিশের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য ক'রে, কাঠের জ্বালে পাতার জ্বালে রাঁধতে শিখিয়েছে, স্বেচ্ছাসেবক ছেলেদের কলেরার সেবা করেছে, আদর ক'রে 'আংগা বাড়ী আয় না আবাগের ব্যাটা' ব'লে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে গুড়-তেঁতুল দিয়ে পান্তাভাত খাইয়েছে। কারো কথাই ভুলতে পারি না, এঁরা কেউ ছোটো নয় আমার কাছে। আজ তোমার মা'র অহেতুক স্নেহ ভরিয়ে দিয়েছে আমার মন, কিন্তু তাঁকে প্রণাম জানাতে গিয়ে অনেকের কথাই মনে পড়ে গেল, যাঁদের প্রকাশ্যে প্রণাম জানানোর সুযোগ কোনোদিন হবে না। কবিতাটায় ব্যক্তিগত আবেদনের গভীরতার চেয়ে নৈর্ব্যক্তিক মাতৃবন্দনার ব্যাপকতা তাই বেশি এসে গেছে। বল তো বদলে দিই।"

সুদেষ্ণা বলিল, "না, এই থাক। মা বুঝবেন।"

কিছুক্ষণ দুইজনেই চুপ। একটু পরে সুদেষ্ণা বলিল,

"আপনি কিন্তু সত্যি ভাগ্যবান্। আমার ইচ্ছে করে আপনার সঙ্গে ভাগ্যটা বদল ক'রে নিতে। কত ঘুরেছেন, কত দেখেছেন—"

সুমন্ত্র বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িয়া বলিল "অতীতটা আর বদলানো যাবে না, তবে ভবিষ্যৎ ভাগ্যটা জড়ানো যেতে পারে—একটা মালা বদল করলেই।"

সুদেষ্ণা মাথা নীচু করিল। সুমন্ত্র বলিল,

"সত্যিই আমি ভাগ্যবান্ সুদেষ্ণা। কিন্তু আমার সৌভাগ্যের দৌড় যে কতদূর পৌঁছোতে পারে, দু' সপ্তাহ আগেও সে-সম্বন্ধে আমার নিজেরই কোনো ধারণা ছিল না। তুমি আমার কল্পনাতীত সৌভাগ্য, সুদেষ্ণা। কিন্তু বড়ো দুরূহ সৌভাগ্য। ভয় করছে।"

সুদেষ্ণা গম্ভীর মুখে বলিল, "এতই ভয়ানক যদি মনে হয় কাজটা, তবে নাই বা করলেন বিয়ে! কে মাথার দিব্যি দিয়েছে আপনাকে? শুনেছি অনুরোধে মানুষ ঢেঁকি গেলে; কিন্তু তাতে মানুষেরও প্রাণসংশয় হয়, ঢেঁকিরও কিছু সুখ বাড়ে না। সম্মানও বাড়ে না।"

সুমন্ত্র কৈফিয়ত দিবার ভঙ্গীতে হাত কচলাইয়া বলিল, "কি করব বল? মাতৃ-আজ্ঞা। মাসিমার কাছে শুনেছ তো, ঢেঁকিটির মর্তে আগমনের সঙ্গেই মা আমাকে বাঁধা দিয়েছেন তার কাছে।"

দুইজনেই হাসিয়া ফেলিল। তবে সুদেষ্ণার হাসিতে প্রশ্রয় ছিল বোধ হয়, সুমন্ত্র সাহস পাইয়া চেয়ারটা আর একটু কাছে টানিয়া বসিল। মৃদুস্বরে বলিল, "আজই মা'র কাছে কথাটা পাড়ব?"

সুদেষ্ণা বলিল, "পাগল? আগে এম-এটা পাশ করি, একটা উপার্জনের ব্যবস্থা হোক। আপনি জেলে গেলে যদি গাঁয়ের লোক আমাকে তাড়িয়ে দেয়? খাব কি তখন?"

সুমন্ত্র ব্যথিত স্বরে বলিল, "অর্থাৎ আমার ওপর নির্ভর করতে পারছ না তুমি? আমি সত্যি বোধ হয় খুব অক্ষম নই, সুদেষ্ণা। নানা কাজের কাজি হতে গেছলুম, কোনোটাই ভালো ক'রে করতে পারলুমনা তাই উপার্জনের জন্যে তেমন ক'রে চেষ্টা করিনি—"



সুমন্ত্রের মুখে কথা ফুটিল

সুদেষ্ণা অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "ক'রেও কাজ নেই। কেন আপনি ওসব কথা ভাবছেন? আমি আপনার সহধর্মিণী হ'তে চাই, পায়ের বেড়ি নয়। আপনার কোনো শুভকাজে সাহায্য করতে যদি নাও পারি, অন্ততঃ বাধা দেবার ইচ্ছে নেই আমার। অর্থ উপার্জনের জন্যে সবাই জন্মায় না, আপনিও জন্মান নি। চাষের বলদের কাজ যুদ্ধের ঘোড়াকে দিয়ে হ'লনা ব'লে যারা দুঃখ করে—আমি তাদের দলে নই। অসাধারণকে পেতে হ'লে তার জন্যে উপযুক্ত মূল্য দিতে হয়, সেই বুঝে তৈরি করছি নিজেকে। আমি উঠতে না পারি, আপনি অন্ততঃ নামবেন না আমার জন্যে।"

হায়রে বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতার লেখক! অনন্তরূপিনী নারীর কতটুকু দেখিয়া তাহার নামে অনন্তকালের জন্ম কলঙ্ক লেপন করিয়া গিয়াছ? অর্থের জন্ম পুরুষের ঘাড়ে জোয়াল দেওয়াই নাকি নারীর একমাত্র কাজ?

সুমন্ত্র মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল এতক্ষণ, সহসা তাহা উপলব্ধি করিয়া সুদেষ্ণা লজ্জায় নতমুখী হইয়া থামিয়া গেল। পরক্ষণেই মুখ তুলিয়া মিনতির স্বরে বলিল,

"আমার মা'র টাকা নেওয়ায় আপনার অগৌরব আছে বুঝতে পারি, বিয়ের পরে আমার উপার্জনের টাকা নেওয়াতেও কি আপনার বাধবে? আপনি একসময়ে লিখেছিলেন, 'আমার গৃহ তাহার গৃহ হ'লে থাকত না তো ভিক্ষা নেওয়ার লাজ,'—সেটা কি কেবল মেয়েদের ওপর দয়া ক'রে? বলুন?"

সুমন্ত্র কিছুক্ষণের জন্ম তাহার কথার উত্তর দিতে পারিল না। তারপর মৃদুস্বরে বলিল, "বহুযুগ ধরে প্রথাটা চ'লে এসেছে, সুদেষ্ণা, ওর প্রতি আনুগত্য তাই রক্তের মধ্যে র'য়ে গেছে আমাদের। স্ত্রীর উপার্জনের অন্ন খেতে পুরুষের আত্মসম্মানে বাধে। আমার উপার্জনের অন্নের ভাগ তোমাকে না দিতে পারলে আমি শান্তি পাব না, সুদেষ্ণা। কোনো যুক্তি নেই এর পক্ষে, তবু শান্তি পাব না।"

"তা'হ'লে কি আমার জন্যে চাকরি করতে বেরোলেই শান্তি পাবেন আপনি? আমাকে এবং নিজেকে ক্ষমা করতে পারবেন? ভেবে দেখুন।"

"তাও পাব না। অনেক ভেবেছি এ নিয়ে। তবে এঁকে বা লিখে বোধ হয় উপার্জন বাড়াতে পারি, নিজের গ্রামের কাজের ক্ষতি না ক'রে।"

"দোহাই আপনার, ঐটি করবেন না। নিজের আনন্দে অন্যকে আনন্দ দেবার জন্ম যদি কিছু সৃষ্টি করেন তবে তা সার্থক হবে, পয়সার জন্যে যা করবেন তা',—না-হোমে না-যজ্ঞে,—কিছুতেই লাগবে না। বড়ো উদ্দেশ্য নিয়ে এরকম ছোটো কাজ কিছু কিছু করতে হয় জানি, কিন্তু আমার জন্যে তা' করতে দেব না আপনাকে। আমার পার্থিব অন্নের ভাগ নিয়ে আপনি আমাকে আপনার অমৃতান্নের ভাগ দিন না তার চেয়ে? অবাধে নিরুদ্বেগে গ্রামসেবার কাজ, শিল্পের সাহিত্যের চর্চা করুন না কেন? সেইটেই আমার জন্যে করছেন মনে ক'রে আনন্দ পান না কেন? আজই আপনার গ্রামে গিয়ে কর্মসঙ্গিনী হবার উপায় নেই আমার—কিন্তু মর্মসঙ্গিনী হ'তে বাধা আছে কি?"

"অর্থাৎ তুমি চাও 'আমি তব মালঞ্চের হ'ব মালাকর'। বেশ, তাই হবে।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সুমন্ত্র কৃতজ্ঞতাবিহ্বল কণ্ঠে বলিল, "তোমাকে কি ব'লে আশীর্বাদ ক'রব জানিনা, সুদেষ্ণা! তুমি আমার মাতৃ-আশীর্বাদ।"

সুদেষ্ণা হাসিয়া বলিল, "ঠোঁটে সিঁদুর দেওয়া তো অভ্যেস নেই,— সিঁথের সিঁদূরকেও বিশ্বাস নেই, সে দৈবের হাত। আশীর্বাদ করুন, আমার মনের সিঁদুর যেন অক্ষয় হয়। বিচ্ছেদের মধ্যেও মিলনকে চিনতে পারি যেন, দৈন্যের মধ্যে মহিমাকে"—

পরক্ষণেই নাটকীয় ভঙ্গীতে চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িল সুদেষ্ণা, দ্রুতপদে চার পাঁচ হাত দূরে গিয়া দেওয়ালে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। সুমন্ত্র থতমত খাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "কি হ'ল?"

সুদেষ্ণা বড়ো বড়ো চোখ দুইটি বিস্ফারিত করিয়া ভীতিব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "সর্বনাশ করেছি! এ যে কোর্টশিপের মতো শোনাচ্ছে! মা কি ভাববেন?"

হো, হো করিয়া হাসিয়া উঠিল সুমন্ত্র। বলিল, "মেরা হারেম বন্ গয়া।"

সুদেষ্ণা অবাক হইয়া বলিল, "সে আবার কি?"

সুমন্ত্র গল্পটা সংক্ষেপে শুনাইয়া বলিল, "সে ছোকরা না-হয় স্বীকার করেছিল, অন্য অনেকে স্বীকার করে না, তবে পুরুষ স্বভাবতঃই বহুচর। এই মেয়ের নাকটি, ঐ মেয়ের চোখটি, একজনের গড়নটি, আর একজনের গলার স্বরটি নিয়ে মনে মনে ফাল্গুনী রচনা করেন অনেকেই। তোমার মধ্যে বহু বিভিন্নপ্রকৃতির নারীরূপ এবং গুণের সমাবেশ ঘটেছে, সুদেষ্ণা, ফলে তুমি একাই একটি বহুচরচারণক্ষেত্র। তোমার স্বামী একপত্নীব্রত হ'লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, আসলে তিনি বহুচরই থাকবেন তোমাকে পেয়ে।"

সুদেষ্ণা বলিল, "পুরুষদের না-হয় ওটা গর্বের কথা, কিন্তু মেয়েদের সংস্কার আলাদা। তারা যে লজ্জা পায় দ্বিচারিণী হ'তেই। বহুচারিণী মেয়ে পথেঘাটে দেখা যায় বটে, তবে তাদের শ্রদ্ধা করে না কেউ। তা' আমার স্বামী যদি একদেহে উকিল, ডাক্তার, কবি, শিল্পী, মাস্টার এবং ফৌজদারী আসামী হন তা'হ'লে তো আমাকেও বহুচারিণী বলবেন আপনারা? ছি, ছি, কী লজ্জার কথা!"

"মধুরাবিজয় কাব্য পড়েছ? ইতিহাসের ঘটনা নিয়ে লেখা, তা'তে

বিজয়নগরের রাণী গঙ্গাদেবী তাঁর মহাবীর স্বামী কম্পরায়কে একদেহে পঞ্চপাণ্ডব ব'লে গর্ব করেছেন। বুঝতে পারছ—তিনি দ্রৌপদী হবার সুখটা বুঝেছেন, অথচ সম্মান হারাননি তার জন্যে ভাবীকালের কাছে। তোমার নজীর আছে।"

রাস্তার অপর পার্শ্বের বাড়ির জানালা দিয়া উদাসী ডাক দিল,

"বিস্না হই গেলেগী, সুমুন্দিবাবু। হুইবার লাগি আও।" পরক্ষণে রসিকতা করিয়া বলিল, "বাত হেষ করি দিয় না, বিয়ার পরের লাগি থুরা রাখি দেও।"

সুমন্ত্র উঠিতেছিল, সুদেষ্ণা বলিল, "ভদ্রেশ্বরবাবুর বাড়িতে নিশ্চয় টেলিফোন আছে? একবার মিসেস কুণ্ডুকে ডেকে দেবেন দয়া ক'রে?"

সুমন্ত্র হঠাৎ যেন একটা তীব্র আঘাত পাইয়া চমকাইয়া উঠিল, একটা পুরাতন ক্ষতের উপর অত্যন্ত প্রিয়জন কেহ যেন অতর্কিতে নির্মমভাবে খোঁচা দিয়াছে। এত কথাব পর, এত বোঝাপড়ার পর,—আবার সেই মিসেস কুণ্ডু! সে বিবর্ণমুখে বলিল, "কেন! জেরা করবে? তাঁর স্বামী এখন অসুস্থ, মনের অবস্থা ভালো নয়। এখন থাক।"

সুদেষ্ণা বলিল, "তাঁর স্বামী কেমন আছেন সেই খবরটা নিতেও কি দোষ আছে? আপনি রাত্রে কেন যে গেলেন না, কোথায় খেলেন, কোথায় রইলেন,—সে বিষয়েও কি তাঁদের জানবার অধিকার নেই কিছু? কী অকৃতজ্ঞ আপনি?"

সুমন্ত্র বলিল, "ঠিক বলেছ। খবরটা দেওয়া হয়নি তো? তোমাদের টেলিফোনটা যে রয়েছে সামনে,—চোখেই পড়েনি। সত্যি, ভয়ানক অন্যায় হ'য়ে গেছে। ভদ্রমহিলা বোধ হয় না-খেয়ে ব'সে আছেন আমার জন্যে। কি ক'রে যে দিনগুলো কেটেছে—যদি জানতে। আমাতে কি আমি ছিলুম এ-ক'দিন? তা রাত্রে শুতে গিয়ে ঠিক মনে প'ড়ত, তখন আবার ছুটতুম খবর দিতে। বড্ড উপকার করলে মনে ক'রে দিয়ে। আচ্ছা, আমি ডাকছি।"

ফোনটা ধরিল সুমন্ত্র। "হ্যালো, সাউথ, সেভন, নাইন, ফাইভ, ফাইভ, টু। ইয়েস। হ্যালো, কে আপনি! মিসেস কুণ্ডু? আমি সুমন্ত্র কথা বলছি। ভদ্রেশ্বর কেমন আছে এখন? ঘুমোচ্ছে! আপনি ব'সে আছেন আমার

ভাত নিয়ে? খুব লজ্জিত। আপনি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ুন, আমি আজ আর ফিরব না। এতক্ষণ খুব ব্যস্ত ছিলুম, তাই খবরটা দিতে পারিনি! রাগ করলেন না তো? এখানে হঠাৎ ভূরি-ভোজন হয়ে গেছে একজায়গায়, আর নড়তে পারছি না। এইমাত্র খেয়ে উঠলুম, এইবার শুতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, এইখানেই কাটাব আজ রাত্তিরটা। আমি টেলিফোন ক'রছি কোথা থেকে? এ আমার এক আত্মীয়ার বাড়ি,—চালতাবাগানে। না, সম্পর্কে মাসিমা হন। বেশ তো, আপনি আলাপ করুন না। মাসিমা তো এখানে নেই, তাঁর মেয়ে রয়েছেন, তাঁকেই দিচ্ছি। ইনি সুদেষ্ণা দাশগুপ্তা, এম, এ পড়েন। আমার বোন? না, ঠিক বোন নন, মানে—সম্পর্কে? না, মানে, তাও নয়। ভয় পাচ্ছি কেন? না,—ভয় কিসের? সন্দেহ হচ্ছে? কি বিপদ? ওদিকেও সন্দেহ, এদিকেও সন্দেহ, আমি যাই কোথায়? বয়স? কুড়ি একুশ হবে, জিজ্ঞেস করিনি। নাও, তুমি ধরো।"

সুদেষ্ণা রিসিভারটা ধরিল। বলিল, "নমস্কার। হ্যাঁ, আমি সুদেষ্ণা। না, রক্তের সম্পর্ক কিছু নেই, আমার মা ওঁর মা'র বন্ধু ছিলেন। না, ওসব কথা কিছু শুনিনি তো। হ্যাঁ, আমাদের বাড়িই আপনারা ভাড়া নিয়েছেন। আসার সুবিধে হবেনা এখন? নেমন্তন্ন না পেলে আসবেন না? বেশ তো, নেমন্তন্ন রইল। এরকম নেমন্তন্ন নয়? তবে আবার কি রকম? রঙিন চিঠিতে? প্রজাপতি-আঁকা? ধ্যেৎ।"

সুদেষ্ণা টেলিফোনের রিসিভারটা নামাইয়া রাখিতেই আবার টেলিফোনটা ক্রিং ক্রিং করিয়া উঠিল। সে আবার সেটা তুলিয়া লইল। "হ্যালো? হ্যাঁ, উনি এখন আপনাদের ভাড়া-নেওয়া-বাড়িতেই যাতায়াত করবেন কিছুদিন। খুব সেবা করেছেন? করবারই কথা। ওটা তো মানুষের কাজ। কৃতজ্ঞ? কৃতজ্ঞতার কি আছে এতে?"

সুদেষ্ণা মনে মনে বলিল, 'আমরা দু'জনেই কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে,' কিন্তু মুখে বলিল, "বন্ধুর সেবা করেছেন তা'তে হয়েছে কি? এত কুণ্ঠার কি আছে? বেশ তো, সাহায্য? দরকার হ'লেই জানাবেন। দেশের কাজ ক'রতে হ'লে টাকার দরকার হয়ই তো? চাকরির চেষ্টা? নাঃ, আর চাকরি ক'রবেন না। মনিবদের মারলে তারা রাগ করে, কাজ না করলে, কথা না শুনলে মাইনে দেয়না। একটা ব্যবসা করবেন এবার। চীনে বাদাম, বিস্কিট বা লজেঞ্চেস, অর্থাৎ বিক্রি না হ'লে অংশীদাররা খেতে পারবে—এই-

রকম জিনিসের। অবশ্য যৌথ-কারবার হবে, হ্যাঁ, লিমিটেড কম্পানি। আমি কিছু শেয়ার কিনছি, আপনি কিনবেন? একশ' টাকা ক'রে। মোটে দশখানা? বেশ, আপনার নামে আলাদা করা থাকবে। কাজ আরম্ভ হলেই টাকা চেয়ে পাঠাব। আচ্ছা, ছেড়ে দিচ্ছি, নমস্কার।"

সুদেষ্ণা ফোন ছাড়িলে কি হইবে, ফোন তাহাকে ছাড়িতে চায় না। আবার ক্রিং ক্রিং করিয়া উঠিল। "জ্বালালে" বলিয়া আবার রিসিভারটা তুলিয়া লইল সুদেষ্ণা, পরক্ষণেই জিভ কাটিয়া বলিল, "না, না, রাগ করব কেন? বলুন না, কি বলবেন। আমার নিজের প্রয়োজন? কিচ্ছু না। হার, চুড়ি, ব্রেসলেট? মুক্তোর মালা? কঙ্কণ? কণ্ঠি? সব আছে আমার মা'র সিন্দুকে, আমি পরি না। কিছু না দিয়ে ছাড়বেন না? বেশ, একটা বেলফুলের মালা আনবেন আসবার সময়। আরও কিছু? আচ্ছা আর একগোছা রজনীগন্ধা। না, না, রোজ নয়, মা ভীষণ রাগ করবেন তা'হ'লে। না, এখনও কিছু ঠিক হয় নি, দেরি আছে। ততদিন উনি ঘরের ছেলের মতো আসবেন যাবেন যখন খুসি, তবে কন্যা-প্রসাদনের চেষ্টা করতে পাবেন না। হ্যাঁ, কোর্টশিপ; বাংলাটা ইংরিজির চেয়ে দুর্বোধ্যই লাগে বটে। না, মা'র নিষেধ আছে, আমাদের বংশে কেউ কখনো কোর্টশিপ ক'রে বিয়ে করে নি।"

সুকল্যাণী দেবী ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন, "কার সঙ্গে ওসব কথা হচ্ছে? কি বেহায়া মেয়ে বাবা!"

তিনজনেই সমস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

শান্তি-র বই :

আলোচনা-গ্রন্থ :

রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী

রবীন্দ্রনাথের পূরবী

রবীন্দ্রনাথের মহুয়া (যন্ত্রস্থ)

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা

জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র

গল্পকার শরৎচন্দ্র

বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ

বিশ্বসংস্কৃতি :

গ্রন্থবার্তা

শান্তি-র বই :

উপন্যাস :

গৃহসন্ধানে
যেতে নাহি দিব
সুন্দর, হে সুন্দর
শিখারূপিণী
মেঘ ও চাঁদ

গল্প :

ঊর্মিমালা

রম্যরচনা :

পিছু ডাকে